জয়নাথ মুন্সীর

রাজোপাখ্যান

বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত

জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যান বিশ্বনাথ দাস

জয়নাথ মুন্সীর

রাজোপাখ্যান

বিশ্বনাথ দাস
সম্পাদিত

মালা পাবলিকেশন্‌স্
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রকাশক :
আশিসকুমার বর্ধন
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রথম মালা সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৯২ এপ্রিল, ১৯৮৫
প্রচ্ছদ : শ্রীস্বপন রায়চৌধুরী
ব্লক : সন্তোষী প্রসেস
৯, নলিন সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

মূল্য—কুড়ি টাকা মাত্র।

পরিবেশক :
চয়নিকা
ব্যাঙচাতরা রোড,
কোচবিহার

মুদ্রাকর :
পরেশচন্দ্র পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

'রাজোপাখ্যান' এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির কথা উল্লেখ না থাকলেও প্রাচীন গদ্যের নিদর্শনরূপে এবং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির অবদান অস্বীকার করবার উপায় নেই। কোচবিহারের সেকালের রাজাদের ইতিহাস নিয়ে জয়নাথ মুন্সীর 'রাজোপাখ্যান' ১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলেই অনুমান করা হয়। শুধুমাত্র কোচবিহারের ইতিহাসই নয়, আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর এই পদক্ষেপ চিরস্মরণীয়—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

জয়নাথ মুন্সীর সেই রাজোপাখ্যান দীর্ঘকাল পর আবার মুদ্রিত হলো। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো ভূমিকা, জয়নাথ মুন্সীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, পরিশিষ্ট ও টীকা ইত্যাদি।

প্রকাশক।

Joynath Moonshi's Rajopakhyan
[History of Cooch Behar]
Editor
Biswanath Das

Rs. 20·00 Only

সূচীপত্র

ভূমিকা [vii]
জয়নাথ ঘোষ [xi]
রাজোপাখ্যান (রাজাবলী) [xiv]

দেবখণ্ড

প্রথম অধ্যায় : শিব-পার্বতী সংবাদে যোগিনী তন্ত্রানুসারে হীরা দেবীর ও বিশ্বসিংহের জন্মহেতু যোগিনীতন্ত্র সম্মত ৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : কামরূপ ক্ষেত্রের মাহত্ব ও শঙ্কা ও ঐ দেশের কোনং রাজা হবেক ও কোচের উৎপত্তি বিবরণ ৪
তৃতীয় অধ্যায় : চিকিনা পর্বতে হীরা দেবীর জন্ম ও হীরা ও জিরার উদ্বাহ ক্রিয়া ও চন্দন মদনের জন্ম ও হীরার তপস্যা ৬
চতুর্থ অধ্যায় : মহাদেবের হীরা দেবীর অন্বেষণে ভিক্ষাচ্ছলে কুচনী পাড়াতে গমন ৭
পঞ্চম অধ্যায় : শ্রীশ্রীসদাশিব সহিত হীরা দেবীর সন্দর্শন ৮
ষষ্ঠ অধ্যায় : শ্রীশ্রীসদাশিব সহিত হীরা দেবীর সম্মিলন—বিশু-শিশুর জন্ম ও বিশুর মাতৃগর্ভে যোগশিক্ষা করা ৯
সপ্তম অধ্যায় : বিশু-শিশুর বাল্যলীলা ও বিশু-শিশুর বিষয়—মহাদেবের নিকট হীরা দেবীর প্রার্থনা ১০
অষ্টম অধ্যায় : মহাবলি দিয়া বিশ্বসিংহের ভগবতীর পূজা ও ভয়তে পলাইয়া পর্বতে গমন ও স্বপ্নাদেশে শিবাজ্ঞা ১২
নবম অধ্যায় : বিশ্বসিংহের দেবাভিষিক্তে রাজা হওয়া ১৩
দশম অধ্যায় : তুড়কা কোটালের সহিত যুদ্ধ—মদনের পতন—চন্দনকে রাজা করা ও ত্রয়োদশ বর্ষান্তে চন্দনের বিয়োগ ১৪
একাদশ অধ্যায় : ১৪ রাজশকাতে মহারাজা বিশ্বসিংস রাজ অভিষিক্তিতে রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করা ও বিশ্বসিংহের তিন পুত্রের জন্ম ও হীরা দেবীর কৈলাস গমন ১৬
দ্বাদশ অধ্যায় : বিশ্বসিংহের পুত্রদিগের বিবাহ আর তাঁহাদের যোগ্রাশ্রয়েতে গমন করা ১৭

নরখণ্ড

প্রথম অধ্যায় : মহারাজা নরনারায়ণের রাজা হওয়া ও রাজ্য শাসন করা ২১
দ্বিতীয় অধ্যায় : গৌড়ের যুদ্ধ—গঙ্গাতীর পর্যন্ত আয়ত্ত ও শুক্লধ্বজের বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইয়া বিভীষিকা দর্শন ও মহারাজা নরনারায়ণের স্বপ্নে ভগবতীর দর্শন পাওয়া ২২
তৃতীয় অধ্যায় : আসাম দেশ আয়ত্ত করা ও শ্রীশ্রীকামাক্ষাতে বৃহৎ কীর্তি প্রকাশ ২৪
চতুর্থ অধ্যায় : মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের জন্ম ও মহারাজা নরনারায়ণের কৈলাস গমন—মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজা হওয়া ২৭
পঞ্চম অধ্যায় : মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব—দিল্লীতে গমন ও তথায় ক্ষমতা প্রকাশ—তাহার অষ্টাদশ পুত্র মধ্যে মহীনারায়ণকে নাজিরী মনসুব অর্পণ করিয়া কৈলাস গমন করা ২৮
ষষ্ঠ অধ্যায় : মহারাজা বীরনারায়ণের রাজ্য শাসন করা—কোঙর প্রাণনারায়ণকে যুবরাজ করা ও বীরনারায়ণের কৈলাস গমন ৩১
সপ্তম অধ্যায় : মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজ্য শাসন ও অপূর্ব সভা নির্মাণ—মোদনারায়ণের আদি তিন পুত্রের জন্ম ও মহারাজা প্রাণনারায়ণের কৈলাস গমন ৩২
অষ্টম অধ্যায় : মহারাজা মোদনারায়ণের রাজা হওয়া—গোসাঞী ও মহীনারায়ণ ও তাহার পুত্রদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধ—মহারাজা মোদনারায়ণের কৈলাস গমন ৩৫
নবম অধ্যায় : মহারাজা বাসুদেব নারায়ণ—রাজা হওয়া ও কাটা যাওয়া—মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়া ৩৭
দশম অধ্যায় : মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য শাসন—যবন সৈন্য সহিত যুদ্ধ ও তাহার কৈলাস গমন ৩৮
একাদশ অধ্যায় : মহারাজা রূপনারায়ণের রাজা হওয়া ও রাজ্য শাসন—বেহারে রাজধানী করা ও তাহার কৈলাস গমন ৩৯
দ্বাদশ অধ্যায় : মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়া দীন দেওর যুদ্ধ ও তাহার কৈলাস গমন ৪১
একাদশ অধ্যায় : মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়া ও কাটা যাওয়া ৪৪
চতুর্দশ অধ্যায় : মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রথম রাজা হওয়া ও বিবাহ করা—রামনারায়ণ দেওয়ান দেও কাটা যাওয়া ৪৬

পঞ্চদশ অধ্যায় : সুরেন্দ্রনারায়ণ কোঙরের দেওয়ান দেও হওয়া—মহারাজাকে ভুটিয়াতে (ভুটানে) আবদ্ধ করিয়া পাহাড়ে লইয়া যাওয়া ৪৯
ষোড়শ অধ্যায় : মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়া ও বিবাহ—তাহার কৈলাস গমন ৫২
সপ্তদশ অধ্যায় : মহারাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়া ও ভোট সৈন্য আসিয়া বেহারে আক্রমণ করা ও স্থানে২ কোট করা ৫৩
অষ্টাদশ অধ্যায় : রাজ্য কোচবেহার কোম্পানীর ছাতার নিচে আনা ও লাটবন্দী স্বীকৃত হওয়া—ভুটিয়ার (ভুটানের) সহিত পারলেঙ্গ সাহেবের ঘোর যুদ্ধ ৫৬
উনবিংশতি অধ্যায় : মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ সকল সমেত পাহাড় (ভুটান) হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া ও মহারাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের সন্ধি হওয়া—মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুনরায় রাজ-অভিষেক ৬০
বিংশতি অধ্যায় : মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের কাশী যাওয়া ও নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ ৬২
একবিংশতি অধ্যায় : শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুরের (হরেন্দ্রনারায়ণের) জন্ম ও নাজীর দেও শ্যামচন্দ্র রায়ের প্রাণান্ত—গোসাঞী ও খাসনবীসের দৌরাত্ম ও মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের কৈলাস গমন ৬৫

প্রত্যক্ষ খণ্ড

প্রথম অধ্যায় : শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুরের (হরেন্দ্রনারায়ণের) রাজ অভিষিক্ত হওয়া ও নাজীর দেও অসম্মান হওয়া ৬৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : নাজীর দেও বেহারে আসিয়া পুনরায় রাজা হওয়া ও ঈশ্বরের অন্দরের চতুপার্শ্বে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া আহারা আদি সামগ্রী বন্ধ করা—নাজীর দেও বন্দী হওয়া ও পলায়ন করা—পরদা হইতে আবদ্ধ করিয়া আনা ৭৩
তৃতীয় অধ্যায় : পীতর মৌর সাহেবের আগমন—শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ বেহার ও বোদা সকল রাজ্য মহারাজার অধীন হওয়া ও নাজীর দেও নাজীরি মনসুব হইতে উদ্বর্ত্ত হওয়া ৭৭
চতুর্থ অধ্যায় : নাজির দেওর ভ্রাতা ভগবন্ত নারায়ণ কোঙর রাজবাড়ী চড়াও করিয়া রাজমাতা মহারাণীর সহিত শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুরকে আবদ্ধ করিয়া বলরামপুর নিয়া যাওয়া ৮০

পঞ্চম অধ্যায় : সদর হৈতে বাটন সাহেব আদি কপ্তান সৈন্য প্রেরিত হইয়া মহারাণীকে মহারাজাকে মুক্ত করিয়া আনা ও বলরামপুরের বাড়ী দগ্ধ করা ৮৪
ষষ্ঠ অধ্যায় : মেছর সাহেব ও স্থরবিট সাহেব আসিয়া বেহারের জাবদিয় (যাবতীয়) বিষয় বিচার করা ৮৮
সপ্তম অধ্যায় : ভিকলীন সাহেব বেহারের কমিশনার নিযুক্ত হৈয়া আইসা (আসা). ৯০
অষ্টম অধ্যায় : বুরহ সাহেব কমিশনার হৈয়া আইসা (আসা) ও হাজারা সিংহের প্রস্তাব ও শ্রীশ্রীমহারাজার প্রথম বিবাহ ৯১
নবম অধ্যায় : ইশমিট সাহেব কমিশনর নিযুক্ত হওয়া বড় মধ্যম আই দেবতির বিবাহ ও শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ কোঙর সাহেবের জন্ম ৯৫
দশম অধ্যায় : রিচার্ড আমটি কমিশনর নিযুক্ত হওয়া ও শ্রীশ্রীভূপের বেক্ষা—দশহরার বিস্তার—চাকলাজাতের খোদ বন্দোবস্ত হওয়া ৯৬
একাদশ অধ্যায় : বেহারের রাজকার্য্য ভূপতির স্বাধীন হওয়া—গুরু প্রসাদবাবুর রাজকার্য্য আকর্ষণ করা—কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবিসের প্রার্থনা ১০০
দ্বাদশ অধ্যায় : কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবিসের উক্ত রাজনীতি ১০২
ত্রয়োদশ অধ্যায় : রাজকার্য্য ও দেওয়ান জীবেন্দ্রনারারণ কোঙরের অন্যায় আচরণ—গুরুপ্রসাদবাবুর প্রাগ্নৈভব ঐত্যাচার (অত্যাচার) হওয়াতে তিনি দুরর্ত্ত (দৌরাত্ব) হইয়া দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ১০৭
চতুর্দশ অধ্যায় : দেওয়ান জয়গোপাল সিংহ নিযুক্ত হওয়া ও রাজকার্য্য করা—তাহার পরলোক হওয়া—চোত্তা লাল দেওয়ান হওয়া ও কর্ণওয়ালিশের অনুগ্রহে আদালত ফৌজদারী ভূপতির স্বাধীন হওয়া ১০৯
পঞ্চদশ অধ্যায় : রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ীর দেওয়ানী ও পরে গুরুপ্রসাদবাবু, দেওয়ান হওয়া ও ভেটাগুড়িতে গমন—দেওয়ান দেও পুনরায় কাজিয়া (ঝগড়া) উপস্থিত হওয়া—মেকলোট্ সাহেবের আগমন ১১০
ষোড়শ অধ্যায় : রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ীর দেওয়ানী পরে গুরুপ্রসাদবাবু রংপুর থাকিয়া দরবারের চেষ্টা করা—ভূপতির শত্রু ক্ষয় হওয়া ১১৪
সপ্তদশ অধ্যায় : শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুরের ঈশ্বরী স্নান গমন করা ও ধলিয়া বাড়ীর আত্তাসে (আবাসে) গমন করেন ১১৬
অষ্টাদশ অধ্যায় : পুরান বেহারে আগমন ও শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী স্থাপন করা ১১৮

ঊনবিংশতি অধ্যায় : তীর্থভ্রমণার্থে রাজার কাশী যাত্রা ১২০
বিংশতি অধ্যায় : যাত্রা-পথের বর্ণনা—পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আগমন এবং মৃত্যু ১২২
একবিংশতি অধ্যায় : মহারাজার অনুপস্থিতিকালে রাজকার্য্য পরিচালনা ১২৪
দ্বাবিংশতি অধ্যায় : মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে শোভাযাত্রা ১২৫
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় : দেওয়ান জীবেন্দ্রনারায়ণের পত্নীবিয়োগ ১২৬
চতুর্বিংশতি অধ্যায় : মহারাজার গুরুতর অসুখের সংবাদ—বালা সাহেবের প্রত্যাবর্তন ১২৭
পঞ্চবিংশতি অধ্যায় : শিবেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ ১২৯
ষড়বিংশতি অধ্যায় : শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজা হবার সংবাদ সমাচার দর্পণ এবং কলিকাতার গভর্নর জেনারেল ও গৌহাটির এজেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ ১৩১
সপ্তবিংশতি অধ্যায় : ধর্ম সভা স্থাপন—রাজকার্য্যের রীতি-নীতি পরিবর্তন ১৩২
অষ্টাবিংশতি অধ্যায় : মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ ১৩৪
ঊনত্রিংশতি অধ্যায় : মহারাজাকর্তৃক ধর্মশালা স্থাপন—পুত্র সন্তান না থাকায় দত্তক গ্রহণ ১৩৬
ত্রিংশৎ অধ্যায় : শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন—পিতৃদেব (হরেন্দ্রনারায়ণ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দির নির্মাণ কার্য্য সমাপন ১৩৭
একত্রিংশৎ অধ্যায় : গোপালমোহন মজুমদারের বিরুদ্ধে নালিশ—গভর্নর জেনারেলের মুখ্য প্রতিনিধি কর্তৃক কোচবিহার পরিদর্শন ১৩৮
দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় : (লেখক কর্তৃক) মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের বর্ণনা—দত্তকপুত্রের মৃত্যু—কুমার নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ ১৩৯
ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায় : মহারাজার কাশী তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের ব্যবস্থা ১৪১
পরিশিষ্ট : ১ ১৪২
পরিশিষ্ট : ২ ১৪৯
ব্যক্তি পরিচিতি ১৫৬
টীকা ও শব্দার্থ ১৫৮
নির্ঘণ্ট ১৬১
শুদ্ধিপত্র ১৬৮

* প্রত্যক্ষ খণ্ডের ঊনবিংশতি অধ্যায় থেকে ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায় পর্যন্ত বিষয়সূচী সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তুত।

ভূমিকা

॥ এক ॥

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজার কাছে লেখা কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের চিঠিই হচ্ছে প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন। সেই গদ্য হ'ল—"লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্চা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বদ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি।"—এই গদ্যের ঠাঁটকে বিস্ময়কর বললে অত্যুক্তি হবে না। শুধুমাত্র এই কারণেই গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে কোচবিহারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে মুন্সীর জয়নাথ ঘোষের রচিত 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থ থেকে। ইংরাজ-পূর্ববর্তী বাংলাদেশে মূলতঃ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ছিল। কোচবিহারের মহারাজগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন এবং উৎসাহী ছিলেন—বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য-কর্মই একথা বার বার প্রমাণ করেছে।

জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যান ইতিহাসধর্মী রচনা। বাঙালীর ইতিহাস চর্চার দৈন্যতা প্রসঙ্গ নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে তার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা নিষ্প্রোয়জন। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে না—এই জীবনটাকে মিথ্যা এবং মায়াময় মনে করা সর্বোপরি দৈবানুকম্পার উপর একান্ত নির্ভরতা ও পারলৌকিক জীবন-ভাবনার আধিক্যই—বাঙালীর ইতিহাস রচিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। ইতিহাস গড়ে ওঠে জাতি-জীবনের বিপুল কর্মকাণ্ড নিয়ে। গর্বিত ইংরাজ যে কিনা সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে এত বড় একটা দেশকে উপনিবেশে পরিণত করতে পেরেছিল—তাদের সেই অহংকারী মেজাজ, নিজেদের কীর্তির সাক্ষরগুলো ধরে রাখতে গিয়ে এদেশের ইতিহাস চর্চার প্রশস্ত পথ তৈরী করল। এই সুত্রেই বাঙলার ইতিহাস লেখা শুরু হল। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা নিজেদের ক্ষমতার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের গুণগান অধিক মাত্রায় প্রচার করবার ঝোঁকে শুধুমাত্র নিজেদের লৌকিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করেন নি। দেবতা-দৈবের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে নানা অলৌকিক কর্ম-কাণ্ড দ্বারা নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস চালিয়েছেন। রাজ-রাজাদের এই ইচ্ছা পূরণে সাহায্য করেছেন তাঁদের আশ্রিত রচনাকারেরা। বাঙালির ইতিহাস-চর্চার আদিপর্বের এই দুর্বলতাটুকু স্মরণে রাখিলে তাঁদের রচিত ইতিহাসের নির্যাসটুকু পেতে অসুবিধা হয় না।

কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে রচিত জয়নাথ মুন্সীর 'রাজোপাখ্যান' সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। রাজোপাখ্যান রচিত হয়েছিল আজ থেকে দেড়শ বছর আগে (১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে)। সেদিক থেকে এই গ্রন্থের গদ্যে আধুনিক পূর্ব যুগের বাঙলা গদ্যের আদল খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বাঙলা গদ্য চর্চার ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় লর্ড ওয়েলেসলির প্রচেষ্টায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোলকাতার লালবাজারের কাছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হলে বাঙলা গদ্যের চর্চা রীতিমত শুরু হয়ে যায় – সাহিত্য, ইতিহাস ও আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ ইত্যাদি নানা রচনার মাধ্যমে। এখানকার লেখকগোষ্ঠীর লেখায় ও সংবাদপত্রের (১৮১৮) ব্যবহৃত ভাষায় বাঙলা গদ্যের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ ক্রমশ ফুটে উঠেছিল। আলোচ্য 'রাজোপাখ্যান' রচিত হয়েছিল ১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন লেখকের সচেতন প্রয়াসে বাঙলা গদ্যের নাবালকত্ব অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। রামমোহন রায়ের সমস্ত রচনা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। তবে এ সমস্ত গদ্যচর্চা মূলত কোলকাতাকেন্দ্রিক। প্রসঙ্গত উত্তরবঙ্গের আরো একজন বিশিষ্ট প্রাচীন গদ্য রচয়িতার নাম উল্লেখ করতে হয়—তিনি হলেন 'হিতোপদেশ' রচয়িতা গোলকনাথ শর্মা।

কোলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে বাঙলা গদ্যচর্চা পূর্ণোদ্যমে চলছিল, মাত্র চার দশকেই তা অনেকখানি প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করেছিল। যদিও বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী বাঙলা গদ্যে ছন্দ-লালিত্য, শব্দ-সুষমা তেমনভাবে অনুভূত হয় না। নগর কোলকাতার অনেক দূরবর্তী কোচবিহার থেকে দেড়শো বছর আগে মুন্সী জয়নাথ 'রাজোপাখ্যানে' যে ধরনের গদ্য ব্যবহার করেছিলেন—তাতে চমৎকৃত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই সময়ের কিছু গদ্য-নমুনার সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বাঙলা গদ্যের অন্যতম রচয়িতা রামমোহন রায়, পত্রিকা সমাচার দর্পণ; ভিন্নধর্মী রচনায় পারদর্শী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা থেকে উদ্ধৃতি তোলা হ'ল :—

১। যেমন ভিন্ন২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ভিন্ন২ ধ্বনিতে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেইরূপ ভিন্ন২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন, সেই২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই২ ধ্বনিত হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন। —"গৌড়ীয় ব্যাকরণ", ইং ১৮৩৩ / পৃঃ ১।

২। দর্পণ ও বাঙ্গলা গেজেট। চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন যে প্রথম বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয় তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙলা গেজেট নামে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—"সমাচার দর্পণ", ১১ই জুন ১৮৩১ ইং।

৩। পল্লীগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোকসকল এই কোলকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্ কৌশলাদি অবগত আর্ত্ত অসমর্থ হয়েন

তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসী লোকদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্যভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকট অসভ্য ও অভব্যন্যায় বসিয়া থাকেন—(।)

—"কলিকাতা কমলালয়", ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইং ১৮২৩, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত / পৃঃ ১৩।

৪। মহারাজ এইরূপে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন (।) ভূপতি মহাবল পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য রাজা ও রাবণের ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন এবং মুক্ত হস্তে দান বিতরণ করিতেন (।) প্রধান২ লোক সকল আগমন করিয়া ভূপতির আশ্রয় লইয়া কালাতিপাত করিত (।) —"রাজোপাখ্যান", মুন্সী জয়নাথ প্রত্যক্ষ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায় / পৃঃ ১১০।

উপরে উদ্ধৃতিগুলো ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কালগত সামান্য প্রভেদ আছে—একটি ভাষা গঠনের পক্ষে তা খুব বেশী নয়। কিন্তু এ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, রাজোপাখ্যানে ব্যবহৃত গদ্য অন্য গদ্যগুলোর তুলনায় কোন অংশেই দুর্বল নয়। বরং বলা চলে যথেষ্ট প্রাঞ্জল সহজবোধ্য, অন্বয় পদ্ধতি বাঙলার নিজস্ব বাক্‌রীতি অনুরাগী। প্রথম যুগের বাঙলা গদ্যের একটি বিশেষ গুণ যার অভাবে অনেক গদ্যের অর্থোদ্ধার করতে অসুবিধা হয়।

অন্যান্য প্রাচীন গদ্যের ক্ষেত্রে যেমন রাজোপাখ্যানের পাণ্ডুলিপিতেও তেমনি দাঁড়ি, কমা প্রভৃতি যতি চিহ্নের ব্যবহার নেই এবং যেখানে একই শব্দের ব্যবহার দুবার প্রয়োগ প্রয়োজন সেখানে সংখ্যা (২) ব্যবহার করা হয়েছে। (পরবর্তী সময়ে পুস্তাকারে মুদ্রণকালে দাঁড়ি, কমা প্রভৃতি যতি-চিহ্নের ব্যবহার করা হয়) যতি-বিন্যাস রীতিতে বিদ্যাসাগরের আগে আর কেউ শৈল্পিকারুকার্য ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম হন নি। 'রাজোপাখ্যানে' বাক্য গঠন রীতিতে শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক নিয়ম এবং বাক্যের অর্থের সমাপ্তি এমন স্বাভাবিকভাবে এসেছে যে যতি-চিহ্নাদির অভাবের বিষয়টি মনেই থাকে না। অর্থবোধ কোথাও হোঁচট খায় না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মণ্ডলী এবং যাঁরা স্বাধীনভাবে ভাষায় গদ্য শরীরী সত্তা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর সেইসব কৃতি মনীষীরা সকলেই নিজ ভাষায় গদ্যের স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে আরবী-ফারসী-সংস্কৃত এমন কি ইংরাজীরও শব্দ ও বাক্‌বিন্যাস রীতির সমুদ্রের উথাল-পাথালের মধ্যে পড়েছিলেন। স্বভাবতই তাঁদের রচনায় এইসব বিদেশীয় ভাষার যথেচ্ছ অপ্রয়োজনীয় প্রয়োগ বাঙলা ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততাকে বাধাপ্রাপ্ত করেছিল। একথাও ঠিক এসবের মধ্যে থেকেই আধুনিক বাঙলার নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গী অনুসারী সুষম স্বাদু গদ্য উঠে এসেছিল। গদ্য রচনার সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা যুগের কথা মনে রেখে বিচার করলে অল্প পরিচিত গদ্য লেখক জয়নাথ মুন্সীর লেখার মুন্সীয়ানা নজরে না পড়ে পারে না। তাঁর লেখায় দুরূহ শব্দের ব্যবহার অতি সীমিত,

ভাষা ভাবপ্রকাশক্ষম। লেখকের কৃতিত্ব যে কোলকাতার এত দূরবর্তী হয়েও তরতাজা, জড়তাহীন গদ্যে বাঙলার এক প্রান্তের এক রাজপরিবারের আঞ্চলিক একখণ্ড ইতিহাসকে স্পন্দনযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। কোচবিহারের মহারাজার চিঠি দিয়ে প্রাচীন বাংলা গদ্যের যে সূত্রপাত, উত্তরবঙ্গের অন্যতম লেখক গোলকনাথ শর্মার রচনায় যার পূর্ণতা, লেখক মুন্সী জয়নাথ ঘোষের রচনায় সেই বাংলা গদ্যের পরিণতি। সেদিক থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই অঞ্চলের বিশেষ ভূমিকার কথা কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

॥ দুই ॥

রাজোপাখ্যানের মূল পাঠের কোন পরিবর্তন করবার ইচ্ছে ছিল না। যে সব ভুল ভ্রান্তিগুলো অতি স্পষ্ট সেগুলো সহ পুনর্মুদ্রণ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। একথা অনায়াসেই বলা যায় যে অবিকৃত পুনর্মুদ্রণ ভাষা ও মুদ্রণ প্রথার সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছু মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য কয়েকটি স্থানে মূল পাঠের সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। শুদ্ধিপত্রে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

মূল পাণ্ডুলিপিতে দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি যতি চিহ্নাদি নেই। কিন্তু পুস্তকাকারে মুদ্রণকালে দাঁড়ি, কমা, ইত্যাদি যতি চিহ্নের ব্যবহার হয়েছিল। যথারীতি এবারেও তার কোন পরিবর্তন করা হয় নি। বর্তমান গ্রন্থে কোচবিহারের কয়েকটি পুরানো আলোকচিত্র যুক্ত করা হয়েছে।

টীকা অংশে যে শব্দগুলোর অর্থ দেওয়া হল, রাজোপাখ্যানের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছি। বানানের হেরফের এবং বর্তমানে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে—একথা আগেই স্বীকার করে রাখছি।

অধ্যাপিকা শিখা দেবনাথ সম্পাদনার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নির্ঘণ্টটি তৈরী করতে পেরেছি, সুষমা সেনের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। এঁদের কাছে আমি চির-কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক শ্রীআশিস্ কুমার বর্ধন এমন একটি বই ছাপার ঝুঁকি নিয়ে যে সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

বৈশাখ / ১৩৯২

ব্যাঙচাতরা রোড

কোচবিহার

বিশ্বনাথ দাস

জয়নাথ ঘোষ

জয়নাথ ঘোষের জন্ম আনুমানিক ১৭৭১ সালে। জন্মস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার বানিয়াজুরী গ্রামে। পিতার নাম কাশীনাথ ঘোষ। জয়নাথ জাতিতে ছিলেন কায়স্থ।

জয়নাথের শৈশবকাল কেটেছে গ্রামের বাড়ীতে। পিতা কাশীনাথ ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ এবং প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী। পিতার এই স্বভাবের অনেকখানি বর্তে ছিল জয়নাথের উপর। ছেলেকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলায় পিতার উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। এই কারণে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন গৃহশিক্ষক। মেধাবী জয়নাথ অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা, ফারসী এবং ইংরেজী ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠেন।

পরবর্তীকালে তিনি কি ভাবে কোচবিহার রাজপরিবাবের সংগে যুক্ত হয়েছিলেন তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কোচবিহারের রাজকার্যে নিযুক্ত হন। নামে রাজকার্য হলেও মূলত তিনি ছিলেন হরেন্দ্রনারায়ণের গৃহশিক্ষক। বাংলা এবং ফারসী ভাষায় হরেন্দ্রনারায়ণ যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন সেক্ষেত্রে জয়নাথ মুন্সীর অবদান কম নয়। বিশেষ করে হরেন্দ্রনারায়নের সাহিত্যচর্চায় তিনিই ছিলেন মূল উৎসাহদাতা। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণও তাঁর এই সাহিত্য প্রীতি ও ভাষার দক্ষতার কথা স্মরণ করে তাঁকে নিজের মুন্সী রূপে নিযুক্ত করে ছিলেন। এই পদে দীর্ঘদিন থাকার পর তাঁকে খালিশা মহলের সেরাস্তাদারের কাজে নিযুক্ত করা হয়। হরেন্দ্রনারায়নের পুত্র মহারাজা শিবেন্দ্র-নারায়ণ জয়নাথ মুন্সীকে রাজসভার সেরেস্তাদারের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী-কালে তিনি কিছুদিনের জন্য তহশিলদারের কাজও করেছিলেন বলে জানা যায়। আনু-মানিক ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ বৎসর কাল তিনি কোচবিহারের রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভের সময় তিনি অবসর গ্রহণ করে কাশীতে বসবাস শুরু করেন। ১৮৫৮ সালে কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

'রাজোপাখ্যান' সম্পর্কে আমানত উল্লা চৌধুরী, 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা সংখ্যা [২]) উল্লেখ করেছেন—

"এই পুথির (রাজোপাখ্যানের) এক খণ্ড হস্তালিখিত প্রতিলিপি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ করিয়াছেন ; তাহাতে কোচবিহারের ভূতপূর্ব দেওয়ান নীলকমল সান্যালের মোহরাঙ্কন আছে। উহা আধুনিক পুস্তকের আকারে ২৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং চামড়ার বাঁধাই করা। পুঁথিতে লিখিত আছে যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে এই পুঁথি (প্রত্যক্ষ খণ্ডের ১৮শ অধ্যায় পর্যন্ত) পাঠ করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে পুরস্কার স্বরূপ 'পঞ্চগ্রাম' ভূমির নিষ্কর (লাখেরাজ) প্রদান

করিয়াছিলেন।* মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণকেও উক্ত পুঁথি পাঠ করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি উহা পাঠ করিয়াছিলেন কি না পুঁথিতে তাহার সংবাদ নাই। এই পুঁথি রচনার ভিত্তি কি ছিল, ভূমিকায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন, ঃ—

'যোগিনীতন্ত্রে শিববংশীয় রাজা সকলের স্থূল প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা আকল্প পর্যন্ত প্রতি কলিযুগে হইতেছে ও হবেক। বর্তমান কলিযুগে ঐ তন্ত্রসম্মত যে সকল রাজা হইয়াছেন তাঁহাদের প্রস্তাবের যে সকল পুস্তক ছিল প্রায় লোপ হইয়াছে। এবং বৃদ্ধপারম্পর্য্যরূপে যে প্রকাশ ছিল যাঁহারা তদ্বেত্তা ছিলেন এইক্ষণ তাঁহারা অতীত হইয়াছেন। অনুমান হয় ইহার পর এ সকল প্রস্তাব লোপ হইবে। কাহার পর কে রাজা হইয়া কত দিবস রাজত্ব করিয়াছেন ও কতি সংখ্যক রাজা হইয়াছেন এবং শিব সন্তান কত পুরুষ এখনি অনেকে বলিতে পারেন না। তুমি মহারাজ নরনারায়ণের সভাস্ত সর্ববেত্তা উপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব অনুসারে প্রাণনারায়ণ মহারাজার সময় কবিরত্ন যে রাজখণ্ড নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা এবং অপর রাজাদিগের প্রস্তাব মেছর (মার্শী) সাহেব এবং সারবিট (শোভে) সাহেবের বিচার সময় যে সংগ্রহ হইয়াছিল সকল জ্ঞাত আছ। আর মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সভাস্ত লোকের সহিতও তোমার এ সকল প্রস্তাব আলোচনা ছিল।……ইত্যাদি।'

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কমিশনার মার্শী ও শোভের অনুসন্ধানকালে যে সমস্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, জয়নাথ ঘোষ তাহা অবগত ছিলেন, উদ্ধৃত ভূমিকায় এরূপ উক্তি রহিয়াছে। রাজপক্ষ এবং নাজীরের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ ছিল না, এরূপ অনেক আবশ্যক প্রাচীন বৃত্তান্ত কমিশনারের রিপোর্টে মুদ্রিত রহিয়াছে। উক্ত রিপোর্ট ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে (১১৯৫ বঙ্গাব্দে) সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এবং ইহার সাত বৎসর পরে জয়নাথ ঘোষ রাজকার্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; তথাপি রিপোর্টের লিখিত অনেক বৃত্তান্তই রাজোপাখ্যানে নাই।

দরঙ্গের রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, দূত প্রেরণ করিয়া, রাজা বিজয়নারায়ণের নিকট হইতে দরঙ্গ রাজ বংশাবলী পুঁথি আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বংশাবলীর সহিত রাজোপাখ্যানের অনেক অনৈক্য আছে।

সরকার বনাম বিক্রমানন্দ চক্রবর্তীর মোকদ্দমায় (১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৪৮৯ ও ৪৯০ নং সেট্‌লমেণ্ট) রাজোপাখ্যানে লিখিত রাজবংশের কুর্শীনামায় (বংশ লতার) সত্যতার

* কোচবিহারের ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্তী কাগজে জয়নাথ ঘোষের উত্তরাধিকারী দীননাথ ঘোষ প্রভৃতির নামে বখসিসী বলিয়া ৮১৭ বিঘা লাখেরাজ ভূমির কথা উল্লেখ আছে।

বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপিত হইলে, তাৎকালিক দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত লিখিয়াছেন যে, "Joynath Munshi's book is not always quite correct" (জয়নাথ মুন্সীর পুস্তক সর্ব্বত্র শুদ্ধ নহে)। উক্ত মোকদ্দমার প্রার্থীগণ বলিয়াছিলেন যে, সমসাময়িক মহারানী বড় আইদেবতী, কুমার মুনীন্দ্রনারায়ণ, বাবু রতিদেব বক্সী এবং চন্দ্রনাথ তরফদার উকিল,—ইহাদের প্রত্যেকের নিকট এক এক খণ্ড কুর্শীনামা আছে, তাহাদের সহিত জয়নাথ ঘোষের কুর্শীনামার ঐক্য নাই। রতিদেব বখশীর আত্মীয় দুর্গাদাস মজুমদারের লিখিত 'রাজবংশাবলী' নামক গ্রন্থ রতি দেবের পুত্রগণের এবং মহারাণী বৃন্দেশ্বরী বড় আইদেবতীর রচিত 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; কিন্তু উক্ত দুই খণ্ড বংশাবলী রাজোপাখ্যানের তুলনায় ভ্রান্তিপূর্ণ। অন্য দুইখানা কুর্শীনামার কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পরমানন্দ তর্কালঙ্কার প্রণীত (১২০৪ সন, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) বন-পর্বের ভনিতায় প্রদত্ত বংশলতা রাজোপাখ্যানের অনুরূপ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন রংপুরের কালেক্টর মিঃ মুর স্বকীয় মন্তব্যে কোচবিহার রাজবংশের একটি কুর্শীনামা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বের লিখিত কোনও কুর্শীনামা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু এই কুর্শীনামাও রাজোপাখ্যানের তুলনায় ভ্রান্তিপূর্ণ।

জয়নাথ ঘোষ লিখিয়াছেন যে, "রাজোপাখ্যান পুঁথি মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণকে পাঠার্থে প্রদত্ত হইলে তিনি আমার পূর্বপুরুষ প্রাচীন রাজা দিগের কীর্তিচন্দ্র কালরাহু কর্তৃক প্রায় গ্রাসিত হইয়াছিল, তোমার অনুষ্ঠানে ঐ সকল লুপ্ত কীর্তি পুনরায় চিরস্থায়ী হইল—বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী জয়নাথ ঘোষকে বলিয়াছিলে—'কাহার পরে কে রাজা হইয়া কত দিবস রাজত্ব করিয়াছেন ও কতি সংখ্যক রাজা হইয়াছেন এবং শিবসন্তান কত পুরুষ এখনি অনেকে বলিতে পারেন না।' এই সমস্ত অবস্থা এবং মন্তব্য হইতে অনুমিত হয় যে, কোচবিহার রাজবংশের প্রামাণিক বংশ তালিকা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং জয়নাথ ঘোষ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 'রাজোপাখ্যান' রচনা করিয়াছিলেন। 'বৃদ্ধ পারম্পর্য্য' উক্তির (জনশ্রুতির) উপরেও যে তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন, ভূমিকায় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।"

রাজোপাখ্যান

শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতী শরণম্

রাজাবলী

শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণারবিন্দ দ্বন্দ্বমকরন্দ অজ্ঞানতিমিরান্ধ জনসমূহের জ্ঞানাঞ্জনের ন্যায় ; সেইচরণদ্বয় সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তাঁহার চরণোপান্তে কোটি২ প্রণাম পূর্ব্বক, ধরণীধরেন্দ্রতনয়া অখিলব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা শ্রীশ্রীদুর্গার সহিত শ্রীশ্রী আশুতোষ দীনদয়াময়, সদাশিব চরণারবিন্দদ্বন্দ্বে প্রণামান্তর, শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ভূদেব, ব্রাহ্মণসকলের চরণোপান্তে বারংবার প্রণাম করি। শ্রীশ্রীসদাশিববংশ সম্ভব, বিহারাখ্য দেশাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর মহাশয় সদাশয়, দান, মান, গুণ, ধ্যান, ধারণা, কুল, শীল, বল, বীর্য্য, শৌর্য্য ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অস্ত্র, শস্ত্র, শাস্ত্র, নীতি প্রভৃতিতে চরিত্রবান্। তিনি নিতান্ত শান্ত ও দান্ত। বিদ্যা, বিনয়, বিচার, রাজলক্ষণ, রাজব্যবহার, শরণাগতজন প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং রূপ লাবণ্যাদিতে তুলনা রহিত ; রিপুকুল বল পঙ্কের তিনি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বিবরণ সংক্রান্ত প্রাচীন সংবাদ শ্রবণ ঐহিক ও পারত্রিক শুভদায়ক। যেহেতু তাঁহারা শিবসন্তান সুতরাং প্রত্যেক নৃপতিই গণেশতুল্য। অতএব নিবেদন করিতেছি যে সম্প্রতি ভূপতির মন্ত্রী-বর্গের অগ্রগণ্য মহামন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় সর্ব্বগুণাধার ও সকল প্রশংসার প্রশংসিত. মন্ত্রণায় ইন্দ্র সভায় বৃহস্পতি ও শ্রীশ্রীরঘুনাথের সভায় বশিষ্ঠের ন্যায়, তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে, "দ্বাপর যুগের অবসান পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্র-বংশীয় নৃপতি সকলের কীর্ত্তিকাহিনী মহাপুরাণাদি শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে, যোগিনী তন্ত্রে শিববংশীয় রাজা সকলের স্থূল প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহা আকল্প পর্য্যন্ত প্রতি কলিযুগে হইতেছে ও হইবে। বর্ত্তমান কলিযুগে ঐ তন্ত্র সম্মত যেসকল রাজা হইয়াছেন তাঁহাদের বিষয় যেসকল পুস্তক ছিল তাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং বৃদ্ধ পরম্পরায় যেসকল জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল এক্ষণে তাঁহারাও ক্রমে২ পরলোকগত হওয়ায় মনে হয় ইহার পর এই সকল প্রস্তাব সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে। কাহার পর কে রাজা হইয়া কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, কত জন

রাজা হইয়াছেন এবং শিবসন্তান নৃপতিগণের এ পর্য্যন্ত কত পুরুষ হইল তাহা এখনই অনেকে বলিতে পারে না। তুমি মহারাজ নরনারায়ণের সভাস্থ সর্ব্ববেত্তা উপাধ্যায় যোগিনীতন্ত্রে বর্ণিত প্রস্তাব অনুসারে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং প্রাণনারায়ণ মহারাজের সময় কবিরত্ন "রাজখণ্ড" নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য রাজাদিগের সম্বন্ধে মার্শী (Mercer) ও শোভে (Chauvet) সাহেবের বিচার কালে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত আছে। আর মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণের সভাস্থ লোকের সহিতও তোমার এই সকল প্রস্তাবের আলোচনা হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার চতুর্থ কাল উপস্থিত, শরীর অনিত্য অতএব তন্ত্র সম্মত এবং উল্লিখিত প্রস্তাবাদি অনুসারে সঙ্কলিত যাবতীয় বিষয় তুমি যথাক্রমে, লিপিবদ্ধ করিয়া রক্ষা কর।" আমি নিবেদন করিলাম, "আমি শাস্ত্রবেত্তা নহি এবং গদ্য ও পদ্যদ্বারা পদবন্ধ করিতেও সম্পূর্ণ অশক্ত ; রাজদ্বারে উশনার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও কবিগণ বিরাজ করিতেছেন এবং ভূপতি স্বয়ং বাক্‌পতির ন্যায় মহাকবি। ইঁহারা উপস্থিত থাকিতে আমার এই প্রস্তাব রচনা করা পাটের সূতায় গজমুক্তা গ্রন্থন করা এবং রাঙ্গে রত্নাদি খচিত করার ন্যায় বিসদৃশ হইবে।" তাহাতে দেওয়ান আজ্ঞা দিলেন যে "যেমন বাদসাহদিগের তত্তারিখ রাজাবলী আদি প্রস্তাব গৌড়ীয় ভাষাতে আছে তুমি সেইরূপ রচনা কর।"

অতএব মহামন্ত্রীর আদেশে আমি শিববংশীয় রাজগণের কাহিনী রচনা কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যেহেতু হীরা দেবীর জন্ম ও মহারাজ বিশ্বসিংহের ইতিবৃত্ত দেবতার কার্য্য এজন্য তৎসম্বন্ধীয় ১২ অধ্যায় 'দেবখণ্ড' মহারাজ নরনারায়ণ হইতে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের পুনর্ব্বার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত যে ২১ অধ্যায় লিখিত হইল তাহা 'নরখণ্ড' এবং শ্রীশ্রীমহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজত্বকাল যাহা আমার চাক্ষুষ দেখা তাহা ১৮ অধ্যায়ে লিখিত এবং 'প্রত্যক্ষখণ্ড' নামে অভিহিত হইল, এই তিন খণ্ড মোট ৫১ অধ্যায়ে সমাপ্ত করিয়া এই পুস্তকের নাম 'রাজোপাখ্যান' রাখিলাম। শ্রীশ্রীমহাদেব হইতে শ্রীশ্রীভূপাল কত পুরুষ ব্যবধান তাহা প্রথমে বলিতেছি। জগৎকারণ শ্রীশ্রীমহাদেব, তাঁহার পুত্র মহারাজ বিশ্বসিংহ ১, তাঁহার পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ ২, তাঁহার পুত্র মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ৩, তাঁহার পুত্র গোসাঞী মহীনারায়ণ ৪, তাঁহার পুত্র জগৎনারায়ণ কুঙর ৫, তাঁহার পুত্র মহারাজ রূপনারায়ণ ৬, তাঁহার পুত্র খড়্গনারায়ণ দেওয়ান দেও ৭, তাঁহার পুত্র মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ৮, তাঁহার পুত্র শ্রীশ্রীমহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ৯, সদাশিব হইতে নবম পুরুষ। আর শিব সন্তান মহারাজ বিশ্ব সিংহ হইতে কত জন রাজা হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। মহারাজ বিশ্ব সিংহ ১, তাঁহার পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ ২, তাঁহার পুত্র মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ৩, তাঁহার পুত্র মহারাজ বীরনারায়ণ ৪, তাঁহার পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণ ৫, তাঁহার পুত্র মহারাজ মোদনারায়ণ ৬, তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ বসুদেব

নারায়ণ ৭, তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ ৮, তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের প্রপৌত্র মহারাজ রূপনারায়ণ ৯, তাঁহার পুত্র মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ ১০, তাঁহার পুত্র মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ১১, তাঁহার পিতামহ মহারাজ রূপনারায়ণের পৌত্র মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ১২, তাঁহার জীবিত কালেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৩, তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মহারাজ ধরেন্দ্র নারায়ণ ১৪, ঐ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার, তাঁহার পুত্র শ্রীশ্রীমহারাজ হরেন্দ্র-নারায়ণ ১৫, এই পঞ্চদশ রাজার বিবরণ এই রাজোপাখ্যানে লিখিলাম। পাঠক ও শ্রোতা মহাশয়দিগের নিকট আমার এই নিবেদন যে আমার গদ্য ও পদ্য রচনা পদ্ধতি বিচার না করিয়া এই প্রস্তাব যে কি প্রকার আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব তাহাই শ্রবণ করুন আর যদি কেহ এই উপাখ্যান রাজাদেশ অনুসারে শ্লোকচ্ছন্দে অথবা পদবন্ধে কবিতা করিবার কিংবা পুনরায় গদ্যে লিখিবার ইচ্ছা রাখেন তাঁহাদের প্রতি আমার এই নিবেদন যে তাঁহারা যেন আমার নামসহ ভণিতা দেন তাহা হইলে শ্রোতৃবর্গের বিশ্বাসের কারণ হইবে। এক্ষণে আমার আত্ম পরিচয় এই আমি বঙ্গজ কায়স্থ কুলোদ্ভব, আমার নাম শ্রীজয়নাথ ঘোষ, ভূপতির দত্ত উপাধি মুনশী, সেজন্য লোকে 'জয়নাথ মুন্‌শী' বলে।

ভূতপূর্ব্ব কুচবিহারাধিপতি মহারাজ
হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর
(প্রাচীন চিত্র হইতে)

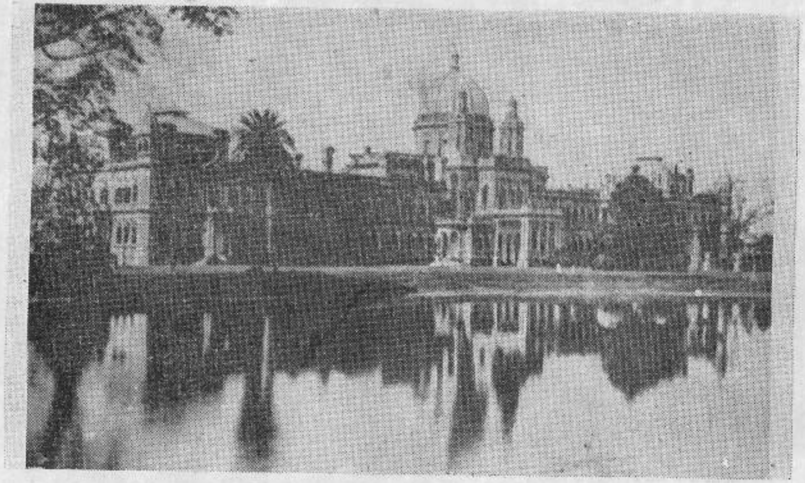

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

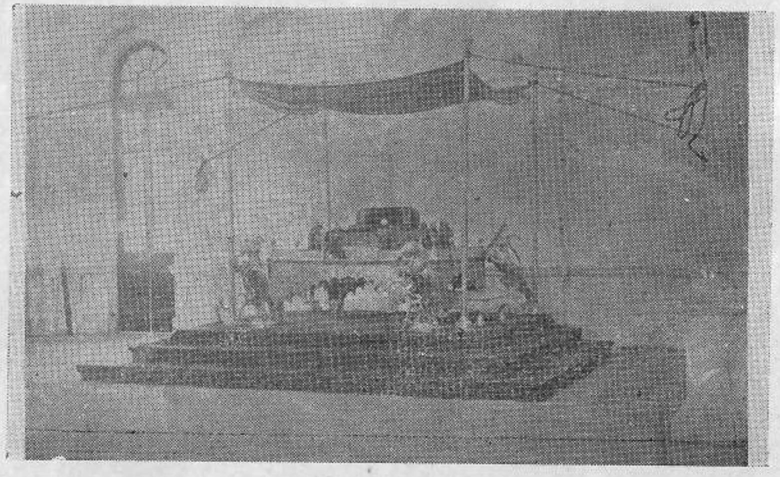

প্রাচীন রাজসিংহাসন

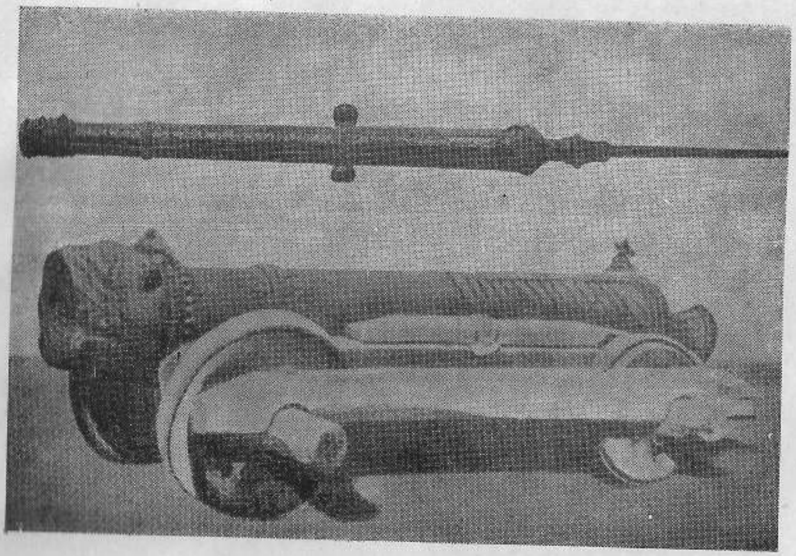

মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের জলযুদ্ধের কামান এবং মহারাজা রঘুদেব নারায়ণের ১১ ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট কামান

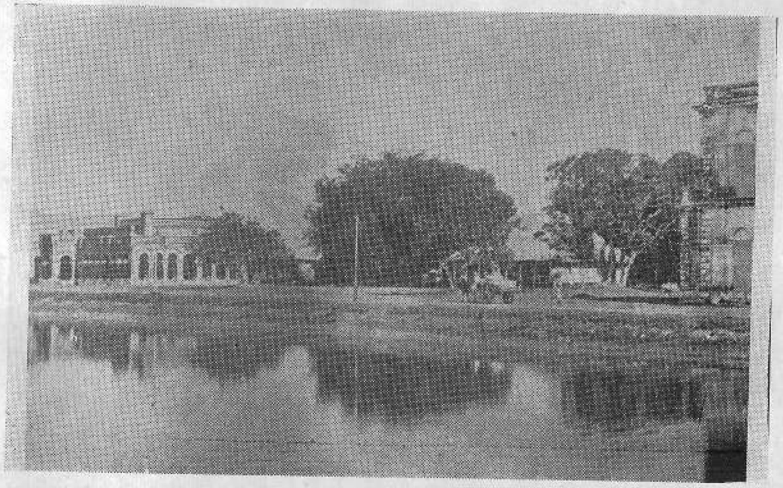

সাগর দীঘির পূর্ব দিক

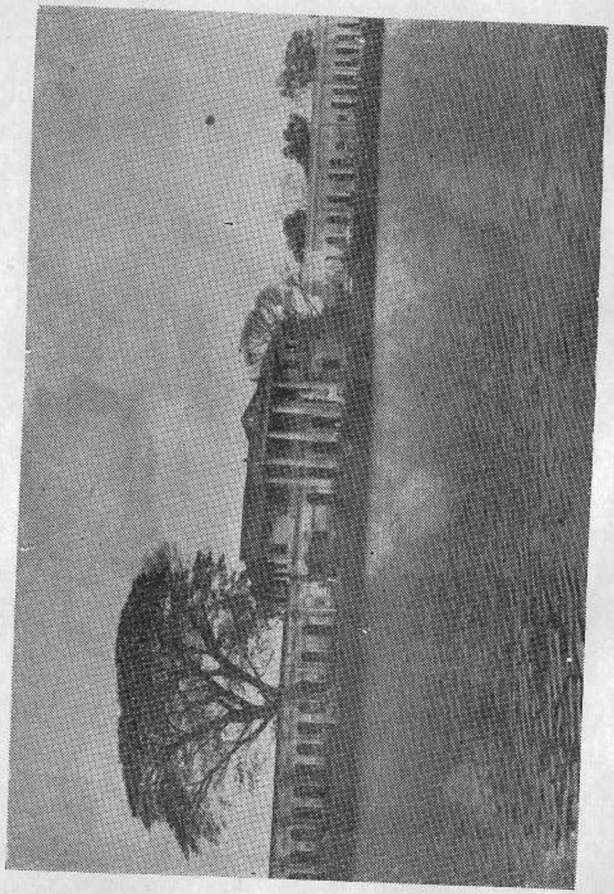

সাগর দীঘির উত্তরদিক পুরাতন জজকোর্টটি
মাঝখানে অবস্থিত ছিল

জুবলী টাওয়ার
(ভবানীগঞ্জ বাজারের দক্ষিণ দিকে লালদীঘির পারে অবস্থিত ছিল)

কামতেশ্বরী মন্দির (গোঁসানীমারী)

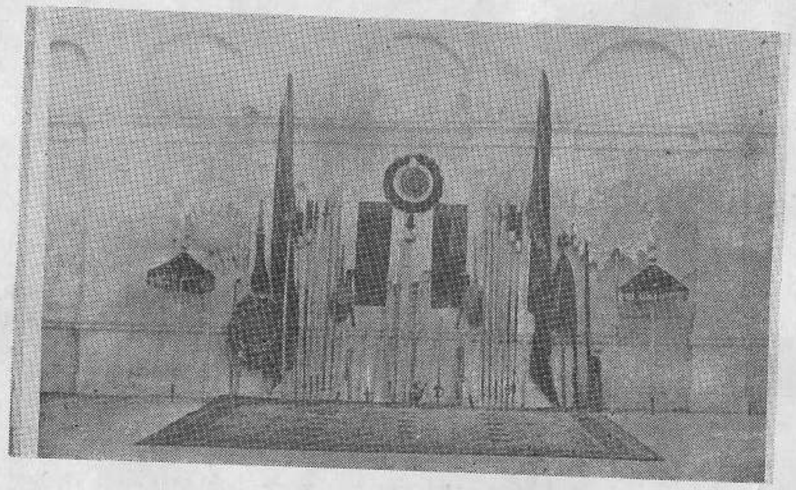

কোচবিহার রাজসরকারের প্রতীক সমূহ

দেব খণ্ড

রাজোপাখ্যান

প্রথম অধ্যায়

৺শ্রীশ্রীবিশ দুর্গার্থে নমঃ

(যোগিনী তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটল শিব পার্ব্বতী সংবাদ)

শ্রীশ্রীমতী ভগবতী স্তব পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীশ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "হে দেবদেব মহাদেব তুমি পরাৎপর বিরিঞ্চি আদি দেবতাদিগের ধ্যানের অগোচর, কত যোগীন্দ্র তোমাকে বহুকাল তপস্যা করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারিতেছেন না। তুমি যে ভিক্ষার ছলে কুচনীপাড়ায় হীরা কুচনীর গৃহে সর্ব্বদা গমন কর আমার প্রতি কৃপা পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া বর্ণনা কর যে ঐ হীরা কুচনী কি প্রকার সুন্দরী এবং কি তপস্যায় সে তোমাকে অনায়াসে পাইয়াছে।" মহাদেব ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমতী ভগবতীকে বলিলেন, "হে মহেশ্বরি! তোমা হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, যাবতীয় প্রকৃতি তোমার অংশ এবং তোমারই স্বরূপ তোমার অবিদিত কি আছে ও তুমি কি না জান? তবে রহস্য করিয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা যথার্থরূপে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে তুমি কোটি যোগিনী ও সহস্র২ সহচরী সমভিব্যাহারে এক আম্র কাননে আমার সহিত রসাদি নানা ক্রীড়া ও লীলা করিয়াছিলে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বহুল্য মাত্র। ঐ সময় মাধবী নাম্নী এক যোগিনী রতি সম্ভোগে তৃপ্ত না হইয়া আমাকে পতিরূপে পাইবার বাঞ্ছায় বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। অনাহারে অনিদ্রায় প্রায় বাহ্যজ্ঞান রহিতা হইয়া মদগতচিত্তা ছিল। তাহার তপস্যা সিদ্ধির প্রাক্‌কালে এক ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণ ভিক্ষা অন্বেষণ করিতে২ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিল কিন্তু মাধবী ধ্যানস্থা ও অন্য জ্ঞান রহিতা অবস্থায় থাকায় কোন উত্তর দিল না এবং ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাও দিল না তাহাতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিল যে "ম্লেচ্ছ অর্থাৎ কুচনী হও।" তখন মাধবী নিতান্ত কাতর ও ভীত হইয়া ব্রাহ্মণকে এই বলিয়া অনেক স্তুতি করিতে লাগিল যে, "আমি অবলা নারী অজ্ঞতা বশতঃ আমার বহুকালের তপস্যা বৃথা হইল, হে প্রভু আমার প্রতি কৃপাবলোকনে কিঞ্চিৎ দয়া করুন।" তখন ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "হে মাধবি! তুমি ক্ষেদ করিও না, তোমার তপস্যা বৃথা হইবে না, তুমি কোচ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবে। তিনি আশুতোষ, তোমাকে অনুগ্রহ করিবেন। মহাদেবকে যে তপস্যা করে তাহার তপস্যা কখনও নিষ্ফল হয় না। হে পার্ব্বতি, সেই মাধবী কালক্রমে কামরূপ

ক্ষেত্রে চিকিনা পর্ব্বতে 'হীরা কোচনী' নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভিক্ষাচ্ছলে আমি আমি তাহার নিকট যাতায়াত করিয়া তাহার তপস্যার ফলদাতারূপে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করি। হীরা সুকঠীন স্তনী, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আর কি ব্যাখ্যা করিব, তাহা অতি সুন্দর। আরও বলিতেছি শ্রবণ কর, হীরা যে কেবল এই জন্ম লাভ করিয়াছে আর জন্মে নাই বা জন্মিবে না তাহা নহে কল্পান্ত পর্য্যন্ত হীরা প্রতি কলিযুগে যখন কামরূপ ক্ষেত্র তিনশত বৎসরের জন্য বশিষ্ট মুনির অভিশাপে অভিশপ্ত থাকিবে তখনই তাহার পূর্ব্বকালে কামরূপ ক্ষেত্রে চিকিনা পর্ব্বতে হীরার জন্ম হইবে এবং হীরার গর্ভে বিশু নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া 'মহারাজ বিশ্বসিংহ' নামে খ্যাত হইয়া কামরূপ ও সৌমার দেশ এবং পঞ্চগৌড় অধিকার করিয়া খণ্ডেশ্বর রাজা হইবে। বিশ্বসিংহ ও তাঁহার সন্তান যাঁহারা রাজা হইবেন তাঁহারা সকলেই কৈলাসের পরিষদ, মর্ত্তের সুখ ভোগ করার জন্য বিশ্বসিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা হইবেন। ইঁহারা বহুস্ত্রী সম্ভোগী হইবেন, দেব কন্যা সকল সুখাভিলাশিনী হইয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বসিংহের সন্তান রাজাদিগের পত্নী হইবেন। রাজা সকল ঐ সকল দেব কন্যাদিগের সহিত ক্রীড়া করিবেন। রাজা বিশ্বসিংহের বহু পুত্র হইবে। তাঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত এবং রণ দুর্ম্মদ হইবেন। তাঁহাদিগের ভাষা যদিও কুৎসিত হইবে তথাপি তাঁহারা মহাত্যাগী ও ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত হইবেন। হে গিরিসুতে, শ্রবণ কর, যোগিনীদিগের মধ্যে নন্দী মাতা জয়া যেমন, হীরাকেও সেইরূপ জানিবে। পুত্রদের মধ্যে বিজয়ার পুত্র ভৃঙ্গী যেরূপ বিশ্বসিংহকে সেইরূপ জ্ঞান করিবে। বিশ্বসিংহ কলিযুগান্ত পর্য্যন্ত যোগাশ্রমে থাকিবে এবং হীরা, বিশ্বসিংহ ও তৎসন্তান রাজা সকল কল্পান্তে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। ইতি রাজোপাখ্যানে দেব খণ্ডে হর পার্ব্বতী সংবাদে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

(যোগিনী তন্ত্রে পটলান্তরে)

পার্ব্বতী শিববাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "হে ভক্তবৎসল আশুতোষ, হীরা ও বিশ্বসিংহের জন্ম বিবরণ শুনিয়া নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইলাম এবং জানিলাম হীরা আমা হইতে ভিন্ন নহে এবং বিশ্বসিংহ আমারই পুত্র। এক্ষণে কামরূপ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শুনিতে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণনা করুন আমি জানি কামরূপ হিমালয় দত্ত যৌতুক স্থান।" মহাদেব বলিলেন "কামরূপ মহাতীর্থ, তাহার মাহাত্ম্য যোগিনীতন্ত্রে ও কালিকা পুরাণাদিতে প্রকাশিত আছে। যে স্থানে দেবতারা পর্য্যন্ত মরণ কামনা করেন, সেখানে মানুষের আর কথা কি? সেই ক্ষেত্রে, নীলাচল পর্ব্বতের মনোভাব গুহায় পাষাণরূপিনী মহাপীঠ

বিদ্যমান। তাঁহাকে দর্শন মাত্র জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেখানে তুমি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছ। আর কামপীঠে জল্পীশ্বর বিহার করিতেছেন। কামপীঠে নানাস্থানে নানাতীর্থ আছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই ক্ষেত্রের সীমা করতোয়া হইতে দীকৃকর বাসিনী পর্য্যন্ত। এই স্থান মধ্যে ভদ্রপীঠ, রত্নপীঠ, কামপীঠ ও সৌমার পীঠ এই চারি পীঠ আছে। আর যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহা হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর সহিত সংলগ্ন। ঐ সকল পর্ব্বত হইতে অনেক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই ক্ষেত্র বিদীর্ণ করিয়া মহানদ ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়াছে। পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ধরলা, ত্রিস্রোতা, জটোদা, ঘর্ঘরা, স্বর্ণকোষ আদি নদী গঙ্গা সদৃশ অতি পবিত্র। এই স্থান মধ্যে নানা জনপদ ও নানা পুরী যথা প্রাগ্‌ জ্যোতিষপুর ও রত্নপীঠ নানান্তরে কামতাপুরী, জল্পীশ্বর, বেহার প্রভৃতি। বেহার নামক দেশ অতি উর্ব্বর, তাহার গৃহে২ তোমার অধিষ্ঠান, অতি কমনীয় স্থান।" তখন ভগবতী কহিলেন "হে প্রভো! হীরা কোচনী, কোঁচদিগের কি প্রকারে উৎপত্তি হইল?" মহাদেব ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন "শ্রবণ কর, সত্যযুগে যমদগ্নী মুনির পুত্র পরশুরাম ত্রিসপ্ত বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সকল নষ্ট হইল কেহ২ প্রাণভয়ে পলাইয়া কামপীঠে আসিয়া আচার ভ্রষ্ট হইয়া সঙ্কোচিত মনে থাকিল, কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত আমরা 'সংকোচ' এইরূপে কোচ জাতির উৎপত্তি। কোচ বর্ণ সঙ্কর নহে। প্রথমতঃ ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পলায়ন, দ্বিতীয়তঃ আচার ভ্রষ্টতা, এই জন্য হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা কোচ হীনজাতি নহে, পরন্ত দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ই বটে।" ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "কামরূপ ক্ষেত্রে কে রাজা হইবে? মহাদেব উত্তর দিলেন "কামরূপে নীলাচল পর্ব্বতের সন্নিকটে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং স্বর্ণকোষ নদীর পশ্চিম কামপীঠ; তন্মধ্যে জটোদকার উত্তর পারে রত্নপীঠ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া পূর্ব্বকালে পৃথিবীর গর্ভে শ্বেত বরাহের পুত্র নরক কামরূপের রাজা হন। দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার পুত্র ভগদত্তকে রাজা করেন। তাহার বংশ শেষ হইলে কালান্তে বাণ নামক অসুর রাজা হইয়াছিল। এই প্রকারে অনেক রাজা অতীত হইলে বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে পুনরায় নরক রাজা কামতাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া কান্তেশ্বর নামে রাজা হইয়া অনেক রাজ্য জয় করিবে। তাহার রাজত্ব ধ্বংসের পর কামরূপ কিছুকাল অরাজক অবস্থায় থাকিবে পরে তোমার বংশ হীরা দেবীর গর্ভে বিশ্বসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ও বীর্য্যমান হইয়া নিজ বলে কামরূপ, সৌমার, পঞ্চগৌর ও তিব্বত আদি দেশ জয় করিয়া রাজা বিশ্বসিংহ নামে খ্যাত হইয়া রাজ্য ভোগান্তে যোগশ্রম গ্রহণ করিবে। তৎপর

"ন ল বী প্র মকারান্তে বিশোর্ব্বংশো বিনঙ্ক্ষ্যতি।
অত উর্দ্ধং মহাদেবি কুপুত্রঃ পালয়েন্মহীম্।"

অর্থাৎ বিশ্বসিংহের সন্তান নকারাদি নরনারায়ণ, তাহার পুত্র লকারাদি লক্ষ্মীনারায়ণ, তাহার পুত্র বীকারাদি বীরনারায়ণ, তাহার পুত্র প্রকারাদি প্রাণনারায়ণ, তাহার পুত্র মকারাদিঃ মোদনারায়ণ রাজা পরলোক গমন করিলে বিশ্বসিংহের পুত্র পরম্পরা রাজত্ব লাভ শেষ হইবে। তাহার পর রাজার পুত্র রাজা হওয়ার যে শৃঙ্খলা তাহা শেষ হইবে এবং 'কুপুত্র' পৃথিবী পালন করিবে অর্থাৎ রাজার পুত্র রাজা না হইয়া রাজার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা তাহাদিগের বংশের অপর কেহ রাজা হইবে। তৎকালে রাজাদিগের বিবাহিতা রাণীর গর্ভজাত পুত্রগণ দীর্ঘায়ু হইবে না পরন্তু রাজাদিগের শূদ্রবৎ ব্যবহার হইবে। শূদ্রের দুই প্রকার ভার্য্যা ঊঢ়া ও অনূঢ়া। ঊঢ়া বিবাহিতা পত্নী, অনূঢ়া অবিবাহিতা যাহাকে পত্নীভাবে রাখা হয়, তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহাকে 'কুপুত্র' বলি কারণ তাহাকে বিশ্বসিংহের সন্তান বলা যায় না। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষের মহিমা কি প্রকার তাহা সকলে শ্রবণ করুন। রাজা জনমেজয় যেমন পূর্ব্ব পুরুষের বিবরণ শ্রবণ করিয়া ঐহিক অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে নিস্তার পাইয়াছিলেন সেইরূপ ভূপতির পূর্ব্বপুরুষের পবিত্র চরিত্রের গুণকার্ত্তন শ্রবণ করিলে ঐহিক পাপ মুক্তি ও অন্তিমকালে শুভদায়ক হয়।

আমার যতদূর জ্ঞান ও স্মরণ আছে তাহা হইতে নিবেদন করিতেছি যে যোগিনী-তন্ত্রানুসারে প্রতি কলিযুগে হীরা দেবীর জন্ম হয় এবং যথাকালে লয় হয়। শ্বেত বরাহ কল্পের চতুর্দ্দশ মন্বন্তর মধ্যে বর্ত্তমানে বৈবস্বত নামে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। প্রতি মন্বন্তরে একাত্তর দিব্য যুগ, তন্মধ্যে সপ্তবিংশতি দিব্যযুগ অতীত হইয়া অষ্টবিংশতি দিব্য যুগ মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগ অতীত হইয়া বর্ত্তমান কলিযুগে রাজা কান্তেশ্বর যথেষ্ট আধিপত্য সহকারে রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার কৃত গড়, দিব্য পুষ্করিণী, রাজপাট, প্রস্তর ও ইষ্টকময় অন্যান্য নানাবিধ কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় তিন শত বৎসর কামপীঠে অরাজকতা ছিল।

কলিযুগের ৪৫৮১ বৎসর অতীত হইলে কামরূপ ক্ষেত্রে চিকনা পর্ব্বতে কোচগৃহে হীরা দেবী জন্ম গ্রহণ করিলেন। হীরা দেবীর জন্ম হওয়াতে পৃথিবী শস্যশালিনী, গাভী সকল পয়স্বিনী ও বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পান্বিত হইল। মেঘ যথাকালে বর্ষণ করিতে লাগিল

ও লোক সকল ধর্ম্মভীরু হইল। হীরা দেবী চন্দ্র কলার ন্যায় দিন২ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অষ্টমবর্ষ বয়সে হীরা দেবীর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জীরার বিবাহ চিকিনা পর্ব্বত নিবাসী হাড়িয়া নামান্তরে হরিদাস মেচের সহিত সম্পন্ন হইল। হরিদাস হীরা দেবীর জন্য দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং জীরার জন্য পৃথক মন্দির নির্ম্মাণ করিল। জীরা বয়ঃপ্রাপ্তা ছিলেন তাঁহার সহিত সহবাসে হরিদাসের ক্রমে২ দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল; জ্যেষ্ঠের নাম চন্দন ও কনিষ্ঠের নাম মদন রাখিলেন। হীরাদেবী জাতিস্মরা ছিলেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পূর্ব্ব জন্ম জন্মান্তরের বিবরণ স্মৃতি পথে উদিত হইল। তিনি সর্ব্বদা মহাদেবের পাদপদ্ম ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। প্রত্যহ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া পর্ব্বতের প্রান্তস্থিত নদীতে স্নানাবগাহন করিয়া তটস্থিত 'বুড়ীর মণ্ডপ' নামক দেবস্থানে বনপুষ্প ও বিল্বপত্র আহরণ করিয়া পার্ব্বতী সহকারে মহাদেবের পূজা করিয়া ধ্যানস্থ ও তদ্গতচিত্ত হইয়া থাকিতেন। যদি হরিদাস হীরাদেবীর গৃহে কখনও আগমন করিতেন তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লীবত্বপ্রাপ্ত হইতেন। হীরা দেবীর সহিত কখনও তাঁহার সহবাস হয় নাই, কিন্তু তিনি হীরাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং সর্ব্বদা মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সাধন করিতেন। হীরাদেবী সর্ব্বদা মহাদেবের বিচ্ছেদে বিরহিনী, দীনা, ক্ষীণা, মলিনা হইয়া অহরহঃ 'শিব' 'শিব' শব্দ করিতেন এবং এই চিন্তা করিতেন যে কত দিনে ভগবান তাঁহাকে কৃপা করিবেন। তিনি ভাবিতেন 'এও কি সম্ভব, যে মনুষ্যদেহধারী, সর্ব্বদা অপবিত্র শরীর, আমাকে কি ত্রিলোকেশ্বর পাদ পদ্ম দ্বারা স্পর্শ করিবেন?" আবার কখনও ভাবিতেন "মহাদেব, আশুতোষ, ভক্তবৎসল আমার প্রতি অবশ্যই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হইবে।" ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়

হীরা দেবীর বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর তখন মহাদেব মাধবীর বিচ্ছেদে উদ্ভ্রান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার অন্বেষণে ভিক্ষার ছলে কোচনী পাড়াতে আগমন করিতেছেন। সে কি প্রকার তাহা শ্রবণ করুন। শুভ্র বৃষভারোহণ করিয়াছেন আন্দোলিত পিঙ্গল জটাভার পৃষ্ঠদেশে নিপতিত, তন্মধ্যে গঙ্গা কুলু২ শব্দ করিতেছেন, কটিদেশলগ্ন ব্যাঘ্র চর্ম্ম বাসুকির পুচ্ছদ্বারা বিজড়িত, ঐ সর্প দেহ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধের উপর ফণা ধারণ করিয়া কখন২ ফুৎকার করিতেছে। রজতবর্ণ শরীর চিতাধূলি ধূসরিত, কণ্ঠ দেশ নীলবর্ণ, নীলকান্ত মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে, গলদেশে হাড়মালা বিরাজিত, বাম হস্তে শৃঙ্গ, দক্ষিণ হস্তে ডমরু, ভিক্ষারঝুলি স্কন্ধে, ভাঙ্গ ও ধুস্তুর ফল ভক্ষণে আরক্ত চক্ষু ঢুলু২ করিতেছে। কখনও

কথনও কপালস্থিত নেত্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। বম্ বম্ শব্দে গাল বাদ্য করিতে করিতে মহাদেব কোচনীদিগের আলয়ে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গ ফুৎকার করিলেন।

শৃঙ্গ ধ্বনি শ্রবণমাত্র বাংলা বৃদ্ধা যুবতী কোচনীগণ আগমণ করিয়া তাঁহার চতুস্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া কেহ২ তাঁহাকে ভিক্ষার তণ্ডুল প্রদান করিল, কেহ২ ধুস্তুর পুষ্প আনিয়া তাঁহার কর্ণোপরি স্থাপন করিল, কেহ২ নবীন পল্লবাদি আনিয়া বৃষকে ভক্ষণ করিতে দিল কেহ২ শুষ্ক ভাঙ্গের পত্র আনিয়া দিল, কেহবা বলিল "হে যোগী! তুমি পুনর্ব্বার শিঙ্গা বাদ্য কর, তোমার শিঙ্গা ধ্বনির ন্যায় সুমিষ্ট শব্দ আর কথনও শুনি নাই"। কেহ বলিল "হে বৃদ্ধ, তুমি আবার গালবাদ্য কর শ্রবণ করি, আরও কিছু তণ্ডুল তোমাকে প্রদান করিব।" এক কোচনী তাহার মূর্চ্ছাগত শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আনিয়া কহিল "হে বৃদ্ধযোগী! তুমি এই বালককে কিছু ঔষধ প্রদান কর।" মহাদেব কটাক্ষে ঐ বালককে অবলোকন করিলেন এবং বালক তৎক্ষণাৎ সজীব হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। কোচনীগণ ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যোগীকে পরম আপ্যায়িত করিতে লাগিল এবং বলিল "হে যোগী, তুমি প্রত্যহ আমাদের এথানে আসিও আমরা তোমাকে যথেষ্ট তণ্ডুল প্রদান করিব এবং ভাঙ্গ ধুতরা যত থাইতে পার তাহা দিব।" মহাদেব এই প্রকারে নিত্য কোচনী পাড়াতে গমন করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

এক দিবস অপরাহ্ন কালে শুভলগ্নে মহাদেব হীরা দেবীর আলয়ে আগমন করিয়া দেখিলেন হীরা দেবী অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন এবং সম্মুখে একটি ময়ূর পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছে। দ্বার প্রান্তে অবস্থিত পুষ্পিত বকুল বৃক্ষে ভ্রমরগণ গুন্২ শব্দ করিতেছে এবং কোকিলগণ কুহু২ ধ্বনি করিতেছে। অতিরম্য সেই স্থানে বকুল বৃক্ষের ছায়াতে বৃষোপরি অবস্থিত হইয়া মহাদেব কহিলেন "সুন্দরি! ভিক্ষাং দেহি।" হীরা শ্রবণ মাত্র প্রণাম করিয়া শুদ্ধ পাত্রে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন "আমি তণ্ডুল ভিক্ষা লইব না তোমার রূপ লাবণ্য দেখিয়া চিত্ত অতি চঞ্চল হইয়াছে, আমাকে রতি ভিক্ষা প্রদান কর।" তথন হীরা দেবী বস্ত্রাঞ্চলে মুখাবৃত করিয়া অধোবদনে বলিতে লাগিলেন "হে বৃদ্ধ যোগী, তুমি কত কাল কত তপস্যা করিলে এবং কত তীর্থ পর্য্যটন করিলে এক্ষণে সেই সকল উপেক্ষা করিয়া পরস্ত্রীতে লোভ কর এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? আমি কুলবধূ আমার স্থানাধিপতি তুরকা কোতওয়াল ইহা শুনিলে তোমার এই বৃদ্ধ বৃষভটি কাড়িয়া লইবে এবং ভিক্ষার ঝুলি পোড়াইয়া দিয়া তোমাকে বহু

অপমান করিবে, তোমাকে আরও কিছু তণ্ডুল দিতেছি তাহা লইয়া তুমি শীঘ্র স্থানান্তর গমন কর।"

মহাদেব পুনরায় বলিলেন "হে চন্দ্রাননে! আমি তপস্যা উপেক্ষা করিয়া তোমাকে তোমার তপস্যার ফল প্রদান করিতে আসিয়াছি। আমাকে কামসমুদ্রে মগ্নজ্ঞান করিয়া হস্ত ধরিয়া উদ্ধার কর।" হীরা দেবী কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই অন্তরে জানিলেন যে ইনিই আশুতোষ সদাশিব, তিনি সকল রূপই ধারণ করিতে পারেন। তথন তিনি রহস্যচ্ছলে কহিলেন "হে বৃদ্ধ! জানিলাম তুমি যোগী নও, যোগেশ্বর; তোমার শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু, বায়ুতে দন্ত বিকম্পিত; সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম, গলাতে হাড়মালা, কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মবৃত, সকলি অমঙ্গল দেখিতেছি; এখন কোন কুলকামিনী আছে যে তোমাকে আলিঙ্গন দিবে? তুমি যেমন বৃদ্ধ যোগী সেইরূপ একজন বৃদ্ধা যোগিনী অন্বেষণ কর।" মহাদেব কহিলেন "আমার যত অমঙ্গল দেথ সকলি মঙ্গলদায়ক।" এইরূপ রহস্যময় বাক্‌চাতুরীতে দিবাকর অস্তগামী হইলেন। হরিদাস নগর হইতে হীরার আলয়ে উপস্থিত হইলে, মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। হীরা সসম্ভ্রমে হরিদাসকে আসন ও তাম্বুল প্রদান করিলে। হরিদাস বলিলেন "হীরা আমি শুনিয়াছি কোচনী পাড়াতে প্রত্যহ এক বৃদ্ধ যোগী ভিক্ষার্থে আগমন করেন, তিনি যাহাকে যে বর দেন তাহাই সিদ্ধ হয়, অতএব তুমি তাঁহার নিকট পুত্র বর কামনা কর, তিনি সানুকুল হইলে অবশ্যই তোমার পুত্র লাভ হইবে।" হীরা বলিলেন "আচ্ছা" মনে২ ভাবিলেন "অনুজ্ঞা হইল।" হরিদাস হীরার গৃহে গমন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

তৎপর যাহা হইল শ্রবণ করুন। হরিদাস হীরার গৃহে গমন করিলে হীরা দেবী যোগীকে অন্তর্হিত দেখিয়া "উৎকণ্ঠিতার" ভাব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কথনও বসেন কথনও উঠেন কথনও ঘরে কথনও বা বাহিরে যাইয়া চতুস্পার্শ্বে অবলোকন করেন। মহাদেবকে না দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া 'শিব' 'শিব' শব্দ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তবৎসল সদাশিব হীরা দেবীর মনোবাঞ্ছা জানিয়া অতি মনোমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। হীরা দেবী দর্শনমাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইলেন এবং নানা প্রকার রসরঙ্গে রজনী প্রভাত হইল। এই প্রকারে মহাদেব ভিক্ষারছলে কোচনী পাড়াতে গমনাগমন করিয়া হীরা দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে হীরা দেবীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাহাকে দেখিয়া মহাদেব বলিলেন "শিশুটি সুন্দর হইবে।" মহাদেব 'শিশু' বলিয়া সম্বোধন করায় তাহার নাম হইল 'শিশু'। কিয়ৎকাল পরে হীরা দেবী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন। কখনও২ মহাদেব পর্য্যঙ্কে বসিয়া হীরা দেবীর নিকট যোগশাস্ত্র বলিতেন, বিশ্বসিংহ হীরা দেবীর উদরে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া যোগশিক্ষা করিলেন। দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইলে ১৪২২ শকাব্দে (যাহাতে বাঙ্গলা ৯০৭ সন হয়) মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসে হীরাদেবী পূর্ণচন্দ্র সদৃশ এক পুত্র প্রসব করিলেন। জন্মমাত্র স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। চিকিনা পর্ব্বত-নিবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন হীরা ভাগ্যবতী বটে কারণ তাঁহার গৃহে এইরূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তৎপর মহাদেব আজ্ঞা করিলেন "তোমার বিশ্ববিজয়ী পুত্র হইল ইহার নাম 'বিশ্বসিংহ' হইবে অর্থাৎ বিশ্বমধ্যে সিংহের ন্যায় হইবে" তখন হীরা দেবী নিবেদন করিলেন "প্রভো! 'শিশুর' নামটি উচ্চারণ যেমন সহজ সেইরূপ এই পুত্রেরও একটি নাম রাখুন, স্ত্রীলোকের পক্ষে 'বিশ্বসিংহ' নাম উচ্চারণ করা বড়ই কঠিন।" মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন "ইহার অন্য নাম বিশু হইল।" অতঃপর শিশু ও বিশু দুই পুত্র লইয়া হীরা দেবী পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বালকদ্বয় বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া প্রতিবেশী কোঁচ বালকদিগের সহিত প্রত্যহ অরণ্যে যাইয়া ক্রীড়া করিয়া সায়ংকালে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম বর্ষ বয়সে বিশু এক দিবস ক্রীড়ান্তে শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষ ছায়াতে শয়ন করিয়াছিলেন সূর্য্যের উত্তাপে দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল। অন্যান্য বালকগণ দূরে ছিল, ইত্যবসরে এক বৃহৎ সর্প আসিয়া মস্তকোপরি ফণা ধারণ করিয়া বিশুর দেহ হইতে রৌদ্র নিবারণ করিতেছিল। বিশুর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সর্প বনে গমন করিল। বিশু গৃহে আসিয়া মাতাকে বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। হীরা দেবী তাহা শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অপর এক দিবস বিশু অরণ্য হইতে একটি ব্যাঘ্রের শাবক ধরিয়া আনিয়া মাতাকে দিয়া কহিলেন "মা! এ বড় হইলে আমি ইহার সহিত ক্রীড়া করিব।" হীরা দেবী কহিলেন "এ হিংস্র জন্তুর শাবক ইহাকে পরিত্যাগ কর"। তখন বিশু উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। আর একদিন বালক দিগের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ দুই দন্ত বিশিষ্ট পর্ব্বতাকার এক সুবৃহৎ মত্ত হস্তী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, বালকগণ দর্শন মাত্র বহু

দূরে পলায়ন করিল কিন্তু বিশু হস্তীর নিকট যাইয়া শুণ্ড ধারণ করিয়া দন্তোপরি দক্ষিণ পদ দিয়া বামপদ মস্তকে অর্পণ করিয়া স্কন্ধে আরোহণ করিয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "মা, আমি হস্তী ধৃত করিয়া আনিয়াছি; হস্তীতে আরোহণ করিতে অত্যন্ত সুখ।" তখন হীরাদেবী চমৎকৃত হইয়া নিকটে গমন করিয়া বিশ্বসিংহকে ক্রোড়ে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বিশু হস্তী পরিত্যাগ করিয়া আমার ক্রোড়ে আইস, হস্তী রাজা দিগের আরোহণ যোগ্য; তুমি দুঃখিণীর পুত্র, তোমার পিতা ভিক্ষুক।" তখন বিশু লম্ফ প্রদান করিয়া হীরার ক্রোড়ে গেলেন। হস্তী কিয়ৎকাল স্থিরভাবে থাকিয়া অরণ্যে গমন করিল। বিশু মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আমি কি রাজা হইতে পারি না?" হীরা বলিলেন "বাবা! তুমি নগেন্দ্রনন্দিনী রাজরাজেশ্বরীকে কায়মনোভক্তি-ভাবে পূজা কর, তিনি প্রসন্না হইলে তুমি রাজা হইতে পার।"

ঐ দিবস রাত্রিতে হীরা মহাদেবের পদ সেবা করিতে২ নিবেদন করিলেন "হে প্রভো! তোমার পুত্র দুইটি সর্ব্বদা হিংস্র জন্তু ধরে, কখন যে বিনষ্ট হয় তাহার ঠিক নাই।" এই বলিয়া সর্প, ব্যাঘ্র-শিশুর ও হস্তীর বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন "ইহারা তোমার পুত্র হইয়া কি আরণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?" মহাদেব কহিলেন "ইহাদিগকে বলিয়া দেও আগামী কল্য বনে যাহা পায় তাহা যেন ধরিয়া আনে।" প্রাতঃকালে শিশু ও বিশু যখন ক্রীড়া করিতে যাইতেছিলেন তখন হীরা দেবী কহিলেন "অদ্য বনে যাহা পাইবে তাহা ধরিয়া গৃহে আনিও।" বালকদিগের সহিত বনে ক্রীড়া কালে একটি মর্কট বানর দেখিতে পাইয়া দুই ভাই তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া অনেক পরিশ্রমে বিশ্বসিংহ লগুড়াঘাতে বানরটীকে বিনষ্ট করিয়া পরে নদী তটে ভ্রমণ করিতে২ দেখিতে পাইলেন যে একটি সর্প ভাসিয়া যাইতেছে। বিশু সন্তরণ পূর্ব্বক সর্পটিকে ধরিয়া আনিয়া দুই ভ্রাতা সর্প ও বানর খণ্ড২ করিয়া কাটিয়া পোড়াইয়া ভক্ষণ করিলেন।

তৎপরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হীরা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য অরণ্যে কি পাইয়াছ?" তাহারা বলিলেন "বানর ও সর্প পাইয়াছিলাম ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাহা দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি"। হীরা দেবী কহিলেন "উহাদের শরীরের যাহা অবশিষ্ট আছে লইয়া আইস"। তখন দুই ভ্রাতা সর্প ও বানরের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা আনিয়া গৃহে রাখিলেন। রাত্রিতে মহাদেব হীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পুত্রদ্বয় অদ্য কি পাইয়াছে?" হীরা সমুদয় বিবরণ কহিলেন। মহাদেব কিছু কাল পরে বলিলেন "ইহারা সার্ব্বভৌম রাজা হইতে পারিল না, জন্তু দুইটিকে খণ্ড২ করিয়াছে, সেজন্য বিশ্বসিংহ খণ্ডেশ্বর রাজা হইবে।" ঐ দিবস হইতে বিশ্বসিংহ সর্ব্বদা ভগবতীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাতৃ গর্ভে শিব প্রমুখাৎ যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেবীর মানস পূজা করিতেন

এবং যেখানে২ উত্তম ফল ও পুষ্প পাইতেন তাহা ভগবতীর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান করিতেন। বালক দিগের সহিত ক্রীড়া কালেও ভগবতীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা দিয়া বলি দিতেন। ইতি রাজোপাখ্যানে দেব খণ্ডে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

অতঃপর সকলে শ্রবণ করুন। ১৪৩২ শকাব্দে, ৯১৭ সালে যখন বিশ্বসিংহের বয়স নয় বৎসর তখন একদিন শিশু, বিশু চন্দন মদন এবং বাঘা টেঙ্গনা ও পানবর প্রভৃতি ত্রয়োদশজন কোচ বালক একত্রে ক্রীড়া করিতেছিলেন। সকলের হস্তের শুষ্ক বংশের লগুড় ও বিশুর হস্তের শুষ্ক ময়না কাষ্ঠের লগুড় একত্রিত করিয়া একস্থানে রোপণ করিয়া দেবী কল্পনা করিয়া বনপুষ্প ও ফল আনিয়া ভগবতীর পূজা করিতে লাগিলেন। বালকগণ মধ্যে কেহ২ নৃত্য, কেহ২ গান করিতে লাগিলেন এবং বলি কল্পনা করিয়া এক২ বালক অন্য এক বালককে পাঁঠার ন্যায় ধরিয়া বীরণ পত্র (বেনার পাতা) নির্ম্মিত খড়গ দ্বারা আঘাত করিতে ছিলেন। শিশু এক বালককে বলি কল্পনা করিয়া পাঁঠার ন্যায় ধরিলেন এবং বিশু বীরণ পত্রের খড়্গ দ্বারা 'ভগবতি বলিং গৃহ্ন' এই বলিয়া আঘাত করিবা মাত্র ঐ বালকের শিরশ্ছেদন হইয়া রুধির পাত হইতে লাগিল। বিশ্বসিংহ তৎক্ষণাৎ ঐ বালকের ছিন্নশির আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া কল্পিতা ভগবতীর সম্মুখে দিলেন। অন্যান্য বালকগণ ভীত হইয়া 'শিশু বিশু বালক বধ করিল' এই বলিয়া পলায়ন করিলেন। শিশু ও বিশু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া ভয়াতুর হইয়া পর্ব্বত পথে পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিলেন। অন্যান্য বালকগণ নিজ২ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ঐ সংবাদ প্রকাশ করায় ক্রমে২ চিকিনাপর্ব্বতাদি-অষ্টগ্রামের অধিপতি তুরকা কোতোয়াল তাহা অবগত হইয়া দূতদিগকে আদেশ দিলেন যে শিশু ও বিশু দুই বালককে অবিলম্বে আমার নিকট আনয়ন কর তাহাদিগের শিরশ্ছেদ করিয়া মৃত বালকের মাতা পিতার দুঃখ নিবারণ করিব। দূতগণ হীরা দেবীর গৃহে ও অন্যান্য স্থানে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

হীরা দেবী ইহা শ্রবণ মাত্র ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতে২ ভাবিতে লাগিলেন রাত্রি উপস্থিত, বালকদ্বয় যদি অরণ্যে গমন করিয়া থাকে তাহা হইলে বন্য পশু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে আর গৃহে আসিলেও তুরকা কোতওয়াল ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং বধ করিবে। তাহাদের রক্ষার আর কোন উপায় নাই। হে বিপদ ভঞ্জন সদাশিব, রক্ষা কর। রাত্রিকালে মহাদেব আগমন করিলে হীরা দেবী তাঁহার পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। মহাদেব হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন "তোমার পুত্রকে কেহ নষ্ট করিতে পারিবেনা। বিশ্বসিংহ কল্য দেবাভিষিক্ত রাজা হইবে, তুমি কোন চিন্তা করিওনা।" তখন হীরা দেবী নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে শিশু ও বিশু পর্ব্বতশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে২ শ্রান্ত হইলেন। ঘোর অন্ধকার রাত্রি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সভয়ান্তঃকরণে ব্যাকুলচিত্তে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন। নিদ্রাবসানে বিশু স্বপ্ন দেখিলেন মহাদেব উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "হে বৎস! ভয় নাই, উঠ, যে স্থানে দেবীকে পূজা করিয়াছ সেই স্থানে গমন কর, ভগবতী তোমার পূজা ও মহাবলি গ্রহণ করিয়া প্রসন্না হইয়াছেন, যে সকল শুষ্ক লগুড় ও ময়না কাষ্ঠ রোপণ করিয়াছিলে তাহা শাখা পল্লবান্বিত হইয়াছে। ভগবতী নিজ হস্তের কঙ্কণ ও তীক্ষ্ণ খড়্গ প্রদান করিয়াছেন। ঐ কঙ্কণ যতদিন তোমার ও তোমার সন্তান দিগের গৃহে থাকিবে, রাজলক্ষ্মী ততদিন অচলা হইয়া থাকিবেন। খড়্গসহায় যুদ্ধে গমন করিলে শত্রুবল হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। খড়্গ কখনও ভগ্ন হইবে না। গলিত পত্রের দ্বারা যে রাজাসন প্রস্তুত হইয়াছে স্নান করিয়া তাহাতে উপবেসন করিলে তুমি দেবাভিষিক্ত হইবে। আমার ভাঙ্গের ঝুড়ি শিশু তোমার মস্তকে ধারণ করিয়া তোমার কপালে রাজতিলক প্রদান করিলে তুমি রাজা হইবে এবং শিশুসিংহ 'রায়কত' হইবে। ঝুড়ির মধ্যে সর্প মস্তক রাখিয়া শুভ্র বস্ত্রাবৃত করিবে তাহা 'শ্বেতচ্ছত্র' হইবে। সর্পপুচ্ছ অস্থি আদি দ্বারা চক্রাকার আসন নির্ম্মাণ করিবে তাহার নাম হইবে 'চাক বালিশ'। রজত দ্বারা এক বানর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বানরের মস্তক ও অস্থি সকল রাখিয়া তাহা দণ্ডোপরি স্থাপন করিবে তাহার নাম 'হনুমান দণ্ড' হইবে। ছত্র ও দণ্ড ভিন্ন রাজা সিদ্ধ হন না। যেখানে যুদ্ধে গমন করিবে তোমার ছত্র ও দণ্ডদৃষ্টিপাত করা মাত্র শত্রুক্ষয় হইবে এবং তুমি যুদ্ধে জয়ী হইবে।" ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়

রাত্রি প্রভাতি হইলে বিশু গাত্রোত্থান করিয়া শিশুকে জাগরিত করিয়া বলিল "দাদা! চল যাই রাজা হই" শিশু বলিল "সে কি কথা?" বিশু তখন সমস্ত বৃত্তান্ত শিশুকে বলিলে যে স্থানে পূজা করিয়াছিলেন, উভয়ে সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন যে শুষ্ক ময়না কাষ্ঠ ও লগুড় শাখা পল্লবিত হইয়াছে এবং স্থানটি অতি রমণীয় হইয়াছে। চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত এবং পার্শ্বস্থ বৃক্ষসকল পুষ্প ফল শোভিত হইয়াছে। ময়না বৃক্ষের মূলে বৃক্ষের নানা প্রকার গলিত পত্ররচিত রাজাসনের ন্যায় এক আসন রহিয়াছে, তাহার উপর এক অপূর্ব্ব খড়্গ এবং তৎপার্শ্বে রত্নময় কঙ্কণ ও একটি ভাঙ্গের ঝুড়ি রহিয়াছে।

ইহা দেখিয়া দুই ভাই হৃষ্ট হইয়া নদীতে স্নান করিয়া বিশু রাজাসনে বসিবামাত্র অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন, মন্ত্র শুনিতে ও জলকণা পতিত হইতে দেখিলেন, কিন্তু কে কোথা হইতে অভিষেক করে তাহা দেখিতে পাইলেন না। তদনন্তর শিশু দেখিলেন ঐ স্থানে

কুঙ্কুম, কস্তুরি, অগুরু, চন্দন মিশ্রিত লেহ আছে, তদ্দারা বিশুর কপালে রাজ তিলক প্রদান করিয়া ভাঙ্গের ঝুড়িটি বৃক্ষপত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া বিশুর মস্তকোপরি ছত্রের ন্যায় ধারণ করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল। তাঁহারা এই সকল শুনিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন না। সেই সময় চন্দন, মদন ও অন্যান্য প্রতিবেশী বালকগণ তথায় আগমন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। সকলের এইরূপ মনে হইল যেন সহস্র২ হস্তী ও ঘোটক ও সৈন্য সামন্ত শব্দ করিতেছে। বালকগণ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিল।

এই প্রকারে মহারাজ বিশ্বসিংহ দেবাভিষিক্ত রাজা হইলেন। শুষ্ক ময়না কাষ্ঠে ভগবতীর অধিষ্ঠান হওয়ায় উহা শাখাপল্লবিত হইয়াছিল বলিয়া এখনও ঐ বংশের রাজারা ময়না কাষ্ঠ দ্বারা দেবী পূজার 'শক্তি গোঁজ' করেন। আর নরবলির দ্বারা ভগবতী প্রসন্না হইয়াছিলেন তজ্জন্য পূর্ব্ববর্ত্তীরাজাগণ শারদীয়া দেবীপূজায় নরবলি দিতেন এখনও তদনুকল্পে পিটালির নরবলি রাজাদিগের ও তদ্দৃষ্টে অনেকেরই ব্যবহার আছে। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত ও শিষ্যসিংহ রায়কত হইয়া বালকগণসহ মাতা হীরা দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। হীরা দেবী অতি উল্লসিতঅন্তঃকরণে পুত্রদ্বয়ের মুখ চুম্বন করিয়া শিরাঘ্রাণ করিলেন। রত্ন কঙ্কণ দর্শনমাত্র ভগবতীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অতিশয় যত্নে তাহা রাখিয়া দিলেন। পুত্রদ্বয় ক্ষুধার্থ থাকায় তাঁহাদিগকে উত্তম আহার্য্য প্রদান করিলেন।

এই সময় তুরকা কোটালের দূতগণ আসিয়া চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া মহারাজ বিশ্বসিংহ ও রায়কত শিষ্যসিংহকে ধৃত করিতে উদ্যত হইল। বিশ্বসিংহের আজ্ঞায় চন্দন, মদন ও অন্যান্য বালকগণ অস্ত্র ও দণ্ড ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একবিংশতি জন দূতের শিরশ্ছেদ করিলেন, অবশিষ্ট দূত সকল কোটালের নিকট যাইয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কোটাল রাগান্বিত হইয়া সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং অশ্বারোহণে শিশুদ্বয়কে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিল এবং চন্দন মদনাদিকে বেষ্টন করিয়া প্রথমেই মদনের শিরশ্ছেদ করিল। মহারাজ বিশ্বসিংহ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই ভগবতীদত্ত খড়্গ ধারণ করিয়া জ্যেষ্ঠ রায়কত সহ যুদ্ধে গমন করিলেন। তুরকা কোটালের সৈন্যগণ ভ্রাতৃদ্বয়কে কালস্বরূপ দেখিয়া ভয়ে কম্পমান হইল। কোটাল আজ্ঞা দিল "বালকদ্বয়কে ধৃত করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাহাদের শিরশ্ছেদ কর।" কোটালের যে সকল সৈন্য অগ্রগামী হইতে লাগিল

দুই ভ্রাতা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রাঘাতে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে শতং সৈন্য বিনাশ হইতে লাগিল। চন্দনও অন্যান্য বালকগণও সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তুরকা কোটাল অশ্বারোহণে বিশ্বসিংহকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় অগ্রগামী হইল। তখন মহারাজ বিশ্বসিংহ উল্লম্ফনে নিকটবর্ত্তী হইয়া অতিক্রুত বামহস্তে অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা তুরকার শিরশ্ছেদ করিয়া ঐ অশ্বে আরোহণ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য সকল যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া কতক পলায়ন করিল ও কতক পদানত হইয়া শরণাপন্ন হইল। তৎপর নিজ দল ও শরণাপন্ন শত্রুদলসহ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতা ও বিমাতাকে প্রণাম করিলেন। জীরা বিশ্বসিংহকে ক্রোড়ে লইয়া মদনের শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ প্রবোধ বাক্য দ্বারা বিমাতাকে সান্ত্বনা দান করিয়া চন্দনের হস্ত ধারণ করিয়া বহির্দ্বারে আসিয়া অন্য আসন ও ছত্রে ঐ দিবস চন্দনকে রাজা করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মথুরাতে কংস বধ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ চন্দ্ররাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন সেইরূপ বিশ্বসিংহ তুরকা কোটালকে বধ করিয়া চন্দনকে রাজা করিয়া বিশ্বসিংহ রাজ্য রক্ষা করিলেন। ইহাতে সকলে বিশ্বসিংহকে সাধুবাদ প্রদান করিল। সেই সময় হইতে "রাজশকা" আরম্ভ হইল। রাজশকার প্রথম সনে/ শকাব্দা ১৪৩২ ; ৯১৭ বঙ্গাব্দা, হিজরি ৯২১ এবং ইংরেজি ১৫১০ সাল হয়।

চন্দন রাজা হইয়া তুরকা কোটালের অশ্ব, গজ, অস্ত্র, ধন, সকল নিজ ভাণ্ডারে আনিলেন। রাজা কামতেশ্বরের মৃত্যুর পর কামপীঠ অরাজক ছিল, কেহ এক গ্রামের কেহ দুই গ্রামের, কেহ তিন গ্রামের, কেহ পঞ্চ, কেহ ষষ্ঠ, কেহ দশ গ্রামের অধিপতি ছিল। বিশ্বসিংহ দূতদ্বারা তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীন করিলেন। যে কেহ অন্যথা আচরণ করিল, তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া দমন করিয়া কাহারও সর্ব্বস্ব হরণ এবং ব্যক্তি ও অপরাধ বিশেষে কাহারও বা প্রাণদণ্ড করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। লোক সকল ভয়ার্ত্ত হইয়া রাজকর ও নানা প্রকার উপঢৌকন সহ আসিয়া রাজ ভেট দিতে লাগিল। এই প্রকারে কামরূপ আয়ত্ত হইল।

তুরকা কোটাল মুসলমান ছিলনা, যবন তাহার জাতি নষ্ট করিয়াছিল। এই জন্য লোকে তাহাকে তুরকা কোটাল বলিত। তাহার পরিবারের লোকেরা পৃথক থাকিত। তাহার তিন কন্যা ছিল। তাহাদিগকে আনিয়া চন্দন, শিষ্যসিংহ রায়কত ও মহারাজ বিশ্বসিংহ বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে চতুর্দ্দশ বর্ষের প্রারম্ভে চন্দন রোগগ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। তিনি ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

চন্দনের মৃত্যুর পর চতুর্দ্দশ রাজশকে (যাহাতে ১৪৩৫ শকাব্দা ও ৯৩৪ বঙ্গাব্দা হয়) মহারাজ বিশ্বসিংহ পূর্ব্ব স্বপ্নাদেশ ও মহাদেবের আজ্ঞানুসারে সর্পের পুচ্ছ দ্বারা চক্রাকার 'চাক বালিশ' অর্থাৎ রাজাসন ও ভাঙ্গের ঝুড়িতে সর্প মস্তক রাখিয়া বস্ত্রাবৃত করিয়া 'শ্বেতচ্ছত্র' এবং বানরের অস্থি আদি রজতনির্ম্মিত বানর মূর্ত্তিতে রাখিয়া তাহা দণ্ডোপরি স্থাপন করিয়া 'হনুমান দণ্ড' নির্ম্মাণ করিয়া শুভদিনে ও শুভলগ্নে ২২ বৎসর বয়সে রাজাসনোপরি উপবেশন করিলেন। শিষ্যসিংহ ছত্র ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত মন্ত্রে তাঁহার অভিষেক করিলেন। রাজসভা অতি অপূর্ব্ব হইল। প্রজাগণ নানা প্রকার উপঢৌকন ও রাজকর প্রদান করিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত ও বাদ্যকরগণ নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিল। মহারাজ বিশ্বসিংহ অশ্ব, গজ, বস্ত্র আভরণাদি ও অন্যান্য পারিতোষিক দ্রব্য দ্বারা শিষ্যসিংহ রায়কত ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে ও সৈন্যগণকে পরিতুষ্ট করিলেন। সুশৃঙ্খলায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ বিশ্বসিংহ প্রথমতঃ সৌমার দেশ, বিজনি, বিদ্যাগ্রাম ও বিজয়পুর প্রভৃতি দেশ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় সৈন্যগণ যখন যেদিকে গমন করে, সেই দেশই জয় করিতে লাগিল। যদি কেহ যুদ্ধে উপস্থিত হয়, সে সসৈন্যে বিনষ্ট হয়। তৎপর ভোটান্ত দেশ জয় করার বাসনায় দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজের নিকট দূত দ্বারা এই মর্ম্মে পত্র দিলেন যে "কামতাপুরে যিনি যখন রাজা হন তোমরা তাঁহার অধীন থাক, এতদিন রাজ্য অরাজক ছিল তজ্জন্য তোমরা স্বং প্রধান ছিলে, এক্ষণে ভগবতীর কৃপায় আমি কামরূপ ক্ষেত্রের রাজা হইয়াছি, তোমরা আমার অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ কর প্রদান করিবে নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।" দেবরাজ দূতকে তাচ্ছিল্য করিয়া অপমান করিলেন। মহারাজ ইহা শ্রবণ মাত্র যুদ্ধসজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সহস্রং অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতিক সৈনিক পার্ব্বত্য দেশ আক্রমণ করিয়া সহস্রং ভোট সৈন্য নিপাত করিতে লাগিল ও অনেক পর্ব্বত আয়ত্ত করিয়া অবশেষে মহারাজ বিশ্বসিংহ যখন ভোটিয়ার রাজধানী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দেবরাজ, মহারাজ বিশ্বসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সর্ত্তে সন্ধি করিলেন যে নিরূপিত রাজকর ও উপঢৌকন প্রতি বৎসর প্রদান করিবেন যুদ্ধকালে সসৈন্যে আসিয়া মহারাজের সাহায্য করিবেন ও মহারাজের আজ্ঞায় ভোটান্তের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইবে। ইহার পর মহারাজ গৌড় দেশ জয় করিতে চলিলেন। ঐ দেশ তখন যবনদিগের অধিকারে ছিল। দিল্লীতে তৎকালে শের শাহ বাদশাহের পুত্র সলিম শাহ বাদশাহ ছিলেন। রাজ সৈন্য গৌড় দেশের কতকাংশ জয় এবং কতকাংশ হইতে ধন গ্রহণ করিয়া রাজাসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে শিষ্যসিংহ রায় কত বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থান অতিরম্য মনে করিয়া তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করা স্থির করিলেন।

মহারাজ বিশ্বসিংহের ক্রমেং তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, জ্যেষ্ঠ নৃসিংহ, জ্ঞানবান, দেবভক্ত ও বিশ্বসিংহের ন্যায় সর্ব্বদা তপস্যায় অনুরক্ত। মধ্যম নরনারায়ণ, তিনি ধর্ম্মে ও জ্ঞানে রাজা যুধিষ্ঠির, এবং যুদ্ধে ও পরাক্রমে মধ্যম পাণ্ডবের ন্যায় হইলেন। তিনি মল্লযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এক নাম 'মল্ল নারায়ণ' ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র চিলারায় মহাবল পরাক্রান্ত হইলেন। ইহার শরীরের বর্ণ অতি শুভ্র ছিল তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম ছিল 'শুক্লধ্বজ'। তিন পুত্রই যথাকালে ক্ষমতাবান ও উপযুক্ত হইলেন।

হীরা দেবী কালপ্রাপ্তা হইয়া কৈলাসগামিনী হইলেন। কুলাচার মতে মহারাজ পারত্রিক ক্রিয়াদি করিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাপন করিলেন। হীরা দেবী মৃত্যুকালে আজ্ঞা করিয়াছিলেন 'যে তাঁহার পুত্রেরা চিকিনা পর্ব্বতে না থাকিয়া সমভূমিতে রাজধানী করিবে।' তদনুসারে বিশ্বসিংহ সমভূমিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া নানা প্রকার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম 'হিঙ্গুল আওয়াস' রাখিলেন এবং তথায় শৃঙ্খলামত সহস্রং লোক বাস করিতে লাগিল। নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া রাজধানীতে সংস্থাপিত করিলেন এবং স্থানেং দেবালয় নির্ম্মাণ করিলেন। শিষ্যসিংহ রাজ আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠপুরে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিলেও সৈন্যসহ রাজধানীতে থাকিতেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ প্রতি বৎসর যে স্থানে দেবাভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেই স্থানে যাইয়া ভগবতীর বৃহৎ পূজা দিতেন। এইরূপে পরম সুখে তিনি রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

যে দ্বাদশ জন বালক মহারাজের সহিত বাল্যকালে ক্রীড়া করিত তাহাদিগকে রাজাদিগের কার্য্যে প্রয়োজন হইতে লাগিল। সেজন্য তাঁহারা 'বার ঘরিয়া কার্য্যী' নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জনের কন্যার সহিত নৃসিংহের বিবাহ হইল। নরনারায়ণের বিবাহ কালে অতিশয় সমারোহ হইল। বিবাহান্তর নরনারায়ণের পত্নী যখন মহারাজ বিশ্বসিংহকে প্রণাম করিলেন তখন মহারাজ তাঁহাকে নানা প্রকার ধন ও যৌতুক প্রদান করিলেন; পরে নৃসিংহকে প্রণাম করিলে, নৃসিংহ রত্নাভরণাদি যৌতুক প্রদান করিয়া "রাজ মহিষীভব" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কন্যা ঐ আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। পরে শুক্লধ্বজের বিবাহ হইল। কিছুকাল পরে নৃসিংহের পুত্র

জন্মিল মহারাজ তাহার নাম 'অনিরুদ্ধ' রাখিলেন। এইরূপে মহারাজ বিশ্বসিংহ পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। যখন যে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইত মহারাজ পুত্রদিগকে কিংবা রায়কতকে সেই স্থানে প্রেরণ করিতেন। মহারাজের আজ্ঞানুসারে তাঁহারা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রগণ সকলেই উপযুক্ত হইলেন। এই প্রকারে মহারাজ বিশ্বসিংহ একত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন।

তৎপর মহারাজ ঐহিক রাজভোগাদি অনিত্য বোধে নিত্য বস্তু পরমেশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং পুত্রদিগকে ডাকিয়া নানা প্রকার রাজনীতি, ও নীতিশিক্ষা দিলেন। মাতৃগর্ভে মহাদেবের প্রমুখাৎ তাঁহার যোগাভ্যাস ছিল। সেই যোগচিন্তায় মগ্ন হইয়া ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রথমে নিজ জন্মস্থান চিকিনা পর্ব্বতে এবং পরে যে স্থানে দেবাভিষিক্ত হইয়াছিলেন সেই স্থানে গমন করিয়া সঙ্গে যাহারা ছিল তাঁহাদের সকলকেই বিদায় দিলেন। পুত্র, ভ্রাতা, মন্ত্রী সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া একাকী পর্ব্বতশৃঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহার কি হইল বা তিনি কি করিলেন তাহা লোকে প্রকাশ নাই। ইতি রাজোপাখ্যানে দেবখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়। দেবখণ্ড সমাপ্ত হইল অতঃপর নরখণ্ডে বিশ্বসিংহ বংশের বিবরণ বলিতেছি ॥ ১২ ॥

নবম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সকলে শ্রবণ করুন। ৪৪ রাজশকায় মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বের অবসান হইল। ৪৫ রাজশকে যাহাতে বাঙ্গালা ৯৬১ ও ১৪৭৬ শকাব্দা হয় ঐ সনে মহারাজ বিশ্বসিংহ যোগ চিন্তার জন্য পর্ব্বতে গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহের রাজ্যাভিষেকের যাবতীয় অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। নানা দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সভা করিয়া শাস্ত্রানুসারে অধিবাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তিন ভ্রাতা সভায় যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় নরনারায়ণের পত্নী কয়েকজন সহচরী সমভিব্যাহারে সভাগ্রে আসিয়া নৃসিংহকে প্রণাম করিলেন। সভাস্থ সকল লোক ও নৃসিংহ তটস্থ হইয়া লোকদ্বারা তাঁহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দেবী নৃসিংহ কহিলেন "বিবাহান্তর আমি যখন আপনাকে প্রণাম করিয়াছিলাম তখন আপনি "রাজ মহিষী ভব" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এখন আপনি রাজা হইতেছেন, তাহা হইলে আমি কি প্রকারে রাজ মহিষী হইব? অতএব আপনার বাক্য মিথ্যা হইল।"

নৃসিংহ হাস্য করিয়া বলিলেন "মাতঃ! যথার্থ বলিয়াছ। আমার বাক্য কখনও অন্যথা হইবে না। নরনারায়ণই রাজা হইবেন এবং তুমি রাজমহিষী হইব, আমি রাজা হইব না।" ইহা শুনিয়া নরনারায়ণের পত্নী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নৃসিংহ নরনারায়ণকে রাজা হইতে আজ্ঞা দিলেন। সভাস্থ সকলে নৃসিংহের সাধুবাদ করিতে লাগিল। পরে নরনারায়ণের অধিবাস আদি ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। পর দিবসে শুভলগ্নে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকল বেদ বাক্যে নরনারায়ণকে অভিষিক্ত করিয়া অপূর্ব্ব 'চাকবালিশ' অর্থাৎ রাজাসনে উপবেশন করাইলেন ও তাঁহার কপালে রাজতিলক প্রদান করাইলেন। রায়কত শুভ্র নাগফণ ছত্র ও দণ্ড ধারণ করিলেন। সেবক সকল শ্বেত চামর ব্যঞ্জন ও ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম ও নৃত্যগীত হইতে লাগিল।

এইরূপে মহারাজ নরনারায়ণ রাজা হইয়া প্রথম মুদ্রা প্রচলনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা নির্ম্মিত হইল, তাহার একপৃষ্ঠে দেব নাগর অক্ষরে মহাদেবের নাম ও অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীমহারাজ নরনারায়ণের নাম অঙ্কিত হইল। নরনারায়ণের নাম সংযুক্ত বলিয়া ঐ মুদ্রা "নারায়ণী টাকা" নামে খ্যাত হইল। নারায়ণী টাকা তখন পূরা টাকা ছিল। রাজার অধীন সকল দেশে ঐ মুদ্রা প্রচলিত হইল। রাজা স্বীয় নামে মোহর অঙ্কিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় এক মোহরে সিংহের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার নাম "সিংহছাপ" রাখিলেন। লিখিত ও "সিংহছাপ" মোহরাঙ্কিত রাজাজ্ঞা সমূহ দ্বারা রাজকার্য্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। অভিষেকের দিবস মহারাজ নানা প্রকার বস্ত্র, আভরণ, হস্তি,

ঘোটক, মুদ্রা প্রভৃতি পারিতোষিক দ্রব্য দ্বারা ভ্রাতাদিগকে ও রায়কত মন্ত্রীবর্গ ও সৈন্য সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে ধনদানে তুষ্ট করিলেন। দীনদুঃখীদিগকে ধন প্রদানে তাহাদের দৈন্য দূর করিলেন। সকলেই অতি হৃষ্টচিত্ত হইল। একজন কায়স্থ কুলোদ্ভব যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। মিথিলা ও কামরূপ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়া স্থাপিত করিলেন। একজন ব্রাহ্মণকে নাজির নিযুক্ত করিলেন। সর্ব্বদা রাজ সভায় শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গের আলোচনা হইতে লাগিল। দেশের ও সভার উত্তম সৌষ্ঠব হইল। প্রজা সকল সুখী ও ধনবান হইতে লাগিল। নানা দেশীয় সওদাগর বহু স্থান হইতে উত্তম উত্তম সামগ্রীসহ যাতায়াত করিতে লাগিল। রায়কত স্বীয় বাসস্থান বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিলেন। তাঁহার বংশ অদ্যাপি তথায় আছে। তিনি সময় মত সৈন্য সমেত রাজধানীতে আসিতেন। নৃসিংহ প্রায় পরমার্থ চিন্তাতেই কালক্ষেপণ করিতেন। তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহারাজ তাঁহাকে পাঙ্গা পরগণা জায়গীর প্রদান করিলেন। তাঁহার বংশধরগণ তথায় থাকিতেন কেবল অনিরুদ্ধ রাজধানীতে থাকিতেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ নরনারায়ণ রাজা হইলে প্রজাগণ সুখী হইল ॥ নানা দেশ হইতে রাজকর ও নানা সামগ্রী আসিতে লাগিল। দেবরাজ নির্দ্ধারিত রাজকর, পার্ব্বত্য অশ্ব, ও নানা প্রকার বিচিত্র বস্ত্রাদি প্রতিবৎসর উপঢৌকন দিতে লাগিল। এই সময় গৌড় হইতে ক্রমাগত নিবেদন পত্র আসিতে লাগিল যে ঐ স্থানে যবনদিগের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যে সকল স্থান মহারাজের অধিকারে ছিল যবনেরা তাহা আক্রমণ করিতেছে। মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য সজ্জার আজ্ঞা দিলেন এবং হনুমান দণ্ড পূজা করিয়া তাহা বিমুখ করিয়া রাখিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে দেখিলেন দণ্ড নৈঋত মুখ হইয়া আছে ইহাতে জানিতে পারিলেন যুদ্ধে জয় হইবে।

মহারাজ ত্রিবিধ সৈন্য সমভিব্যাহারে ভগবতীদত্ত খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া যাত্রা করিলেন। স্বদেশীয় সৈন্যাধিপতি রায়কত, হিন্দোস্থানি রাজপুত, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বেতনভোগী সৈন্যগণের অধিপতি অনিরুদ্ধ এবং ভোট সৈন্যগণের অধিপতি দেবরাজ ও সকল সৈন্যের উপর শুক্লধ্বজ সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন। এইরূপ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সমভিব্যাহারে মহারাজ মল্লনারায়ণ যাত্রা করিলেন। তাঁহার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র, কখনও অশ্বে, কখনও গজে কখনও বা দোলায় আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী হইলে, সৈন্যদল পৃথক২ ভাগে বিভক্ত

হইল। প্রথমে অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং যবনাধিপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অন্যান্য যবন সৈন্য যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া স্বদেশগামী হইল। মহারাজ গৌড় আদি দেশ জয় করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিলেন। ঐ দেশের অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকচ্ছন্দে ব্রহ্মোত্তরের ওয়াক্কা লিখিয়া তাহাতে সিংহছাপ অঙ্কিত করিয়া দিলেন। সেই সকল ওয়াক্কা মধ্যে কতক২ এখনও দেখা যায়।

মহারাজ এক বৎসর কাল গৌড়দেশে অনিরুদ্ধ থাকিয়া ঐ দেশ জয় করায় তাঁহার উপর ঐ দেশের আধিপত্য প্রদান করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শুক্লধ্বজের প্রতি আদেশ দিলেন তিনি যেন ঘোড়াঘাট প্রভৃতি দেশ শাসনাধীনে আনেন। শুক্লধ্বজ বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়া ও বহু দেশ শাসিত করিয়া অনেক ধনরত্নসহিত রাজধানীতে আগমন করিলেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শুক্লধ্বজ সসৈন্যে অগ্রগামী হইতেন এবং সৈন্যগণ আজ্ঞাবাহকের ন্যায় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত।

এইরূপে মহারাজ পরম সুখে রাজত্ব করিতেছেন। প্রত্যহ রাজসভা হয় যথাযোগ্য স্থানে সকলে উপবেশন করেন। এক দিবস শুক্লধ্বজ মনে২ ভাবিলেন 'রাজ্যশাসন আমি করি, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আমি যুদ্ধ করি, সকল লোক আমার অধীন। নরনারায়ণ নাম মাত্র রাজা, আমি তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া নিজে রাজা হইব।' মনে২ এইরূপ স্থির করিয়া তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে 'অদ্যই সভামধ্যে রাজার শিরচ্ছেদ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাজ সভায় গমন করিয়া সভার অগ্রভাগে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে স্বয়ং ভগবতী দশভুজা 'চাক বালিশে' উপবিষ্টা হইয়া নরনারায়ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। দেবীর দেহবিনির্গত তেজঃপুঞ্জে সভা সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন মাত্রই শুক্লধ্বজ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া দণ্ডপ্রায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া রোদন করিতে২ বলিতে লাগিলেন "মহারাজ আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি আমাকে রক্ষা করুন।" মহারাজ অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া ভ্রাতার নিকট যাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সভামধ্যে আনয়ন করিয়া মিষ্টবাক্যে বলিতে লাগিলেন "হে ভ্রাত! তোমার কোন অপরাধ হয় নাই বরং তোমার বাহুবলেই আমি রাজত্ব করিতেছি।" শুক্লধ্বজ কাতর হইয়া জোড় হস্তে মনোগত সকল কথা এবং ভগবতী মহিষমর্দ্দিনীরূপে রাজাকে ক্রোড়ে লইয়া হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া তাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া বলিলেন "আমি অতিশয় অপরাধী; প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, দ্বিতীয়তঃ রাজা, তৃতীয়তঃ যাঁহাকে স্বয়ং ভগবতী ক্রোড়ে করিয়া রক্ষা করেন, আমি তাঁহাকে হত্যা করিতে বাসনা করিয়াছি, আমার কি উপায়

হইবে ?" ইহা শুনিয়া সভাস্থ সকলে চমৎকৃত হইল। মহারাজ নরনারায়ণের চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রুপাত হইয়া বক্ষঃস্থল আর্দ্র হইতে লাগিল, তিনি ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি রাজ্যাভিলাষী হইয়াছ, তুমি বৃহৎ রাজ্য ভোগ করিবে, আমি তোমাকে বৃহৎ রাজ্য প্রদান করিব। তুমি বড় ভাগ্যবান্, ভগবতীকে চাক্ষুষ দর্শন করিলে, আমি'ত তাঁহার দর্শন পাইলাম না ? আমি অতিশয় দুষ্কর্ম্মান্বিত নতুবা জগন্মাতা স্বয়ং আমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন আর আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিলাম না।"

মহারাজ এই প্রকারে অনেক আক্ষেপ করিয়া নিভৃত স্থানে তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন। রাত্রিতে স্বপ্নযোগে ভগবতী অভির্ভূতা হইয়া বলিলেন "বৎস ! উঠ, জগৎসংসার আমার যে মহিষমর্দ্দিনীরূপ পূজা করে তাহা প্রত্যক্ষ কর। শরৎকালে তুমি এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি পূজা করিও। রাজা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ভগবতীকে দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রণাম ও স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরে নিবেদন করিলেন "মাতঃ ! মহীষাসুরের দক্ষিণ হস্ত সিংহ দণ্ডাঘাত করিয়া ধারণ করিয়াছে কিন্তু উহার বাম হস্ত শূন্য রহিয়াছে। ভগবতী আজ্ঞা দিলেন ঐ স্থানে একটি ব্যাঘ্র দিও।" এক্ষণে শ্রীশ্রীমহারাজ শরৎকালে এই দেবী মূর্ত্তির পূজা করেন। তরুণারুণকান্তি এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নরনারায়ণ শরীর ধারণ সার্থক জ্ঞান করিলেন।

ভগবতীর আজ্ঞানুসারে মহারাজ শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমীতে যূপচ্ছেদন করিয়া প্রতি অষ্টমীতে কনকোৎসব ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ পূর্ব্বক—ঐ সকল নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে—স্বপ্নে দৃষ্ট মূর্ত্তির অনুরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে প্রতিমা দর্শন পূর্ব্বক যথাবিধি নানা প্রকার পূজা করিলেন। মহাষ্টমীতে অষ্টপ্রহরে অষ্টপূজা ও নিশা পূজা সম্পন্ন করিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ দুর্গোৎসব পূজার যে নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এখনও সেই ভাবে পূজা হইতেছে। দেবী প্রতিমা এখনও তত বড় এবং সেই আকৃতিতে নিৰ্ম্মিত হন। মহারাজ নরনারায়ণ ঐরূপভাবে প্রতিবৎসর দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মহারাজ শুক্লধ্বজকে বলিয়াছিলেন "তুমি রাজ্যাভিলাষী হইয়াছ, আমি তোমাকে বৃহৎ রাজ্য প্রদান করিব।" অতএব মহারাজ ৫৩ রাজশকে (১৪৮৪ শকাব্দে) হনুমানদণ্ড পূজা করিয়া বিমুখ করিয়া রাখিলেন। প্রভাতে দেখিলেন

দণ্ডের মুখ ঈশান কোণের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। রাজা হৃষ্টচিত্তে ভগবতীদত্ত খড়্গ, দণ্ড ও ছত্রসহ ও ত্রিবিধ সৈন্য সমভিব্যাহারে আসাম দেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সৈন্যাধিপতি শুক্লধ্বজ ক্রমেং ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া গুয়াহাটীর (গৌহাটীর) নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত আসামের রাজা ছৎংক্রপার প্রেরিত সৈন্যগণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আসামীয় সৈন্যগণ নানারূপ বিভীষিকা দেখিয়া পরাস্ত হওয়ায় নরনারায়ণ স্বচ্ছন্দে গুয়াহাটী, নীলাচল পর্ব্বত, দোরঙ্গ, বেলতলা প্রভৃতি দেশ জয় করিলেন।

তৎকালে আসামের রাজার ম্লেচ্ছ ব্যবহার ছিল। পলায়িত সৈন্যগণ রাজাকে সংবাদ দিল যে 'নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ মনুষ্য নহে, দেবীপুত্র। যুদ্ধকালে তাঁহার সৈন্যমধ্য হইতে চতুর্ভুজা দ্বিভুজা যোগিনী সকল বহির্গত হইয়া বিপক্ষদলের সৈন্যসংহার করেন।' উত্তর সৌমারের রাজা ছত্রংক্রপা তাঁহার রাজধানী ছাড়িয়া যুদ্ধার্থে অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়া ছিলেন এইরূপ সংবাদ শ্রবণ মাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন 'প্রত্যক্ষ না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করি না।' তাঁহার মন্ত্রী বলিলেন 'যুদ্ধ কর্তব্য নহে।' রাজা তখন মহারাজ নরনারায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত এক লৌহময় ছাগ ও কাষ্ঠের খড়্গ পাঠাইয়া বলিলেন যে "নরনারায়ণ যদি দেবীপুত্র হন তাহা হইলে কাষ্ঠের খড়্গে লৌহ নির্ম্মিত ছাগ ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন, নতুবা সকলই মিথ্যা।" দূত নরনারায়ণের নিকট আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিল। শুক্লধ্বজ অশক্ত হইলেন। নরনারায়ণ হাস্য করিয়া বলিলেন "যদি ভগবতী আমাকে রাজ্য দেন, তবে পূর্ব্বে যেমন বিন্নাপাতের খড়্গে নরবলি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও সেইরূপ গ্রহণ করিবেন ; নতুবা আমার কি শক্তি আছে ?" পরে শ্রীশ্রীকামাখ্যাতে নানা প্রকার পূজা করিয়া আসিয়া শুক্লধ্বজ লোহার পাঁঠা ধরিলেন এবং নরনারায়ণ কাষ্ঠের খড়্গদ্বারা আঘাত করা মাত্র, ছাগের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল এবং রক্তপাত হইতে লাগিল। প্রেরিত দূত পদানত হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। মহারাজ ঐ ছাগ ও খড়্গ আসামের রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা বিস্মিত হইয়া চরাই খোরাঙ্গ নামক পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। পরে মহারাজ অভয় প্রদান করিলে ছৎংক্রপা সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া নরনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ আসামের রাজাকে আলিঙ্গন দিয়া তুল্যাসন প্রদান করিলেন এবং বলিলেন "এই রাজ্যের যে পর্য্যন্ত আমার অধীন হইয়াছে তাহা আমার হইল, অবশিষ্ট উত্তর সৌমার আদি দেশ সকল তোমার থাকিল ; কিন্তু এক দেশে দুই ছত্রধারী রাজা থাকিতে পারেনা, তজ্জন্য তোমার ছত্র গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া মহারাজ আসামের রক্তবর্ণ রাজচ্ছত্র লইয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর মন্দির ইতিপূর্ব্বে কালাপাহাড় ভগ্ন করিয়া ছিল মহারাজ তাহার

উপর ইষ্টকদ্বারা অর্দ্ধমন্দির প্রস্তুত করাইয়া তদুপরি স্বর্ণকুম্ভ স্থাপন করিলেন এবং সম্মুখে দ্বিতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। ভগবতীর মন্দিরের দ্বারের উপর শ্লোকচ্ছন্দে এই সকল বিষয় খোদিত আছে এবং সম্মুখের ঘরে নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের দুই মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত আছে। ভগবতীর বাসী মালা ও নির্ম্মাল্য অদ্যাপি ঐ মূর্ত্তিতে প্রদান করা হয়। এতৎ ভিন্ন হয়গ্রীব মাধব, জনার্দ্দন ও যেখানে২ অন্য২ তীর্থ আছে সর্ব্বত্র মন্দির, প্রাসাদ ও সোপান নির্ম্মাণ করাইয়া সেবা পূজার ব্যবস্থার জন্য যথাযোগ্য ব্যয় ধার্য্য করিয়া সেবাইত ব্রাহ্মণগণকে ও দেওড়ি অর্থাৎ সেবক সকলের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরিমিত ভূমিদান করিলেন। সে সকল ব্যবস্থা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং আমি, এই রাজোপাখ্যান বক্তা, চাক্ষুষ ঐ সকল কীর্ত্তি দেখিয়াছি। হয়গ্রীব মাধবে প্রত্যহ চারিদণ্ড শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, চারিদণ্ড ভজন গান, চারিদণ্ড হরিসংকীর্ত্তন, চারিদণ্ড নটের নৃত্য, চারিদণ্ড নর্ত্তকীর নৃত্য ও চারিদণ্ড মঙ্গল আরতি দিবাভাগে ও প্রতি রাত্রে হয়। অষ্টপ্রহরে তাল ভঙ্গ নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মহারাজ নরনারায়ণের কাল হইতেই ঐ প্রকার চলিয়া আসিতেছে। ইহারা তখন হইতে ভূম্যাদি বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং যথাকালে আসিয়া আপন২ কার্য্য করিয়া যায়। এই প্রকার অনেক স্থানে বহু লোক মহারাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন আমি কত দেখিয়াছি, কত লিখিব। পরে মহারাজ নরনারায়ণ ঐ দেশে নারায়ণী মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। নীলাচল পর্ব্বতে শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর সেবাধিপতি 'দলই' উপাধিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রত্যহ সায়ংকালে আরতির পর তিনি মৃদঙ্গ বাজাইতেন এবং ভগবতী নাটমন্দিরে বিবস্ত্রা হইয়া নৃত্য করিতেন। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত যোগ করিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়া সেই দৃশ্য দর্শন করেন। ইহাতে ভগবতী ক্রুদ্ধা হইয়া ব্রাহ্মণকে আজ্ঞা করিলেন যে 'তাঁহার নৃত্য আর মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইবে না; আর নরনারায়ণ পুত্র হইয়া কিরূপে নগ্না মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিল? অতঃপর যেন সে বা তাহার বংশধরগণ কামাখ্যা দেবী কিংবা কোন নগ্নমূর্ত্তি দর্শন না করে।' সেই হইতে রাজাদিগের কেহ কামাখ্যা দর্শন বা কোন দিগম্বরী মূর্ত্তি দর্শন করেন নাই।

তৎপর মহারাজ বিদ্যাগাঁও ও বিজনী সমেত ঐ রাজ্য ভ্রাতা শুক্লধ্বজকে প্রদান করিয়া, স্বদেশে রাজপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শুক্লধ্বজের পর তাঁহার পুত্র রঘুদেব নারায়ণ ও তৎপর তাঁহার পুত্র পরীক্ষিৎ নারায়ণ ঐ দেশে রাজত্ব করেন। পরীক্ষিৎ নারায়ণ ক্ষীণবল থাকায় আসামের রাজা ঐ দেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন এবং কতকাংশ যবনাধিকৃত হইল। শুক্লধ্বজের বংশধরগণ অদ্যাপি দোরঙ্গ, বিজনী ও বেলতলায় আছেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

মহারাজ নরনারায়ণ আসাম দেশ জয় করিয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ ওরফে চিলা রায়কে তথায় স্থাপিত করিয়া আপন মুদ্রা তথায় প্রচলিত করিয়া রাজপাটে আগমন করিলেন। কিছুদিন পর মহারাজের অতি সুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত এক পুত্র জন্মিল। রাজা পুত্রমুখ দর্শনে হৃষ্ট চিত্ত হইয়া জ্যোতির্ব্বেত্তা দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ রাখিলেন। অপূর্ব্ব সুন্দর বালক দিনে২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। রাজা পুত্র লইয়া পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের যখন ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল তখন অতি সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। রাজ কুঙর বহুস্ত্রী অভিলাষী হওয়ায় অন্যান্য অনূঢ়া কন্যা আনিয়া তাঁহার পত্নীভাবে রাখা হইল। মহারাজ নরনায়ণ বর্ত্তমানেই লক্ষ্মীনারায়ণের অনূঢ়া পত্নীর গর্ভে বজ্রনারায়ণ, ভীমনারায়ণ ও প্রবলনারায়ণ নামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল।

মহারাজ নিরাপদে রাজ্য করিতে লাগিলেন। রাজা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি লইয়া সভায় উপবিষ্ট হইতেন সভায় নানা প্রকার শাস্ত্রালাপ, বিচার ও সিদ্ধান্ত হইত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সভালঙ্কৃত করিতেন তন্মধ্যে 'রত্নমালা' ব্যাকরণের প্রণেতা, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য ছিলেন। ঐ ব্যাকরণ অদ্যাপি এদেশে ও সৌমার দেশে বিশেষ প্রচলিত আছে, এমন কি তথায় অন্য কোন ব্যাকরণের প্রচলন নাই। অন্যান্য স্থানেও উক্ত ব্যাকরণের প্রচলন আছে। 'রত্নমালা' ব্যাকরণে মহারাজ মল্লনারায়ণের নাম আছে। ঐ ব্যাকরণ বিদ্যার্থীদের পক্ষে সহজ বোধ্য। এইরূপ ভাবে মহারাজ নরনারায়ণ ৩৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে কোন প্রকার উপদ্রব হয় নাই। যথাকালে বারিবর্ষণ হইত, দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় কিছু ছিল না। প্রজা সকল ধনবান ও সুখী ছিল। দোষী যথাশাস্ত্র দণ্ডিত হইত। কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিত না। রাজা নরনারায়ণ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হন নাই। দেবী পুত্র তিনি, তাঁহার মহিমা আমি আর কি লিখিব। ৭৮ রাজশকে (৯৯৭ বঙ্গাব্দে ও ১৫০৯ শকাব্দে) মহারাজ কাল প্রাপ্ত হইয়া অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস গামী হইলেন। মহারাজ পরলোক গমন করিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একমত হইয়া রাজাদিগের সম্বন্ধে সাগ্নিকগণের ন্যায় ব্যবস্থা দিলেন, অর্থাৎ মৃত্যুকাল হইতে অশৌচ গ্রহণ না করিয়া অগ্নিসংস্কার হইতে অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা দিলেন, কারণ পিতার জীবনান্ত হইতে অশৌচ গ্রহণ করিলে পুত্র কি প্রকারে রাজভূষণাদি পরিধান করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন?

মহারাজ নরনারায়ণ স্বর্গারোহণ করিলে মন্ত্রীবর্গ, পণ্ডিতগণ ও রায়কতাদি সকলে মিলিত হইয়া কুঙর লক্ষ্মীনারায়ণকে রাজভূষণ ও রাজাভরণাদিতে সুসজ্জিত করাইয়া রাজাসন 'চাক বালিসে' উপবিষ্ট করাইয়া বেদোক্ত মন্ত্রে তাঁহার অভিষেক করিলেন। রায়কত ছত্র

ও দণ্ড ধারণ করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের নামে মোহর ও মুদ্রা অঙ্কিত হইল এবং ঐ মুদ্রা দ্বারা রায়কত ও মন্ত্রিগণ মহারাজাকে নজর দিলেন। নানা প্রকার বাদ্য ও নৃত্যগীতাদি হইল। তৎপর, মহারাজ মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন এবং বন্ধুবর্গ সহিত সকলে একত্রিত হইয়া পরলোক গত মহারাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধান করিয়া উদক প্রদান ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নর খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হইয়া পিতার মন্ত্রীসকলকে সম্মানিত করিলেন। নানা দেশ হইতে, তাঁহার রাজ্যলাভে, রাজদূত গণ অভিনন্দন পত্র ও উপঢৌকন সামগ্রী সহ আগমন করিল। মহারাজ সকলকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। সেই সময় জালালউদ্দীন মহম্মদ আকবর দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার প্রেরিত আলি কুলি খান খানজমান চিস্তানি গৌড় প্রভৃতি দেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অনিরুদ্ধ তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্রাদি পলায়ন করিয়া পাঙ্গায় আসিল। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ বহুস্ত্রী সম্ভোগী ছিলেন, নিজে যুদ্ধে গেলেন না, সৈন্য প্রেরণ করিলেন তাহারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া কতক পলায়ন করিল, কতক যুদ্ধে বিনষ্ট হইল।

ক্রমে২ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল তাহাদের মধ্যে বীরনারায়ণ মহারাণীর গর্ভজাত। কালক্রমে পুত্রগণ সুযোগ্য হইল। বজ্রনারায়ণ, ভীম নারায়ণ, ও মহীনারায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত হইলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে লইয়া সুখে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে, এক দিবস রাজসভার অধিবেশনের প্রাক্কালে মন্ত্রীবর্গ স্ব২ আসনে উপবেশন করিয়াছেন, মহারাজ আসিতেছেন, এই সময়ে মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামক দৈবশক্তি সম্পন্ন এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সহসা আসিয়া রাজাসন অর্থাৎ 'চাক বালিশের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা সভায় আসিয়া ব্রাহ্মণকে রাজাসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া ঘূর্ণিত ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি রাজাসনের পার্শ্বে বসিবার উপযুক্ত নও।" এই প্রকার বাক্যে, ব্রাহ্মণ সভামধ্যে অপমানিত হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন।

তৎকালে নুরুদ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ। তিনি হিন্দুর দৌহিত্র ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মর্য্যাদা করিতেন; বিশেষতঃ মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের দৈববল থাকায়

বাদশাহের নিকট তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইল। এক দিবস বাদশাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার প্রার্থনা কি?" তিনি বলিলেন "আমার নিবাস কামরূপ বেহার, লক্ষ্মীনারায়ণ সেই দেশের রাজা, তাঁহার আসনের পার্শ্বে আমি বসিয়া ছিলাম, তজ্জন্য আমাকে অযোগ্য বাক্য বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা, যদি আপনি তাঁহাকে বিনষ্ট না করিয়া জীবদ্দশায় ধরিয়া আনিয়া এই স্থানে উপস্থিত করেন এবং সেই সময় আমাকে আপনার আসনের পার্শ্বে বসিতে স্থান দেন, তাহা হইলে আমার মনের দুঃখ নিবারণ হয়। বেহারের রাজারা দেবীপুত্র, অতিশয় বলিষ্ঠ, কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন না। "আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া বাদশাহ, গৌড় দেশের অধিপতি যবনদিগের নামে আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিলেন। যবনগণ যথেষ্ট সৈন্য সহ আগমন করিয়া ঘোড়াঘাট অঞ্চল ও অন্যান্য স্থান জয় করিয়া রাজ্যের অনেক স্থানে নানারূপ উপদ্রব করিতে লাগিল। কখনও রাজ সৈন্য পরাস্ত, কখনও বা যবনসৈন্য পরাস্ত হইল, কিন্তু ইহাতে শান্তি স্থাপিত না হইয়া রাজ্য নষ্ট হইতে লাগিল।

মহারাজ তাহাদিগের মনোগত ভাব অবগত হইয়া নিরুপায় হইয়া দিল্লী যাইতে স্বীকৃত হইলেন। বজ্রনারায়ণ কোঙর ও ভীমনারায়ণ কোঙার দুই পুত্র সমভিব্যাহারে দিল্লী অভিমুখে, যাত্রা করিয়া, অর্দ্ধপথ হইতে গৌড়াধিপতি যবনকে পত্র দিলেন যে 'আমি দিল্লী যাইতেছি তোমরা আমার রাজ্যের উপর আর অত্যাচার করিও না এবং প্রজা নষ্ট করিও না; ফলে অত্যাচার নিবৃত্ত হইল।

মহারাজ দিল্লীতে যাইয়া এক স্থানে অবস্থান করিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিবস দুই পুত্র সহ মহারাজ নগরের এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গমন করিতেছেন, দুই পার্শ্বে প্রাসাদ ও অট্টালিকা, এমন সময় দেখিলেন বিপরীত দিক হইতে এক মাহুত একটি মত্তহস্তীকে দ্রুতবেগে চালিত করিয়া আনিতেছে। ঐ পথে হস্তী গমন করিলে আর কোন লোক অগ্রসর হইতে পারে না। হস্তীচালক রাজাকে পশ্চাদগামী হইতে বলিল। রাজা তাহাকে পথ ছাড়িয়া পশ্চাদ্‌গামী হইতে আদেশ দিলেন। মাহুত তখন ইঁহাদিগকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইল। তখন রাজাজ্ঞায়, বজ্রনারায়ণ হস্তীর দুই দন্ত ধারণ করিয়া পশ্চাৎ দিকে এরূপ ভাবে ঠেলিয়া দিলেন যে হস্তী চিৎকার শব্দ করিয়া পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করিল এবং রাজা পুত্রদ্বয় সহিত স্বচ্ছন্দে ঐ পথে গমন করিলেন। হস্তিচালক এই সংবাদ বাদশাহকে নিবেদন করিল, বাদশাহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ বলবান পুরুষ কে এবং কোথা হইতে আসিল?" তখন মুকুন্দ সার্ব্বভৌম সভাতে ছিলেন, তিনি বলিলেন "বিশ্বসিংহের সন্তান ভিন্ন এরূপ বলবান কেহ নাই। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ নিশ্চয়ই দিল্লীতে আসিয়াছেন।"

অপর এক দিবস মহারাজ যমুনায় স্নান করিয়া তর্পণ ও আহ্নিক করিতেছেন, ইতি মধ্যে ষোল দাঁড়ের এক নৌকা ঐ ঘাটে লাগাইবার উদ্দেশ্যে মাঝিরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল 'ঘাট ছাড়িয়া অন্যত্র যাও।' তাহাতে মহারাজের লোকেরা, তাহাদিগকে অন্যত্র নৌকা লাগাইতে আদেশ দিল। মাঝিরা দৃক্‌পাত না করিয়া বলপূর্ব্বক মহারাজের শরীরের উপর দিয়া নৌকা চালাইয়া দিবার উপক্রম করিল। তখন ভীমনারায়ণ অগ্রসর হইয়া রাজার পুরোভাগে বক্ষ বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নৌকার অগ্রভাগ তাঁহার বক্ষঃস্থলে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া পশ্চাৎ দিকে চলিয়া গেল। ইহাতে উপস্থিত সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়া বাদশাহকে সংবাদ দিল।

বাদশাহ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করা স্থির করিলেন। তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহাকে সেলাম করিবেন না; তজ্জন্য এমন স্থানে উপবেশন করিলেন যে, মস্তক অবনত না করিয়া তাঁহার সম্মুখের দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় না। বাদশাহ স্বীয় আসনের পার্শ্বে মুকুন্দ সার্ব্বভৌমকে বসিতে দিয়া, রাজাকে আহ্বান করিলেন। মহারাজ দুই পুত্র সহ অগ্রসর হইয়া, বাদশাহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, পুত্রদ্বয়ের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। বজ্রনারায়ণ ঐ দ্বার মস্তকে ধারণ করিয়া উচ্চ করিলেন, রাজা ও ভীমনারায়ণ মস্তক নত না করিয়াই স্বচ্ছন্দে প্রবিষ্ট হইলেন, পরে বজ্রনারায়ণ দ্বার ছাড়িয়া দিয়া প্রবেশ করিলেন। বাদশাহ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য নহেন পরন্তু দেবাংশ সম্ভূত। ব্রাহ্মণ মহারাজকে দেখা মাত্র বাদশাহের আসন হইতে উঠিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "মহারাজ, আমি এই স্থানে বসিবার যোগ্য।" মহারাজ লজ্জিত হইলেন।

ঐ সাক্ষাতের পর বাদশাহের সহিত মহারাজের আরও সাক্ষাৎ হইল এবং এইরূপ সন্ধি হইল যে, মহারাজের অধিকারে যাহা আছে তাহা বাদশাহ লইবেন না এবং বাদশাহের অধিকারে যাহা আছে তাহা মহারাজ লইবেন না। কিন্তু রাজার নারায়ণী মুদ্রা আর পূরা থাকিবে না অর্দ্ধ মুদ্রায় নামাঙ্কিত হইয়া প্রচলিত থাকিবে এবং বাদশাহের লোক আর রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। এইরূপ সন্ধি হইবার পর বাদশাহ নানা প্রকার উপঢৌকনাদি দিয়া রাজাকে বিদায় দিলেন।

মহারাজ দিল্লী হইতে আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি কারিগর আনিয়া ছিলেন। সেই সকল কারিগর দ্বারা নিজের অষ্টাদশ পুত্রের জন্য 'আঠার কোঠাতে' আঠার পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ মহারাজ যথাযোগ্য পাত্রী আনিয়া পুত্রদিগের বিবাহ দিলেন। বীরনারায়ণের বিবাহিত পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিল তাহার নাম রাখিলেন প্রাণনারায়ণ। রাজা পরম সুখে রাজত্ব করিতেছেন, অকস্মাৎ বজ্রনারায়ণ কুঙর লোকান্তর গমন করিলেন। তাহার কিছুদিন পর

ভীমনারায়ণ কুঙরও পরলোক গমন করিলেন। রাজা পুত্র শোক শোকার্ত্ত হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরাধনাতে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। বিশেষ কোন কারণে ব্রাহ্মণ নাজিরকে পদচ্যুত করিয়া মহীনারায়ণ কুঙরকে নাজীর করিলেন এবং বীরনারায়ণ কুঙরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই প্রকারে পঁয়ত্রিশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১১২ রাজশকে (যাহাতে ১০২৮ বঙ্গাব্দ ও ১৫৪৩ শকাব্দ হয়) রোগগ্রস্ত হইয়া যথাকালে কৈলাস গমন করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থানুসারে বীরনারায়ণ রাজা হইয়া রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতঃপর মহারাজ বীরনারায়ণ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং কুঙর প্রাণনারায়ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 'আঠারকোঠা' রাজধানী লইল। কোন এক মণ্ডল এক বিচিত্র পুরী ও মন্দির সকল নির্ম্মাণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিল। তাহার নাম হইল 'মণ্ডল আবাস'। রাজা কখন২ পরিবার সহিত ঐ আবাসে যাইয়া বাস করিতেন। বীরনারায়ণের প্রথম আমলে 'ত্রৈলক্যদর্শী' উপাধিধারী নারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক এক দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজদ্বারে আগমন করেন। দ্বারা রক্ষকগণ তাঁহার নাম ও উপাধি শুদ্ধ রূপে রাজ সমীপে নিবেদন না করিতে পারার ফলে, পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ অসম্মান ও অমর্য্যাদা হইয়াছিল। ইহাতে রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া স্থানে২ গ্রামে২ পাঠশালা স্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণ বালক সকলকে, রাজপুত্র প্রাণনারায়ণকে, মন্ত্রিপুত্রদিকে ও যাবতীয় ভৃত্য ও দ্বাররক্ষকদিগের পুত্রগণকে অধ্যয়ন করিতে দিলেন। কে কি পড়িল বা না পড়িল, তাহার সংবাদ মহারাজ সর্ব্বদা লইতেন ও শ্রবণ করিতেন। ইহাতে সকলেই পণ্ডিত হইতে লাগিল।

মহারাজ বীরনারায়ণ রাজা হওয়া অবধি ভোটিয়ার রাজকর দেওয়া বন্ধ করিল, কেবল মাত্র উপঢৌকন সামগ্রী প্রদান করিত। মহারাজ তাহাদিগকে শাসিত করিতে পারিলেন না। বীরনারায়ণ যখন রাজা হইয়াছিলেন তখন রায়কত আসেন নাই নাজির মহীনারায়ণ কুঙর ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার উপাধি হইল 'ছত্র নাজীর'। অতঃপর রাজার অভিষেকের জন্য আর রায়কতের আবশ্যকতা থাকিল না, নাজীরই ছত্র ধারণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে রাজা বীরনারায়ণ 'মণ্ডল আবাসে' আসিলেন, সেখানে মহারাজের কয়েকজন অনূঢ়া পত্নী ও রাজকন্যারা থাকিতেন। এক দিবস অপরাহ্নকালে এক রাজকন্যা

পুষ্পোদ্যানে একাকী পুষ্প চয়ন করিতেছেন, অকস্মাৎ রাজা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পূর্ণ ষোড়শী এক পরম সুন্দরী কন্যা পুষ্প চয়ন করিতেছে। রাজা কামাতুর হইয়া আপন কন্যাকে চিনিতে না পারিয়া কহিলেন "হে সুন্দরি! তোমার উচ্চ পয়োধর দর্শনে আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি আমাকে আলিঙ্গন দান কর।" রাজ কন্যা ইহা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজা পুনরায় লোক দ্বারা রাজকন্যাকে ঐ কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তখন রাজকুমারী তাঁহার বিবাহের জন্য যে স্বর্ণের চালুনী ও পঞ্চ প্রদীপ ছিল, তাহা ও একখানি স্বর্ণ থালি ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া নদীর তীরে গমন করিলেন এবং প্রদীপ পাঁচটি প্রজ্জলিত করিয়া স্তনদ্বয় নিজ হস্তে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া স্বর্ণ থালিতে রাখিয়া সহচরীকে দিয়া কহিলেন "পিতাকে দিয়া আইস, তাঁহার যাহা বাঞ্ছিত তাহা গ্রহণ করুন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া চালুনী ও প্রদীপ মস্তকে লইয়া কন্যা নদীতে নিমগ্না হইলেন। সেই হইতে ঐ নদীর নাম হইল "কুঙরী" নদী, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সহচরী থালি সহ রাজার নিকট আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মহারাজ হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, লোকলজ্জায় অর্দ্ধমৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে মহাদেব! তুমি, ব্রহ্মা সন্ধ্যায় উপগত হইবার চেষ্টা করাতে শিরশ্ছেদন করিয়াছিলে, আমাকে তোমার শূল দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা কর।" মন্ত্রিগণ নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে মহারাজের সান্ত্বনা বিধান করিলেন। মহারাজ রাজসভায় পূর্ব্বের ন্যায় আর বসিলেন না; লজ্জিত ভাবেই পাঁচ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১১৭ রাজশকে (যাহাতে ১০৩৩ বঙ্গাব্দ ও ১৫৪৮ শকাব্দ হয়) দেহত্যাগ করিয়া কৈলাসগামী হইলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ কুলাচার মতে রাজা হইলেন। ছত্র নাজীর মহীনারায়ণ কুঙর রাজছত্র ধারণ করিলেন ও নজর দিলেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণ যথাবিধি কার্য্য করিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের নামে মোহর ও মুদ্রা অঙ্কিত হইল। "সিংহছাপ" পূর্ব্বমত থাকিল। রাজাজ্ঞায় মহারাজ বীরনারায়ণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ প্রাণনারায়ণ বেহারে রাজা হইলে, প্রজাগণ উৎসাহান্বিত হইয়া, রাজকর প্রদান করিতে লাগিল এবং রাজ্যে যে সকল অমঙ্গল ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া সর্ব্বত্র মঙ্গল বিরাজ করিতে লাগিল। মেঘ অন্তর্হিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে চতুর্দ্দিক যেরূপ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যলাভে দেশ সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইল। ধর্ম্মক্রিয়া ও ধর্ম্মালাপ সর্ব্বত্র হইতে লাগিল। রাজা স্বয়ং ব্যাকরণ, স্মৃতি ও সাহিত্যে

অদ্বিতীয় পণ্ডিত, শ্রুতিধর ও দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহারাজ বীরনারায়ণ যে সকল বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাদের প্রায় সকলেই পণ্ডিত হইল। রাজসভাস্থ পণ্ডিতগণ মধ্যে পাঁচজন অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা মহারাজ 'পঞ্চরত্নসভা' করিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পর এরূপ পণ্ডিতের সভা আর হয় নাই। 'কবিভূষণ' ও 'কবিরত্ন' দুই মন্ত্রী, সভাস্থ যাবতীয় লোকই পণ্ডিত, ভৃত্যবর্গ, দ্বারী, প্রহরী সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিত না। অন্য দেশের রাজাদিগের প্রেরিত দূতও মন্ত্রী রাজসভায় আসিতে ইতস্ততঃ করিতেন। সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ শাস্ত্রালাপ হইত। মহারাজ ন্যায়ানুমোদিত দণ্ড দানে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে দেশে কোন প্রকার উপদ্রব ছিল না। পূর্ব্বে যে সকল দেশ রাজ্য বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল তাহা ভিন্ন, মহারাজের অধিকৃত কোন দেশ কেহ আক্রমণ করিতে পারে নাই। প্রজাগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

মহারাজ শ্রীশ্রীজল্পেশ্বরের ইষ্টকময় মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এই মন্দির এত সুন্দর, যে এইরূপ সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির আমি আর কোথাও দেখি নাই এবং যাঁহারা বহু দেশ দেখিয়াছেন, তাঁহারাও বলেন যে, এরূপ মন্দির তাঁহারাও কোথায়ও দেখেন নাই। এই মন্দির দর্শন করিলে ইহা মনুষ্য নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয় না। পরে মহারাজ গোসানীমারিতে মন্দির ও প্রাচীরাদির উত্তম সংস্কার করিয়া দিলেন এবং বাণেশ্বরে ও ষণ্ডেশ্বরে মন্দির স্থাপন ও স্থানেং রাজপথ ও পুল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তিনি পরমসুখে রাজত্ব করিতেন।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মহারাজ প্রাণনারায়ণ ষড়ঋতু মধ্যে পাঁচ ঋতুতে রাজকার্য্য করিতেন এবং বসন্ত ঋতুর পূর্ব্বে সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অতিরম্য পুষ্পোদ্যানে পরমসুন্দরী রমণীগণ সমভিব্যাহারে নানারূপ রসক্রীড়া করিতেন। তিনি যে স্থানে পুষ্প চয়ন, মাল্য গ্রন্থন, পুষ্পাভরণ ও পুষ্পশয্যাদি রচনা করিতেন ও নানারূপ ক্রীড়াকৌতুক করিতেন, তথায় অন্য কোন পুরুষ প্রবেশ করিতে পারিত না। বসন্ত ঋতু অতীত হইলে মহারাজ পুনরায় রাজকার্য্য আরম্ভ করিতেন। রাজসভায় সর্ব্বদা গীত, বাদ্য ও নৃত্য হইত। রাজা নিজে, গীতবাদ্যে ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। আমি শুনিয়াছি, তিনি নিজে সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিলে রাগ, রাগিনী, তাল ও মান সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিত। এরূপ পুস্তক রচনা করা অন্য কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিলনা। অনেক গায়ক ঐ পুস্তকের গান গাহিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। পুস্তকখানি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া লোপ পাইয়াছে, কোথাও যে তাহার নকল আছে এরূপ শুনি নাই। মহারাজপ্রাণনারায়ণের এই প্রকার বহু গুণ ও ক্ষমতা ছিল।

ক্রমেং মহারাজের তিন পুত্রের জন্ম হয়। প্রথম বিষ্ণুনারায়ণ, ইনি মহারাজ প্রাণনারায়ণ রাজত্বলাভ করিবার পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করেন এবং মাননারায়ণ নামে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মহারাজের দ্বিতীয় পুত্র মোদনারায়ণ ও তৃতীয় পুত্র বসুদেবনারায়ণ। দুই পুত্র এবং এক পৌত্র সহ মহারাজ ৩৯ বৎসর পরম সুখে রাজত্ব করিয়া রোগগ্রস্ত হইলেন। কবিরাজ ও চিকিৎসকেরা নানা প্রকার চেষ্টা করিল কিন্তু রোগশান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইল যে মহারাজের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইয়াছে। রাজার পিতৃব্য মহীনারায়ণ কোঙর এই সময় ছত্র নাজীর ছিলেন। তাঁহার মহাপরাক্রমশালী দর্পনারায়ণ, জগৎনারায়ণ, যজ্ঞনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ নামে চারি পুত্র ছিল। মহীনারায়ণ সেনাপতি, সুতরাং অনেক সৈন্য তাঁহার আজ্ঞাবাহক ছিল।

লোকপরম্পরায় রাজার অমঙ্গল সংবাদ শুনিয়া, মহীনারায়ণ চারি পুত্র ও সৈন্যগণসহ রাজধানীতে আগমন করিলেন। মহারাজ, ছত্র নাজীর সসৈন্যে রাজধানীতে আসিতেছেন শুনিয়া কবিরত্ন ও কবিভূষণ দুই মন্ত্রীকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া, তাঁহাকে রাজধানীতে সসম্মানে আনিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা রাজাজ্ঞায় গমন করিয়া নাজীরের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র মহীনারায়ণ বলিলেন, "রাজা পরলোকগমন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া করিয়াও তাহা অপ্রকাশ রাখিয়াছ কেন? তোমাদের মনেং যে বাঞ্ছা আছে, তাহা পূরণ করিতেছি" এই বলিয়া আজ্ঞা দিলেন "এখনই ইহাদের শিরশ্ছেদ কর।" তাঁহার আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল এবং কবিভূষণ ও কবিরত্নের মস্তক ছিন্ন হইল।

মহারাজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং নিশ্চিতরূপে জানিলেন যে, রোগে তাঁহার মৃত্যু না হইলেও, ইহাদের অস্ত্রাঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। ইতিমধ্যে ছত্রনাজীর মহীনারায়ণ চারি পুত্র সমভিব্যাহারে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, মহারাজকে জীবিত দেখিয়া, লজ্জিত হইয়া পূর্ব্বপ্রথানুরূপ সম্মুখের আসনে বসিলেন। মহারাজ অতি কাতর ও মৃদুভাষে মহীনারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "খুড়া মহাশয়! মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধর সকলেই, অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে, রাজা হইতে পারে। এক্ষণে আপনি চারি পুত্রসহ, অতি পরাক্রমশালী ও রাজ্যাভিলাষীও বটেন; কিন্তু প্রথমেই মন্ত্রীদ্বয়কে হত্যা করিলেন, রাজা হইয়া কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবেন?" ছত্র নাজির এই কথা শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া 'মহারাজ সত্বরই আরোগ্যলাভ করিবেন' এইরূপ আশ্বাস বাক্য বলিয়া নিজ শিবির অর্থাৎ ছাউনীতে গিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে মহারাজ কৈলাসগামী হইলেন। মহীনারায়ণের চারি পুত্রের প্রত্যেকেই রাজা হইবার ইচ্ছায় পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। মহীনারায়ণ কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, যাহাকেই রাজ করিবেন, অপর তিন ভ্রাতা একত্রিত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবে। অনেক বিবেচনা

করিয়া অবশেষে তিনি মহারাজ প্রাণনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র, মোদনারায়ণকে রাজা করিয়া নিজে ছত্র ধারণ করিয়া মোদনারায়ণের নামে মোহর ও মুদ্রা অঙ্কিত করাইয়া ঐ মুদ্রা দিয়া রাজাকে নজর দিলেন।

রাজাজ্ঞায় প্রাণনারায়ণের ঔর্দ্ধদেহিকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। মহীনারায়ণ আপনার বিশ্বস্ত লোক জন রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ও একজন কায়স্থ সন্তানকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া পুত্রদিগের সহিত সসৈন্যে স্বস্থানে গমন করিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ ৩৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া ছিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ মোদনারায়ণ ১৫৬ রাজশকে (১৫৮৭ শকাব্দে ও ১০৭২ বঙ্গাব্দে) রাজা হইলেন কিন্তু রাজাজ্ঞার পরিবর্ত্তে মহীনারায়ণ ও তাঁহার পুত্রদিগের আজ্ঞায় সকল কার্য্য হইতে লাগিল। এই সময় রূপচন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহারাজের সরকারে প্রবেশ করিয়া দিনং নিজ কর্ম্ম ক্ষমতায় মুস্তফী খেতাব প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে রাজত্বের দেওয়ানী মোনসেবে নিযুক্ত হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। সে সকল কর্ম্মচারী রাজাজ্ঞা পালন করিত তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ইহাতে মহারাজ নিতান্ত উদাস অন্তঃকরণে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন; তাহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিলেন না।

কয়েক বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইলে মহারাজ ক্রমেং ছত্র নাজীরের সৈন্য মধ্যে কতক সৈন্য বশীভূত করিলেন এবং রাজধানীতে যে সকল সৈন্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ রূপে হস্তগত করিয়া মহীনারায়ণের যে সকল আত্মীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলঃতাহাদের মধ্যে কতককে বিনষ্ট ও অবশিষ্টকে দূরীভূত করিলেন। ইহাতে মহীনারায়ণ রাগান্বিত হইয়া সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইল এবং উভয় পক্ষের অনেক লোক হতাহত হইল। মহীনারায়ণের চতুর্থ পুত্র চন্দ্রনারায়ণ যুদ্ধে নিহত হইল। মহীনারায়ণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন ও মহারাজ মোদনারায়ণ জয়লাভ করিলেন। দর্পনারায়ণ, জগৎনারায়ণ ও যজ্ঞনারায়ণ পলায়ন করিয়া ভোটান্তে গেলেন। মহীনারায়ণ সংসার ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলেন, সেই অবধি তাঁহার উপাধি "গোসাঞী" হইল। মহীনারায়ণ কিয়ৎকাল নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত দিগের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাজের নিকট ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলে এখান হইতে তাঁহাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠান হয়। ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধে বর্শাঘাতে গোসাঞী মহীনারায়ণ পরলোক গমন করেন। ইহার পর মহীনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ

প্রভৃতি ভোটিয়াদিগের সাহায্যে দুই তিন বার রাজা মোদনারায়ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; ঐ সকল যুদ্ধে মহারাজ জয়লাভ করেন, কিন্তু এইরূপ জ্ঞাতি বিরোধে মহারাজকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় রাজ্যে শান্তি ছিল না। ১৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া মহারাজ মোদনারায়ণ স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এই পর্য্যন্ত বিশ্বসিংহের বংশে যে ধারাবাহিক রূপে রাজার পুত্র রাজা হইয়া আসিতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল। ইহার পর মহারাজের ভ্রাতা বসুদেবনারায়ণ রাজা হইলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিতেছি। • ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় ॥৮॥

নবম অধ্যায়

সকলে শ্রবণ করুন। ১৭১ রাজশকে (১০৮৭ বঙ্গাব্দে ও ১৬১২ শকাব্দে) রাজা মোদনারায়ণ পরলোকগত হইয়া মাত্র মন্ত্রিবর্গ বৈকুণ্ঠপুরের জগদেব ও ভুজদেব রায়কতকে সংবাদ দিলেন। তখন তাঁহারা অতি পরাক্রান্ত ও সৈন্য সামন্ত সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা এই সংবাদ পাওয়া মাত্র, যদিও অতিদ্রুত বেগে রাজধানীতে আসিতে লাগিলেন, তথাপি গোঁসাঞী মহীনারায়ণের তিন পুত্র দর্পনারায়ণাদি, ইহার পূর্ব্বেই ভোটিয়াদিগের সহিত যোগ দিয়া রাজধানীতে আসিয়া কাহাকেও প্রাণে বধ করিল, কাহাকেও আবদ্ধ করিল এবং নানারূপ লুটপাট আরম্ভ করিল। মহারাজ প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বসুদেবনারায়ণ ও পৌত্র মাননারায়ণ কোঙর তাঁহার শিশু পুত্র সহ পলাইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে গেলেন। মহীনারায়ণের পুত্রদের মধ্যে কে রাজা হইবেন, তাহার পরামর্শ ও অনুষ্ঠান লইয়া সকলে ব্যস্ত আছেন, এই সময় সংবাদ পাইলেন যে, জগদেব ও ভুজদেব সসৈন্যে জটোদকা অর্থাৎ মানসাই নদী উত্তীর্ণ হইতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিগ্ দিগন্তরে পলাইতে লাগিল এবং জগদেব ও ভুজদেব সৈন্য সহিত ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কিন্তু ভোটিয়ারা বিশ্বসিংহকৃত ছত্র, দণ্ড, রাজাসন, ভগবতী দত্ত খড়্গ ও রত্ন কঙ্কণ প্রভৃতি যাহা এই রাজ্যের পরম বস্তু ছিল—সবই লুণ্ঠন করিল। ঐ সকল বস্তু ভোটিয়াদের হস্তগত হওয়া, বানরের মাণিক্য প্রাপ্তির ন্যায় হইল। তাহারা ঐ সকল অমূল্য দ্রব্যের মর্য্যাদা না জানিয়া, তাহা দুর্গম পর্ব্বত গুহায় পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল।

দর্পনারায়ণ কুঙর, জগৎনারায়ণ কুঙর ও যজ্ঞনারায়ণ কুঙর পর্ব্বতারোহণ করিয়া লুক্কায়িত থাকিলেন। জগদেব ও ভুজদেব কাহারও সাক্ষাৎ না পাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজছত্র, হনুমানদণ্ড ও রাজাসন নির্ম্মাণ করাইয়া বসুদেবনারায়ণকে রাজা

করিলেন। রায়কত ছত্র ধারণ করিলেন। বসুদেবনারায়ণের নামে মুদ্রা ও মোহর অঙ্কিত হইল এবং দ্বিতীয় 'সিংহ ছাপ' প্রস্তুত হইল। রাজকার্য্য যথারীতি পরিচালিত হইতে লাগিল। রাজধানীতে কিছুদিন থাকিয়া জগদেব ও ভুজদেব স্বস্থানে গমন করিলেন।

দর্পনারায়ণ কুঙর কিছুকাল পরে পর্ব্বতের দূষিত জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরিত হইলেন। তাঁহার শান্তনারায়ণ কুঙর ও সত্যনারায়ণ কুঙর নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান থাকিল।

মহারাজ বসুদেবনারায়ণ কোন প্রকারে দুই বৎসর রাজত্ব করিলেন। এই সময়ে মাননারায়ণ কুঙর পরলোকগমন করিলেন। ইহার পর জগৎনারায়ণ, যজ্ঞনারায়ণ ও দর্পনারায়ণের দুই পুত্র শান্তনারায়ণ ও সত্যনারায়ণ নিজ সৈন্য ও ভোটিয়াদিগের নিকট হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়া প্রজাদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন। মহারাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষেই বহু সৈন্য নিহত হইল। অবশেষে রাজসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতে না পারিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই রাজ পরিবারের সকলে মাননারায়ণের শিশুপুত্র মহীন্দ্রনারায়ণের সহিত স্থানান্তরে গমন করায়, মহারাজ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বারোহণে দেশান্তর যাইতে উদ্যত হইতেই বিপক্ষদলের সৈন্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং যজ্ঞনারায়ণের আজ্ঞায় তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল। রাজমন্ত্রী ও রাজসৈন্য হাহাকার করিতে২ দিগ্ দিগন্তরে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

যজ্ঞনারায়ণ রাজা হইবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু দণ্ড ও ছত্র মহীন্দ্রনারায়ণ সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে যাওয়ায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জগৎনারায়ণও রাজা হইবার জন্য ব্যগ্র। উভয় ভ্রাতার মধ্যে যখন এইরূপ গোলমাল চলিতেছে, জগদেব ও ভুজদেব এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কতক সৈন্যসহ একদিন ও রাত্রিমধ্যে বৈকুণ্ঠপুর হইতে যাত্রা করিয়া মানসাই নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রাজমন্ত্রী রাজসৈন্যসহ তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন। উভয়দল পরস্পরের সম্মুখীন হইলে, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহস্র২ সৈন্য নিহত হইল। অবশেষে জয়দেব ও ভুজদেব জয়ী হইলেন। জগৎনারায়ণ পর্ব্বতে পলাইয়া গেলেন।

জয়দেব ও ভুজদেব রাজবাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন সবশূন্য, স্থানে২ মৃতদেহ সকল পতিত হইয়া রাজবাড়ী শ্মশানতুল্য হইয়াছে। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের বংশের মধ্যে বালক মহীন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন অপর কেহ না থাকায়, তাঁহাকে দণ্ড, ছত্রাদি সহিত আনয়ন করিয়া ১৭৩ রাজশকে (১০৮৯ বঙ্গাব্দে ও ১৬০৪ শকাব্দে) রাজা করিয়া নিজে ছত্র ধারণ করিলেন ও মহারাজ

মহীন্দ্রনারায়ণের নামে মুদ্রা ও মোহর অঙ্কিত হইল। পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ স্ব২ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর রাজধানী রক্ষার্থে তাঁহাদিগের কতক সৈন্য তথায় রাখিয়া, রায়কতদ্বয় স্বস্থানে গমন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

১৭৩ রাজশকে মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ যখন রাজা হইলেন, তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। রূপচন্দ্রনারায়ণ মুস্তফীর পুত্র বিশ্বনাথ মুস্তফী প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। জগৎনারায়ণ কুঙর ও যজ্ঞনারায়ণ কুঙর সর্ব্বদা রাজ্যে উপদ্রব করিতে লাগিলেন। কখনও বা তাঁহারা রাজ্যের প্রান্তস্থিত প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করেন, কখনও বা সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করেন। এইরূপ দুঃসময়ে জগদেব রায়কত পরলোক গমন করিলেন এবং ভূজদেব পীড়িত হইয়া থাকিলেন। মন্ত্রিগণ রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবে অতীত হইল। ক্রমশঃই অনেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলের পরগণার সে সকল কার্য্যকারক ছিল, তাহারা সকলে রাজদ্রোহী হইয়া ক্রমে২ ঢাকার সুবাদার এব্রাহিম খাঁ ও তাহার পুত্র জবরদস্ত খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে কিছু২ কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়া ঘোড়াঘাটের ফৌজদারের অনুগত হইল। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত ও পাঙ্গার কুঙরেরাও ঐ সময় সুবেদারকে কর দিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন।

এই সময় জগৎনারায়ণ কুঙর, রূপনারায়ণ ও বিশ্বনারায়ণ কুঙর দুই পুত্র রাখিয়া, পরলোক গমন করিলেন। মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ নিরুপায় হইয়া যজ্ঞনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দিগকে আহ্বান করিয়া সন্ধি করিলেন এবং গোসাঞী মহীনারায়ণের ছত্র নাজীরী পদে যজ্ঞনারায়ণকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিলেন। ইহাতে ভোটিয়ারাও সাহায্য করিতে লাগিল। ফলে, যে দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আজ্ঞাবাহক মাত্র ছিল তাহারা সহায়তা করিতে লাগিল। তাহারা কখনও কখনও উপঢৌকনাদি প্রদান করিত কিন্তু রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিত না ; নিজ ইচ্ছামত সাহায্য করিত মাত্র।

যজ্ঞনারায়ণ সেনাপতি হইয়া যবন সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষে অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। স্থানে২ ভীষণ যুদ্ধ হইল। সেই সময় পাটগ্রামে যবনেরা রাজসৈন্যের মস্তক কাটিয়া মালা গাঁথিয়া বাঁশের উপর লটকাইয়া দিয়াছিল, তজ্জন্য ঐ স্থানের নাম 'মুণ্ডমালা' হইল। পূর্ব্ব অঞ্চলে রাজসৈন্যেরা ঐরূপ এক স্থানে অনেক যবনের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল বলিয়া সেই স্থানের নাম 'তুরুক কাটা' হইয়াছে। এইরূপে নানা স্থানে সৈন্যক্ষয় হইয়া রাজ্য নষ্ট হইতে লাগিল। যবনদিগের সহিত কোন প্রকারে

জয়ী হইতে পারিলেন না। বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত যবনেরা আয়ত্ত করিয়া লইল।

১৮২ রাজশকে যজ্ঞনারায়ণ পরলোক গমন করিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। দর্পনারায়ণের দুই পুত্র শান্তনারায়ণ ও সত্যনারায়ণ এবং জগৎনারায়ণের দুই পুত্র রূপনারায়ণ ও বিশ্বনারায়ণ, ইহারা সেনাপতি হইলেন। মহীন্দ্রনারায়ণ কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, শান্তনারায়ণ কুঙরকে ছত্র নাজীরী পদ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল হইল না। পূর্ব্ব দুই বৎসর যাবৎ বোদা ও পাটগ্রাম অঞ্চলে সর্ব্বদাই যুদ্ধ ও লোক বিনষ্ট হইতেছিল। এক্ষণে কার্জ্জিহাট, কাকিনা, টেপা, মন্থনা ও কুণ্ডী প্রভৃতি পরগণার কার্য্যকারকেরা রাজার বিরুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়া সুবেজাতে সন২ কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, খোদ জমিদার হইয়া সনদ গ্রহণ করিল। এই প্রকারে মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ ১১ বৎসর রাজত্ব করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসগামী হইলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করিলে মহারাজ প্রাণনারায়ণের বংশ লুপ্ত হইল। ঐ বংশে আর কেহই রইল না। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধর গোসাঞী মহীন্দ্রনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণের দুই পুত্র শান্তনারায়ণ ও সত্যনারায়ণ এবং জগৎনারায়ণের দুই পুত্র রূপনারায়ণ ও বিশ্বনারায়ণ এই চারিজনের প্রাধান্য ছিল। শান্তনারায়ণ রাজা হইতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু সৈন্যগণ তাহাতে সম্মত হইল না, বিশেষতঃ তিনি নাজীরী মনসবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে রূপনারায়ণ কুঙর রূপ, গুণ, জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম, গাম্ভীর্য্য, ধন, বীর্য্য ও দয়া প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবান ছিলেন। মন্ত্রিবর্গ ও সৈন্য সকল রূপনারায়ণকে রাজা করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং রাজলক্ষ্মীও তাঁহাকে কৃপা করিলেন। শান্তনারায়ণের ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারিল না। পরে তিনিও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নিজ ভ্রাতা সত্যনারায়ণের জন্য দেওয়ানী মনসবের প্রার্থনা করিলেন। সকলে এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মানুসারে ১৮৫ রাজশকে (১১০১ বঙ্গাব্দে ও ১৬১৬ শকাব্দে) রূপনারায়ণকে রাজা করিলেন। ছত্র নাজীর শান্তনারায়ণ ছত্র ধারণ করিলেন। মহারাজ রূপনারায়ণের নামে মুদ্রা ও মোহর অঙ্কিত হইল। ঐ মুদ্রা দিয়া সকলে নজর দিলেন। মহারাজ সত্যনারায়ণ কুঙরকে দেওয়ানী মনসব অর্পণ করিলেন।

এইরূপে সকলের সম্মতি সূত্রে রূপনারায়ণ রাজা, শান্তনারায়ণ নাজির, এবং সত্যনারায়ণ

দেওয়ান দেও হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিশ্বসিংহের বংশের সকলেরই 'দেও' অর্থাৎ দেব পদবী; তজ্জন্য সকলে 'নাজির দেও' 'দেওয়ান দেও' কিংবা 'নাজির দেওতা' ও 'দেওয়ান দেওতা' বলে। রাজা তাঁহাদিগকে 'নাজির কুঙর' 'দেওয়ান কুঙর' বলিতেন। মহারাজ রূপনারায়ণ রাজা হইয়া পূর্ব্ব মন্ত্রিগণকে সম্মানিত করিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা রাজকার্য্য করাইতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রীর উপাধি 'খাসনবীস' হইল। নাজীর দেও ও দেওয়ান দেও, মনসবদার কর্ম্মচারী তাঁহারা স্বহস্তে রাজকার্য্য করিতেন না।

এক দিবস রাজা রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী অকস্মাৎ তথায় আগমন করিলেন রাজা দর্শনমাত্র সমাদর পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী নানা প্রকার ধর্ম্মালাপ করিয়া কহিলেন, "এই স্থান তোমার বাসযোগ্য নহে, এ স্থানে তোমার অমঙ্গল হইবে। তোরসা নদীর পূর্ব্ব তটে গুড়িয়াহাটীতে নিবাস স্থাপন কর। সেখানে তোমার বংশের কল্যাণ হইবে। সে স্থানের নাম 'বেহার' হইবে, সে রত্নপীঠ, উত্তম স্থান।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। রাজা প্রত্যক্ষ শুনিলেন, কি স্বপ্ন দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার নিকটে ঘটনাটি বিভীষিকার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

মহারাজ ইহার পর বর্ত্তমানে যেস্থানে রাজবাটী অবস্থিত, এই স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া রাজধানী করিলেন। স্থানটি অতি রমণীয় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণাদি নানা জাতি আসিয়া বাস করিতে লাগিল। নগর ও বন্দর সুন্দর হইল। নাজীর দেও পঞ্চক্রোশ ব্যবধানে বলরামের নগর স্থাপন করিয়া ঐ স্থানের নাম 'বলরামপুর' রাখিয়া, তথায় স্বীয় আবাস স্থাপন করিলেন। দেওয়ান দেও 'বারামখানায়' আবাস নির্ম্মাণ করিলেন। রাজধানীতে নাজীর দেও ও দেওয়ান দেওয়ের পৃথক২ শিবির স্থাপিত হইল।

দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত পরগণা সহিত বোদা, পাটগ্রাম, পূর্ব্বভাগ সুবেদার কর্ত্তৃক দখল হইয়াছিল। মহারাজ রূপনারায়ণ প্রথমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হইতে না পারিয়া ঢাকার নবাব জবরদস্ত খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে চাকলে বোদা, চাকলে পাটগ্রাম ও চাকলে পূর্ব্বভাগ মহারাজের অধিকারে থাকিল কিন্তু সুবেদারকে কিছু২ কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইতে হইল। 'ছত্রধারী গজ সিকার রাজার' (স্বাধীন রাজার) পক্ষে অন্য কাহাকেও কর প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া শান্তনারায়ণ নাজির দেওয়ের নামে ইজারা লইয়া সেই নামে কর দিতেন কিন্তু সুবেদারের সেরেস্তায় 'শান্তনারায়ণ মোস্তাজির চাকলে বোদা ও গয়রহ তরফ রূপনারায়ণ মহারাজা বেহার' এই প্রকার লিখিত হইত। ১১১৮ সালে এই প্রকার বন্দোবস্ত হইল।

মহারাজ রূপনারায়ণ পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ তাঁহার উপেন্দ্র নারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, বিষ্ণুনারায়ণ ও খড়্গনারায়ণ নামে চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে নরেন্দ্রনারায়ণ ও বিষ্ণুনারায়ণ দুই পুত্রই অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণকে রাজযোগ্য ও গুণবান্ জানিয়া যুবরাজ করিলেন। শান্তনারায়ণ নাজির দেওয়ের সন্তান ছিল না তিনি মহারাজ রূপনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনারায়ণ কুঙরের দ্বিতীয় পুত্র ললিতনারায়ণকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ললিতনারায়ণ উপযুক্ত হইলে ১৯৯ রাজশকে শান্তনারায়ণ স্বর্গগত হইলেন। মহারাজ অনেক আক্ষেপ করিয়া তাঁহার পোষ্যপুত্র ললিতনারায়ণকে ছত্র নাজীরী মনসব প্রদান করিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইলেন এবং বিশ্বনাথ মুস্তফী পরলোক গমন করায় তাঁহার পুত্র কালিকাপ্রসাদ মুস্তফীকে পুরাতন মন্ত্রীর সন্তান বিধায়, পিতৃপদে নিযুক্ত করিলেন। মহারাজ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুর স্থাপিত করিয়া যথেষ্ট সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহারাজ 'পাটদেহড়' নামে পরিচিত এক দেবীমূর্ত্তি স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত হইলেন, তিনি অদ্যাপি আছেন। মহারাজ পরম ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং নীতিচরিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরমসুখে ২১ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া মহারাজ কৈলাসগমন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

সকলে শ্রবণ করুন। ২০৫ রাজশকে (১১২১ বঙ্গাব্দে ও ১৬৩৬ শকাব্দে) মহারাজ রূপনারায়ণ পরলোক গমন করিলে যুবরাজ উপেন্দ্রনারায়ণ কুঙর পূর্ব্ব প্রথানুসারে রাজা হইলেন। ছত্র নাজীর ললিতনারায়ণ কুঙর ও সত্যনারায়ণ দেওয়ানদেও মিলিত হইয়া তাঁহাকে রাজা করিলেন। নাজীর ছত্র ধারণ করিলেন, উপেন্দ্রনারায়ণের নামে মোহর ও মুদ্রা অঙ্কিত হইল। রাজকার্য্য পূর্ব্ববৎ সম্পন্ন হইতে লাগিল। মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভোটিয়াদের পর্ব্বত পর্য্যন্ত অধিকারে ছিল, 'নামদানীতে' অর্থাৎ সমভূমিতে তাহাদের অধিকার ছিল না। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বে ভোটিয়ারা ক্রমে২ সমতলভূমি আয়ত্ত করিতে লাগিল। রাজা কোন প্রকারে তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াও কোন ফল না হওয়ায় রাজা ও নাজীর যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন।

মহারাজ ক্রমে দুই বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'বড় আই দেবতীর' অর্থাৎ বড় মহারাণীর যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। রাজ্য প্রাপ্তির কিছুকাল পরে মহাদেব রায় 'খাসনবীস' হইলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও টেপার জমিদার। মহারাজের সহিত দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের পাগড়ী বদল হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কুটুম্বিতা হইয়াছিল। রাজা হইবার কিছুদিন পর নাজীর ললিতনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, মহারাজ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিশ্বনারায়ণ কুঙরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমনারায়ণের দুই পুত্রকে ক্রমান্বয়ে

নাজীরী মনসব দিলেন। জ্যেষ্ঠ অভয়নারায়ণ কিছু দিন নাজীরী করিয়া পরলোকগত হইলেন। তাঁহার ভগবন্ত নারায়ণ ও এক মাস বয়স্ক শিশু খগেন্দ্রনারায়ণ নামে দুই পুত্র থাকিল। অভয় নারায়ণের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেও হইলেন। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ 'লালাবাই' নামে এক নর্ত্তকীকে আনিয়াছিলেন। সে মহারাজের অতিশয় প্রিয় ছিল। তাহারই নাম হইতে 'লালবাজার' হইল। লাল বাইয়ের সহিত সহবাস করাতে বড়রাণী রাগান্বিতা হইয়া রাজাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। চাঁপা নামে তাঁহার এক দুয়ারাণী ছিল। তাহার এরূপ প্রতাপ ছিল যে, রাজা চাঁপা দুয়োরাণীকে অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে যাইতে পারিতেন না। পরে বড় আই দেবতী বেহারের রাজবাটীতে থাকিতেন এবং মহারাজ ধলিয়াবাড়ীতে একটি ছোট রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া ছোট আই দেবতীর সহিত প্রায় তথায় থাকিতেন।

যথাকালে মহারাজের সন্তান না হওয়ায় সত্যনারায়ণ দেওয়ান দেওয়ের পুত্র দীন নারায়ণ কুঙরকে (যাহাকে লোকে 'দীনদেও' বলিত) পোষ্যপুত্র রাখিলেন। দীননারায়ণ ক্রমে২ বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ তাঁহাকে অনেক কার্য্যের ভার দিতেন তিনিও সমস্তকার্য্য সম্পাদন করিতেন। মহারাজ তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইতেন। রুদ্রনারায়ণ নাজির দেও দীননারায়ণকে পরামর্শ দিলেন যে 'মহারাজ তোমাকে পোষ্যপুত্র রাখিয়াছেন এবং যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, যুবরাজী ওয়াক্কা অর্থাৎ সনদ তোমার লওয়া উচিত, নতুবা শেষে সব বৃথা হইবে, খড়্গনারায়ণ কুঙরের পুত্র রাজত্ব পাইবে।' দীন নারায়ণ এই কথায় ভুলিয়া রাজার ঘনিষ্ঠ লোকদ্বারা যুবরাজী সনদ পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মহাপুরুষ মহারাজকে তাঁহার ঔরসে পুত্র জন্মিবে এইরূপ বলিয়া ছিল, সেই আশায় মহারাজ তাঁহাকে যুবরাজী সনদ দিলেন না।

দীননারায়ণ ক্রোধান্বিত হইয়া ঢাকার সুবেদারের রংপুরের ফৌজদার মহম্মদ আলি খাঁর সহিত যোগদান করিলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন যে ফৌজদার সৈন্যসহ বেহারে আসিলে তিনি রাজাকে ধরাইয়া দিবেন ও তাঁহার অনুগত হইয়া রাজা হইবেন। মহম্মদ আলি খাঁ অনেক সৈন্য সহ দীনা দেওয়ের সহিত বেহারে আসিলেন। মহারাজ ও নাজীর দেও একত্রে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। দেওয়ান দেও আসিলেন না। মহাদেব রায় খাসনবীস পলাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সময় গৌরী নন্দন মুস্তফী প্রথম খাসনবীসী পদ প্রাপ্ত হইয়া যবন সৈন্যের অত্যাচারে, মহারাজ সহ সিংহেশ্বর ঝাড়ে গিয়া অবস্থান করিলেন। নাজীর দেও যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাঙ্গামাটি প্রস্থান করিলেন। মহম্মদ আলি খাঁ রাজ্য নিজ আয়ত্তাধীন করিতে লাগিল। দীন দেওরের স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মহারাজ সিংহেশ্বর ঝাড়ে থাকিয়া খাসনবীস ও গৌরী প্রসাদ বক্সীকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা

পুরাতন মন্ত্রীর বংশধর এবং রাজ সৈন্যাধ্যক্ষ, তোমাদের পক্ষে এই সময় নিরুৎসাহ থাকা উচিত নয়, অতএব নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাহস অবলম্বন করিয়া এরূপ চেষ্টা কর যাহাতে যবনসৈন্য পরাজিত করা যায়।" গৌরী প্রসাদ বক্সী আদি রাজাজ্ঞানুসারে অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, এক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলে ফল লাভ করা যাইবে না। তাঁহারা নিজেই সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ভোটিয়াদের সহিত এই সর্ত্তে সন্ধি করিলেন যে, যুদ্ধকালে তাহারা মহারাজকে সাহায্য করিবে। এই সংবাদ রাঙ্গামাটিতে নাজীর দেওকে প্রেরণ করা হইলে তিনিও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে গৌরী প্রসাদ বক্সী অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্ব সৈন্য ও নূতন সৈন্য দল একত্রিত করিয়া নানাবিধ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মহারাজ সমভিব্যাহারে স্বয়ং পশ্চিমদিক হইতে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পূর্ব্ব পরামর্শমত নাজীর দেও পূর্ব্বদিক হইতে সসৈন্যে আসিতে লাগিলেন ও রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য ভোটিয়াধিপতি উত্তরদিক হইতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তিন দিক হইতে এক সময়ে সৈন্য সকল আসিয়া মহম্মদ আলি খাঁকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেক যবন সৈন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট সৈন্য সহিত মহম্মদ আলি খাঁ রঙ্গপুরে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিলেন ও তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। দীনা দেও কোথায় গেলেন, বা তাঁহার কি হইল, তাহা জানা যায় নাই।

মহারাজ এইরূপে কল্পিত শত্রু দীনা দেওকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া আনন্দিত অন্তঃকরণে রাজপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌরী প্রসাদ বক্সীর কার্য্যকুশলতায় দুর্জ্জয় শত্রু মহম্মদ আলি পরাভূত হওয়ায়, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে খাসনবীসী পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পদপোযোগী খেলাত, নাগরা, নিশানাদি দিলেন ও তাঁহার অনুজ ভবানী প্রসাদ বক্সীকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। গৌরী প্রসাদ খাসনবীস হইয়া তাঁহার কার্য্য বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই সময় ভোটিয়ারা উত্তর অঞ্চলের অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইল। রাজা মোগলদিগের ভয়ে তাহাদিগের সহিত শত্রুতা করিতে সাহসী হইলেন না। সত্যনারায়ণ দেওয়ান দেও দীনা দেওয়ের সহায়তা করিয়া ছিলেন এই অপরাধে তাঁহাকে দেওয়ানী মনসব হইতে অপসারিত করিয়া মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খড়্গনারায়ণ কুঙরকে দেওয়ানী মনসবে নিযুক্ত করিলেন। সত্যনারায়ণ বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন তিনি নাজীর রুদ্রনারায়ণের বাসস্থানের নিকটস্থ 'সেহরাগুড়িতে' যাইয়া অবস্থান করিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় আছে। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ সাদির্খা নিবাসী গোসাঞীর শিষ্য হইয়াছিলেন। গোসাঞী প্রায়ই রাজধানীতে থাকিতেন। তিনি পরলোকগমন করিলে তাঁহার পুত্র রামানন্দ গোসাঞী রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ বহুদিন রাজত্ব করিবার পর শেষ বয়সে ছোট রাণীর গর্ভে

তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ। ঐ বালকের চতুর্থ বর্ষ বয়সে মহারাজ ৪৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৫৪ রাজশকে (১১৭০ বঙ্গাব্দে ও ১৬৮৫ শকাব্দে) ধলিয়াবাড়ীর আবাসে, শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন। বড় মহারাণী তৎকালে বেহারের রাজবাটীতে ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গৌরী প্রসাদ বক্সী ও গৌরী নন্দন মুস্তফী আদি মন্ত্রিবর্গ সহ মন্ত্রণা করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ ভবানী প্রসাদ বক্সী সহ তথায় যাইয়া রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেও ও খড়্গনারায়ণ দেওয়ান দেওকে আনাইয়া রাজ পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণকে অভিষিক্ত করিয়া রাজা করিলেন। বড় রাণী মৃত স্বামীর সহ গমন করিলেন। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়া বেহারে রাজধানীতে আসিয়া পিতার শ্রাদ্ধশান্তি করিলেন। মহারাজ তৎকালে শিশু ছিলেন। গৌরী প্রসাদ খাসনবীস ও গৌরী নন্দন মুস্তফী বিশেষ অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞলোক ছিলেন। তাঁহারা একত্রিত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমানে 'সিংহছাপ' হারাইয়া গিয়াছিল, পুনরায় সিংহছাপ প্রস্তুত করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে 'শ্রীছাপ' প্রস্তুত করাইলেন। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের শৈশবাবস্থার সুযোগ লইয়া নাজীর রুদ্রনারায়ণ সৈন্যের বেতন উপলক্ষ করিয়া রাজ্যের অনেক অংশ নিজে অধিকার করিলেন। মহারাজ রূপনারায়ণের দৌহিত্র সতর আঠার বৎসর বয়স্ক গৌরীনাথ বড় কাহেত কার্য্যী তৎকালে নাজিরের মুনসব (কর্ম্মচারী) ছিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়। ১২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই সময় খড়্গনারায়ণ দেওয়ান দেও স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার রাম, কৃষ্ণ, গোপাল, গোবিন্দ ও যদুমণী ওরফে যথাক্রমে রামনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, সুরেন্দ্রনারায়ণ ও বৈকুণ্ঠনারায়ণ নামে পাঁচ পুত্র ছিল। মহারাজ জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণকে দেওয়ানী মনসব প্রদান করিলেন। তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভোটিয়াদিগের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ক্রমশঃ অবস্থা এরূপ হইল যে, ভোটিয়াদের পক্ষে একজন প্রতিনিধি কতকগুলি ভোটিয়ার সহিত সর্ব্বদা রাজধানীতে থাকিত এবং মুখ্য২ রাজাকার্য্য তাহার বিনা সম্মতিতে হইতে পারিত না। বিশেষতঃ, প্রতি সন বাকসা দ্বারের সুবাদার এবং দেবরাজের প্রেরিত প্রধান২ ভোটিয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া 'চেচাখাতাতে' আসিত, এপক্ষ হইতে মহারাজ, নাজির দেও, দেওয়ান দেও সকলে ভোটিয়াদিগকে ভোজ দিবার জন্য সেখানে যাইতেন এবং তাহাদিগকে শূকর, মদ্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিতেন। ভোটিয়ারা ঘোড়া, কুচিন ও দেবাঙ্গ নামক বস্ত্র,

শ্বেত মালা, ভোট মালা, কস্তুরি, শ্বেত চামর, আখরোট, ভোট ঘৃত, ভোট কুল ইত্যাদি সামগ্রী মহারাজকে নজর স্বরূপ দিত। ভোটিয়ারা যে পরিমাণ নজর দিত তাহার মূল্যের দ্বিগুণ মুদ্রা 'ইনাম' স্বরূপ তাহাদিগকে দিতে হইতে। এই সকল শেষ হইলে তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিত ও রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপ প্রথা চলিতে লাগিল।

কোন প্রকারে মহারাজ দুইবৎসর রাজত্ব করিলেন। রামানন্দ গোসাঞীর সহিত রতি শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল, সে প্রায় সম্বৎসর বলরামপুরেই থাকিত। মহারাজের বয়ঃক্রম তখন ষষ্ঠ বর্ষ; এক দিবস অপরাহ্নকালে কয়েকজন সমবয়সী বালকের সহিত মহারাজ রাজবাটীর অগ্নিকোণ ও পদ্ম পুষ্করিণীর বায়ু কোণে একটি অশোক বৃক্ষের নিকট হাস্য কৌতুকে পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছিলেন। নিকটেই কুম্ভকারেরা একটি কূপ খনন করিতেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ রতি শর্ম্মা কোন্ দিক হইতে, কি প্রকারে এক তীক্ষ্ণধার তরবারিহস্তে আসিয়া তৎক্ষণাৎ এক আঘাতেই মহারাজের শিরশ্ছেদ করিয়া বাম হস্তে ছিন্নমুণ্ড কেশে ধারণ করিয়া দ্রুতগতি পদ্মপুষ্করিণীর অগ্নিকোণে অবস্থিত ইষ্টক নির্ম্মিত চণ্ডীর মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। স্বর্ণ পুত্তলিকাতুল্য মহারাজের মস্তকহীন দেহ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। খাঁড়াধরা প্রভৃতি রাজার রক্ষক ভৃত্য সকল হাহাকার শব্দ করিয়া রতি শর্ম্মার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ঐ মন্দির মধ্যেই কেহ শূল, কেহ তরবারি, কেহ বর্শাঘাতে তৎক্ষণাৎ রাজহন্তা ব্রাহ্মণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিনষ্ট করিল। রতি শর্ম্মা কি কারণে, ও কাহার পরামর্শে এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিল, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিল না।

রাজবাটী ক্রন্দনের ধ্বনিতে ও হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। ইতিমধ্যে কোন ভৃত্য ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া শরীরের নিকট রাখিয়াছিল। 'দেবাই' অর্থাৎ রাজমাতা নির্মুণ্ড দেহ ক্রোড়ে লইয়া 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজের হত্যার সংবাদ শুনিয়া গৌরীনন্দন মুস্তফী ও গৌরীপ্রসাদ খাসনবীস হতবুদ্ধি হইয়া উন্মাদের ন্যায় রাজবাটীতে আসিয়া অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ সহিত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে খাসনবীস মহামন্ত্রী গৌরীনন্দন মুস্তফীর সহিত শোক সংবরণ করিয়া সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া রামনারায়ণ দেওয়ান দেও আদি সকলকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া শোকমগ্ন হইয়া অনেক পরিতাপ করিয়া অবশেষে ছত্র নাজীর রুদ্রনারায়ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। লোকে, রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে "কাটা রাজা" বলে। এই রাজার রাজত্বকালে ২৫৫ রাজশকে (১১৭১ বঙ্গাব্দে) ও ইংরাজি ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট হইতে সুবে বাঙ্গলার সুবেদারদিগের অধিকার লোপ পাইয়া শ্রীশ্রীকোম্পানী বাহাদুরের আমল আরম্ভ হইল। ইতিপূর্ব্বে চাকলে বোদা প্রভৃতির কর যেরূপ সুবেদারদিগকে দেওয়া হইত এখন হইতে তৎপরিবর্ত্তে কোম্পানী বাহাদুরকে দেওয়া হইতে লাগিল। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

২৫৬ রাজশকে (১১৭২ বঙ্গাব্দে ও ১৬৮৭ শকাব্দে) মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ কাটা গেলে রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেও সংবাদ পাইয়া বাহ্যতঃ শোক প্রকাশ করিয়া আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন 'মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের বংশ শেষ হইল তাঁহার আর কোন সন্তান নাই। অন্যকে কি জন্য রাজা করিব? রাজ্য নিজ সংসারে আনাই যুক্তিযুক্ত। অভনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবন্তনারায়ণের দক্ষিণ পদ বিকল, কনিষ্ঠ পুত্র খগেন্দ্রনারায়ণ যদিও বালক, তথাপি ভবিষ্যতে ক্ষমতাপন্ন হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া প্রায় চরি পাঁচ সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া বেহার রাজধানীতে স্বীয় শিবিরে আসিয়া অবস্থান করিলেন। রামনারায়ণ দেওয়ান দেও এই সংবাদ শুনিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতুস্পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে অন্যে রাজা হইতে পারেনা। রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেও আশাস্ত্রীয় ও অনুচিত ব্যবহার করিলে যুদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া নিজের সৈন্য ও রাজ সৈন্য একত্রিত করিলেন কিন্তু তাহা নাজীর দেওয়ের সৈন্যের এক চতুর্থাংশও হইল না।

নাজীর দেওয়ের সৈন্য বেহারের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। তখন মহারাজ রূপনারায়ণের দৌহিত্র গৌরীনাথ বড় কাহেত কার্য্যী অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি মুস্তফী, গৌরীপ্রাসাদ খাসনবীস ও রামনারায়ণ দেওয়ান দেওকে বলিলেন, "সহসা কোনরূপ অনর্থ ঘটাইবার আবশ্যকতা নাই। নাজীর দেওয়ের সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিয়া কথোপকথন করিয়া দেখি, তাহাতে কি হয়।" এইরূপ স্থির করিয়া বড় কাহেত কার্য্যী ও খাসনবীস প্রভৃতি রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেওতার নিকট আসিয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। নাজীর দেও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া রাজা হওয়ার বিষয় উথাপন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণের আর সন্তান নাই, এজন্য, আমি খগেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে রাজা করা স্থির করিয়াছি, তোমরা কে কি বিবেচনা কর?" তখন গৌরীনাথ বড় কাহেত কার্য্যী বলিলেন, "মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশে যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাঁহাদের মধ্যে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, প্রাচীন এবং সকলের অভিভাবক স্বরূপ। সকলের উপর আধিপত্য করিয়া জীবনের অধিকাংশই যশের সহিত অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে চতুর্থ কালে উপনীত হইয়াছেন। আপনি যাহা করিবেন তাহার অন্যথাচরণ করা কাহারও শক্তি নাই। কিন্তু, একটি কথা; রতিশর্ম্মা চিরকাল বলরামপুরে থাকিয়া অকস্মাৎ আসিয়া শিশু রাজাকে হত্যা করিয়াছে; এখন যদি আপনি মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতুস্পুত্রদিগকে বিমুখ করিয়া আপনার ভ্রাতুস্পুত্রকে রাজা করেন, তাহা হইলে আবহমানকাল পর্য্যন্ত লোকে বলিবে 'রুদ্রনারায়ণ নাজির দেও শেষ বয়সে রাজ্যাভিলাষী হইয়া রতিশর্ম্মা দ্বারা বালক রাজাকে বধ করাইয়া রাজ্য আত্মসাৎ করিল,' ফলে, মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের হত্যার সম্পূর্ণ দোষ আপনার উপর থাকিবে।"

নাজীর দেও কিছুকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "বাপু! তুই বয়সে ছেলে মানুষ হইলেও বুড়ামানুষের মত ভাল কথা বলিয়াছিস। বল, তবে কাহাকে রাজা করি?" তখন সকলে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। খড়্গানারায়ণ দেওয়ান দেওয়ের পাঁচ পুত্র। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ দেওয়ানী মনসবে আছেন। দ্বিতীয় কৃষ্ণ, যাঁহার অপর নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে ক্ষত ছিল। অতএব তৃতীয় গোপাল, যাঁহার অপর নাম ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে রাজা করা স্থির হইল। বড় কাহেত কার্য্যী ও খাসনবীসাদি আসিয়া দেওয়ান দেওকে সমস্ত বলিলে তিনি সম্মত হইলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলেন। নাজীর দেও ছত্র ধারণ করিলেন। মহারাজার নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইল, তদ্বারা নাজীর দেও দেওয়ান দেও ও অন্যান্য সকলে নজর দিলেন। সকল কার্য্য সমাপন করিয়া নাজীর দেও স্বস্থানে গমন করিলেন। দেওয়ান দেও বারামখানার আবাসে গমন করিলেন।

এই সময় নাজীর দেও সৈন্যের বেতন দিবার নিমিত্ত জিলা মাথাভাঙ্গা ও জিলা গিতালদহ নিজ আয়ত্তাধীন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌরীপ্রসাদ খাসনবীস ও তাঁহার ভ্রাতা ভবানীপ্রসাদ পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্র রামেশ্বর বক্সী ও বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সী অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় গৌরনন্দন মুস্তফী খাসনবীসের কার্য্য করিতে ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা শচীনন্দন মুস্তফী সর্ব্বদা মহারাজের হুজুরে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি মহারাজের অতি প্রিয় পাত্র ও সম্মানিত হইয়াছিলেন অনেক রাজকার্য্য তাঁহার মন্ত্রণানুসারে সম্পন্ন হইত।

ভোটানের দেবরাজ মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ কাটা যাওয়ার সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, রতিশর্ম্মা রামানন্দ গোসাঞীর স্বগ্রামবাসী ও তাহার আনীত এবং যে তরবারি দ্বারা সে মহারাজকে কাটিয়াছিল তাহা গোসাঞীর ছিল, এই সকল অবগত হইয়া গোসাঞীকে অকস্মাৎ ধরিয়া স্বীয় রাজধানী পুনাখায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে খণ্ড২ করিয়া ছেদন করিলেন। তৎপর কয়েকজন ভোটিয়া সহ পেনস্থ তোমাকে রাজধানীতে স্থাপিত করিলে। তাহাদিগের সম্মতি ভিন্ন কেহ কোন কার্য্য করিতে পারিত না। ভোটিয়ারা ক্রমেং জল্পেশ্বর, মন্দাশ প্রভৃতি রাজ্যের অনেক স্থান অধিকার করিয়া লইল, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিল না। তখন পর্য্যন্ত লক্ষ্মীপুর, সন্তরাবাড়ী, মরাঘাট ও ভলকা প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কেহ ভোটিয়াদের বিরুদ্ধতা করিলে তাহার উপর উহারা অতিশয় অত্যাচার করিতে লাগিল।

রামানন্দের মৃত্যুর পর সর্ব্বানন্দ গোসাঞী বেহারে আসিয়া মহারাজকে দীক্ষা দান

করিয়া রাজগুরু হইলেন। ২৫৮ রাজশকে, মহারাজ, ভুবনেশ্বরী দেবী প্রভৃতি পঞ্চকন্যা সহিত রূপচন্দ্র বড় কাহেত কার্য্যীর ভগ্নী মহারাণী কামতেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করিলেন। ২৫৯ রাজশকে রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেও পরলোক গমন করেন। মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে নানা সামগ্রী পারিতোষিক দিয়া ছত্র নাজীরী মনসব প্রদান করিলেন। খগেন্দ্রনারায়ণ নাজির দেও তখন হইতেই অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন, এবং তিনি অযথা অত্যাচার ও প্রজা বিনষ্ট করিতেন।

রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য খাসনবীস গৌরীনন্দন মুস্তফী করিতেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আধিপত্য দেওয়ান দেওয়ের ছিল। তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য হইতে পারিত না। ঐ সনে মহারাণীর গর্ভে রাজপুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজের কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ উপস্থিত হইলে, মহারাজের ইচ্ছা ছিল তাহাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করেন, কিন্তু দেওয়ান দেওয়ের ইচ্ছা, গেলেঙ্গ কার্য্যীর সহিত বিবাহ হয় অবশেষে অনেক আপত্তি সত্বেও দেওয়ান দেওয়ের ইচ্ছা অনুসারেই বিবাহ দিতে হইল।

২৬০ রাজশকে ভোটানের দেবরাজ, মহারাজ ও দেওয়ান দেওকে পত্র দিলেন যে, তাঁহার সহিত বিজয়পুরের যুদ্ধ উপস্থিত; ভোট সৈন্য যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতেছে মহারাজ যেন সৈন্যসহ রামনারায়ণ দেওয়ান দেওকে প্রেরণ করেন; উভয় দল একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করিবে। তদনুসারে দেওয়ান দেও রাজ-সৈন্যসহ গমন করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন ও বিজয়পুর দেবরাজের অধিকারভুক্ত হইল। দেওয়ান দেও ঐ দেশে যে সকল ধন রত্ন ও লুণ্ঠিত সামগ্রী পাইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ মহারাজকে নজর স্বরূপ দিয়া অবশিষ্ট সমস্তই নিজে আত্মসাৎ করিলেন। মহাপাত্র শচীনন্দন মুস্তফী, রামঠাকুর, কালা পূজারী এবং কালা খাঁড়াধরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বদা মহারাজের সান্নিধ্যে যাইতেন এবং মহারাজও তাঁহাদিগের কথা শুনিতেন। ইঁহারা ব্যঙ্গ করিয়া মহারাজকে বলিলেন, "রামনারায়ণ দেওয়ান দেওই কর্ত্তা, তিনি যাহা করেন তাহাই হয়; তুমি নামে মাত্র রাজা; তোমার সহোদরা ভগ্নীর বিবাহ, তোমার ইচ্ছামত না হইয়া তাঁহার ইচ্ছামত হইল। বিজয়পুরে যুদ্ধ করিয়া তিনি যত ধন আনিলেন, সবই নিজে লইয়া তোমার মনরক্ষার্থে সামান্য কিছু পাঠাইয়াছেন। দেওয়ান দেও বর্ত্তমানে তোমার রাজত্ব করা মিথ্যা, নামে মাত্র রাজা হওয়া এক উপহাসের বিষয়"। এইরূপ তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন। অবশেষে মহারাজ বলিলেন "একথা যথার্থ, কিন্তু প্রতিকারের পরামর্শ কি?" সকলে যুক্তি করিয়া দেওয়ান দেওকে বিনষ্ট করাই স্থির করিলেন।

অতঃপর জনৈক লোক দ্বারা দেওয়ান দেওকে মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ দিলেন। দেওয়ান দেও সরল মনে এবং 'জানিনা শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা' এই চিন্তা করিয়া বৈকালে মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত রাজধানীতে আসিলেন। পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হইয়া ছিল।

প্রথম দ্বারে রাজসৈন্যাধিপতি গন্ধর্ব্ব সিংহ বলিলেন, "মহারাজের শরীর অসুস্থ, সৈন্যগণ এইখানেই থাক।" দেওয়ান দেও আজ্ঞা দিলেন, সকল সৈন্য বাহিরে থাকিল, কেবল পাঁচ সাত জন খিদমতগার সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিলদ্বারের (প্রস্তর তোরণ) রক্ষক নিবেদন করিল, "মহারাজ অসুস্থ, দুই একজন লোক লইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন।" দেওয়ান দেও বলিলেন, "আচ্ছা"। পুষ্করিণীর উত্তর পার্শ্বে এক চৌয়ারী ঘরে মহারাজ ছিলেন। রাম ঠাকুর, কালা পূজারী, কালা খাঁড়াধরা প্রভৃতি কয়েকজন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তথায় লুক্কায়িত ছিলেন। ঐ গৃহের সোপানের নিকট দেওয়ান দেও উপস্থিত হইলে, ঐ স্থানে যে লোক ছিল সে বলিল, "কেবল আপনার যাইবার আজ্ঞা আছে, অন্য লোকের যাওয়া নিষেধ।" দেওয়ান দেও একাকী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মহারাজ আদৌ অসুস্থ নহেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করিলেন।

বিশ্বসিংহর বংশের কুঙরদিগের কাহারও অস্ত্রছাড়া এক মূহূর্ত্তও থাকা রীতিবিরুদ্ধ। দেওয়ান দেওয়ের কটিদেশে তরবারি আবদ্ধ ছিল। মহারাজ বলিলেন, "দাদা! দেখি আপনার তরবারি কিরূপ?" দেওয়ান দেও তৎক্ষণাৎ অম্লানচিত্তে তরবারি খুলিয়া মহারাজকে দিলেন। মহারাজ ঐ তরবারি হস্তে লইয়া দুই একবার নিরীক্ষণ করিয়াই দেওয়ান দেওয়ের দেহে স্বহস্তে আঘাত করিলেন। দেওয়ান দেও আঘাত নিবারণার্থ বামহস্ত দ্বারা অস্ত্রের অগ্রভাগ ধরিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমার কি অপরাধ?" অস্ত্রাঘাতে তাঁহার বাম হস্তের কিয়দংশ কর্ত্তিত হইয়া গেল। দেওয়ান দেও ধাবিত হইয়া ঐ গৃহের পশ্চিমদ্বার দিয়া অঙ্গনে আসিতে না আসিতেই কালা খাঁড়াধরা আদি সকলে— তাহারা পূর্ব্ব হইতেই আজ্ঞা প্রাপ্ত ছিল—শূল, বর্শা ও তরবারির আঘাতে দেওয়ান দেওকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। দেওয়ান দেওয়ের অনুগামী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। গন্ধর্ব্ব সিংহ জমাদার তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "রাজা অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রতিফল ঈশ্বর তাঁহাকে দিবেন, এখন তোমরা ও আমরা আপোষে কাটাকাটি করিয়া মরি কেন?" ইহা শুনিয়া সৈন্য সকল ক্ষান্ত হইয়া চলিয়া গেল। শোনা যায়, ঐ দিবস ও মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের হত্যার দিবস, অকস্মাৎ কুজ্ঝটিকা হইয়া দুইদণ্ড পর্য্যন্ত রাজধানী অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥১৪॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

২৬০ রাজশকে (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) রামনারায়ণ দেওয়ান দেও নৃশংসভাবে নিহত হইলে দেবরাজের প্রতিনিধি পেনস্থ তোমা কাহাকেও কিছু বলা অনুচিত বিবেচনা করিয়া রাজাকে

যে সকল ব্যক্তি ঐরূপ কুপরামর্শ দিয়াছেন তাহাদিগের নাম লিখিয়া লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাকসাদুয়ার হইয়া পুনাথায় গেলেন। গৌরীনন্দন মুস্তফী খাসনবীস ইতিপূর্ব্বেই স্থবিরত্ব নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন। শচীনন্দন মুস্তফীই সমস্ত রাজকার্য্য করিতেন। অকস্মাৎ দেওয়ানদেও নিহত হওয়ার সাংঘাতিক সংবাদ শুনিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ রামনারায়ণ দেওয়ান দেওয়ের অনুগত ছিলেন। তিনি ভীত হইয়া বলরামপুরে নাজীর দেওয়ের নিকট গেলেন এবং তাঁহার পরামর্শ মতে বাকসাদুয়ারে যাইয়া দেবরাজের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

মহারাজ আপন অনুজ গোবিন্দ, যাঁহার অপর নাম সুরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে দেওয়ানী মনসব দিলেন। এই সময় সর্ব্বানন্দ গোসাঞী, কাশীনাথ লাহিড়ীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গপুর হইতে রাজধানীতে আসিয়া মহারাজকে অনেক অনুযোগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে, ভগবানের যাহা ইচ্ছা ছিল তাহা হইল। দেবরাজ এই সংবাদ শুনিয়া স্থির করিলেন, মহারাজ উন্মাদ হইয়াছেন। রামনারায়ণ দেওয়ানদেও তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হত্যা করায় অতিশয় রুষ্ট হইয়া, দেবরাজ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অন্য এক জন অর্থাৎ রামনারায়ণ দেওয়ান দেওয়ের অনুগত রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করা স্থির করিয়া কয়েজন প্রধান২ ভোটিয়াকে সৈন্য সহিত বাকসা দুয়ারে প্রেরণ করিলেন। তাহারা বার্ষিক ভোট ভোজ উপলক্ষ করিয়া সংবাদ পাঠাইল যে, এবৎসর যেন মহারাজ স্বয়ং দেওয়ানদেও সহিত আসিয়া ভোট ভোজে যোগদান করেন।" মহারাজ উত্তর পাঠাইলেন, "এরূপ নিয়ম আছে যে, মহারাজ কোন কারণে যাইতে না পারিলে কার্য্যকারক সকলে যাইয়া ভোট ভোজ দেয়। আমার শরীর অসুস্থ, খাসনবীসাদি সকলে যাইয়া ভোট ভোজ দিবে।" এই বিষয় লইয়া কয়েকবার উত্তর প্রত্যুত্তর চলিল, কিন্তু ভোটিয়ারা কিছুতেই সম্মত হইল না এবং উত্তর দিল যে, এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে তাহারা ভোজ গ্রহণ করিবে না, কারণ ইহাদ্বারা মহারাজ প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন।

গোসাঞী সর্ব্বানন্দ ও কাশীনাথ লাহিড়ী মহারাজের যাওয়া কোন প্রকারেই সমর্থন করিলেন না। গৌরী নন্দন মুস্তফী বলিলেন, "আমি যাইয়া তাহাদের প্রকৃত মনোভাব বুঝিয়া আসি।" তিনি যাইয়া ভোটিয়াদিগের সহিত আলাপ করিয়া কোনরূপ কপটতা বা শঠতা বুঝিতে পারিলেন না। পেনসু তোমা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মহাকালের নামে শপথ করিয়া জানাইল তাহাদের মনে কোন প্রকার কুঅভিসন্ধি নাই। মহারাজ তখন যাওয়াই স্থির করিলেন। গোসাঞী ও লাহিড়ী পুনঃ২ নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না।

মহারাজ, দেওয়ান দেও, নাজীর দেও সকলেই চেচাখাতা গমন করিলেন। ভোটিয়ারাও সসৈন্যে তথায় আসিল। মহারাজ দক্ষিণ হইতে যাইয়া চেচাখাতার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান

করিতেন, ভোটিয়ারা উত্তর পার্শ্বে থাকিত। এইবার দেখা গেল, যে স্থান রাজার জন্য নিরূপিত আছে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভোটিয়াদের এক বৃহৎ ছাউনি হইয়াছে। মহারাজ তাঁহার জন্য নিরূপিত স্থানে যাইয়া অবস্থান করিলেন। নাজির দেও সৈন্য সহ কিছু পশ্চাতে শিবির স্থাপিত করিলেন। নাজীর দেও যাওয়াতে ভোটিয়ারা আপত্তি করিয়া কহিল, দেবরাজের 'আজ্ঞা নাই'। নাজীর দেও তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া সেই স্থানেই থাকিলেন। সেই দিবস ভোটিয়ারা রাজাকে কিছু বলিল না। পরদিন প্রাতে মহারাজকে বলিল, "দেওয়ান দেও সহিত আপনাকে বাক্‌সা দুয়ারে যাইতে হইবে।" মহারাজ ইহা শুনিয়া নীরব রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভোটিয়ারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া দুইটি অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া আনিয়া মহারাজের নিকট যাইয়া কহিল, "দেওয়ান দেও সমভি-ব্যাহারে আপনি অশ্বারোহণ করুন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যাইতেই হইবে।" ভোটিয়ারা ইতিমধ্যে শচীনন্দন, মুস্তফী, রামঠাকুর, কালা পুজারী, কালা খাঁড়ধরা, পতি ঝাড়িধরা প্রভৃতি যাহারা রামনারায়ণ দেওয়ান দেওকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহাদের সকলকে বন্দী করিয়া তাহাদের মধ্যে কালা খাঁড়াধরা ও পতি ঝাড়িধরা প্রভৃতিকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিল। মহারাজ অনুপায় দেখিয়া অশ্বারোহণে বাক্‌সা দুয়ার গমন করিলেন। ভোটিয়া সৈন্যদের কতকাংশ তাঁহার অনুগমন করিল কতক সেই স্থানে থাকিল। নাজীর দেও এই সংবাদ পাইবা মাত্র উঠিয়া আসিলেন, গৌরীনন্দন মুস্তফী আদি অনুসন্ধানার্থ নানা স্থানে গেলেন। ভোটিয়াদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন সৈন্যসহ রাজেন্দ্রনারায়ণকে লইয়া বেহারে আসিলেন। দুই দিবস অতীত হইলে, ভোটিয়ারা মহারাজ দেওয়ান দেও প্রভৃতিকে লইয়া পুনাখাতে পৌঁছিল। দেবরাজের লোকে তাঁহার আজ্ঞানুসারে মহারাজ ও দেওয়ান দেও ভিন্ন রামঠাকুর আদি অন্যান্য সকলকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। তাহাদিগকে আহারের জন্য দিনান্তে কিছু অপরিস্কৃত চাউল, কিছু ছেকা ও শুক্‌না মাছ দিত। মহারাজ ও দেওয়ান দেওকে নজর বন্দী কয়েদ করিয়া রাখিল এবং আহারের জন্য কিছু২ খাদ্য সামগ্রী দিত।

এদিকে ভোটিয়ারা রাজেন্দ্রনারায়ণকে আনিয়া রাজা করিয়া তাঁহার রক্ষার্থে পেনসু তোমার অধীনে কিছু ফৌজ বেহারে রাখিয়া স্বস্থানে গমন করিল। মহারাণী ও অন্যান্য রাণীরা এই সকল সংবাদ পাইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন; প্রস্তরে মস্তক ও মস্তকে প্রস্তর আঘাত করা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন উপায় রহিল না। তাঁহারা শিশু রাজকুমার ধরেন্দ্র-নারায়ণকে লইয়া অন্তঃপুরের এক পার্শ্বে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ লাহিড়ী বিদায় লইয়া রঙ্গপুরে গেলেন। গোসাঞী সর্ব্বানন্দ পূর্ব্ব হইতে বেহারে ছিলেন, তিনি বেহারেই থাকিলেন। নাজীর দেওয়ের নিন্দায় চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই বলিতে লাগিল 'নাজীর দেও মহারাজের চাকর ও সেনাপতি, তাঁহার উপস্থিতিতে

ভোটিয়ারা মহারাজকে ধরিয়া লইয়া গেল, অথচ তিনি যুদ্ধ না করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আসিলেন!" ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

২৬১ রাজশকে (১১৭৮ বঙ্গাব্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইলেন। গৌরীনন্দন মুস্তফী লজ্জাবশতঃ আসিলেন না। মহারাজ হরেশ্বর কার্য্যীকে 'খাস দেওয়ানিয়া' ও যদুনন্দনকে 'ভাণ্ডারঠাকুর' নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা দুইজন মহারাজের সান্নিধ্যে থাকিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহারা উপলক্ষ মাত্র হইলেন, প্রকৃতপক্ষে পেনস্থ তোমার অভিপ্রায় ভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারিত না। ইঁহারা সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবাহক ছিলেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। স্বীয় অধিকার ভুক্ত স্থান রক্ষা করাই নাজীর দেওরের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা ভোটিয়াদের সহিত বিরোধ হইতে লাগিল। তাহাদের প্রাদুর্ভাব অসহনীয় হইল। রাজা ও নাজীর দেও নামে মাত্র থাকিলেন। মহারাণীর 'খামার খাতা' ও 'অন্দরাণ' ভূমির আয় হইতে অন্দরের রাণীদিগের ও রাজমাতা সত্যভামা দেবীর ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। কখনও বা কৌশলে কিছু২ খরচ বন্দী মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ ভাবে কোন প্রকারে দুই বৎসর কাল অতীত হইলে, মহারাজের বিবাহের আয়োজন হইল এবং সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইল।

নাজীর আসিলেন। লৌকিকতা সহ দেবরাজের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরণ করা হইয়াছিল তাঁহার নিকট হইতে একজন কর্ম্মচারী নানাবিধ মূল্যবান যৌতুক সহ উপস্থিত হইলেন। কাশীনাথ লাহিড়ী রঙ্গপুর হইতে আসিলেন। গোসাঞীজী পূর্ব্ব হইতেই বেহারে ছিলেন। পরম আমোদ আহ্লাদে ২৬২ রাজশকের শেষভাগে মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হইল। নাজীর দেও, বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুঙর, অন্যান্য কুঙর সকল ও রাজাদিগের দৌহিত্র সন্তান (যাঁহাদের পদবী ঈশ্বর) এবং কার্য্যী অর্থাৎ কুটুম্ব সকল যৌতুকাদি দিয়া প্রস্থান করিলেন। বিবাহের পর পঞ্চ দিবসে মহারাজ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সপ্তম দিবসেই শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন। সকলে আর্ত্তনাদ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। লোকে রাজেন্দ্রনারায়ণকে 'লখাই রাজা' বলে। ইঁহার রাজত্ব কাল দুই বৎসর মাত্র। ইঁহার সময় নারায়ণী টাকাতে চিহ্নস্বরূপ একটি ফুল অঙ্কিত হইয়াছিল। এখনও ঐ মুদ্রা দেখিলে সেই চিহ্ন পাওয়া যায়। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

২৬২ রাজশকে (১১৭৮ বঙ্গাব্দে ও ১৬৯৩ শকাব্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ কৈলাসগামী হইলে, বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুঙর (লোকে তাঁহাকে 'ছোট সাহেব' ও 'চাউল খাওয়া' সাহেব বলিত) রাজ্য লাভের জন্য ব্যগ্রচিত্তে লোকদ্বারা পেনস্থ তোমার সহিত মিলিত হইলেন। পেনস্থ তোমা দেবরাজের অভিপ্রায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে দণ্ড ও ছত্র থাকিত। যাহাতে কেহ তাঁহাদের বিনানুমতিতে ঐ দণ্ড ও ছত্র স্থানান্তরিত করিতে না পারে তজ্জন্য বৈকুণ্ঠনারায়ণ পেনস্থতোমা দ্বারায় কয়েক জন ভোটিয়া প্রহরী তথায় নিযুক্ত করিলেন এবং হরেশ্বর কার্য্যী ও যদুনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর ঐ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতে সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকিতেন।

কাশীনাথ লাহিড়ী, গোসাঞীর সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাণীর আজ্ঞা লইয়া তৎক্ষণাৎ বলরামপুরে যাইয়া খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীর দেওকে রাজার মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া বলিলেন, "যদি আপনি এই সময় মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ কাছুয়াকে রাজা না করেন, তাহা হইলে রাজ্য ভোটিয়ার অধীন হইবে, এবং আপনিও সুখে থাকিতে পারিবেন না।" নাজীর দেও বলিলেন, "তুমি যথার্থ বলিয়াছ; তুমি অগ্রগামী হইয়া রাজা হইবার সকল অনুষ্ঠান কর, আমি তোমার পশ্চাৎ আসিতেছি। যদি পেনস্থ তোমা দণ্ড ও ছত্র না দেয় তাহা হইলে তাহাকে দূর করিয়া দেও।"

লাহিড়ী অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া রঙ্গমন্দিরে রাজাসন স্থাপন করিলেন। এই সময় নাজীর দেওরের ডঙ্কা শুনা যাইতে লাগিল। হরেশ্বর কার্য্যী ও যদুনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। নাজীর দেও বহু সৈন্যসহ আসিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিয়া ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া রঙ্গমন্দিরে আসিলেন এবং পেনস্থ তোমার রক্ষকদিগকে বিতাড়িত করিয়া দণ্ড ও ছত্র আনাইলেন। তখন বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুঙর নাজীর দেওরের নিকট দেওয়ানি মনসব পাইবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মহারাজের নামে মোহর ও মুদ্রা অঙ্কিত হইল। মহারাজ রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। নাজীর দেও ছত্র ধারণ করিলেন ও নূতন মুদ্রা দ্বারা নজর প্রদান করিলেন। মহারাজের আজ্ঞায় মৃত রাজার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

মহারাণীর আদেশে কাশীনাথ লাহিড়ী খাবনবীস নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিয়া নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গোসাঞী ও খাসনবীস মহারাণীর আজ্ঞায় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু নাজীর দেওয়ের ইচ্ছা যে, তাঁহার আজ্ঞায় রাজকার্য্য পরিচালিত হয়। ক্রমেই কোন২ বিষয় লইয়া উভয় পক্ষ

মধ্যে অনৈক্য হইতে লাগিল এবং গোসাঞীর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবে তিন মাস কাল কাজকর্ম্ম চলিল। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণকে নাজীর দেও রাজা করার পর পেনস্থ তোমা কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাক্সা দুয়ার হইয়া দেবরাজের নিকট যাইয়া সমুদয় বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন।

দেবরাজ এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "নাজীর দেও ভৃত্য বিশেষ, রাজা নির্ব্বাচন করিবার তাহার কি অধিকার?" এই বলিয়া তিনি তিন কাহন সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে কতক সৈন্য চেচাখাতা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। এই সময় নাজীর দেও তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। ভগবন্তনারায়ণের একটি পা বিকল থাকিলেও অশ্বারোহণে ও যুদ্ধে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উভয় দল সম্মুখীন হইলে ভীষণ যুদ্ধ হইল, রাজসৈন্যের কতকাংশ বিনষ্ট হইলেও, ভোটিয়া সৈন্যদল বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইল।

দেবরাজ এই সংবাদ পাইয়া আরও অধিক সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া নাজীর দেও ব্যস্ত হইয়া রাজমাতা মহারাণী ও রাজ পরিবারের অন্যান্য সকলকে বলরামপুরে লইয়া গেলেন এবং সৈন্য যোজনা করিতে লাগিলেন। গোসাঞী ও খাসনবীস মহারাজকে বলরামপুরে রাখিয়া আরও সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য রঙ্গপুর গেলেন। প্রথমে রূপন সিংহ জমাদারকে, সৈন্য সমভিব্যাহারে বেহারে পাঠাইয়া, পরে আরও বেতনভোগী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। নাজীর দেওরের তিন সহস্র সৈন্য, কোষাগার ও রাজ-পুরী রক্ষক সৈন্য সংখ্যা তিন চারি শত, এবং নব নিযুক্ত সৈন্য পাঁচ সাত শত মোট রাজ-সৈন্যের সংখ্যা চারি সংস্রাধিক হইল না। ইহাদের মধ্যে কিয়দংশ খড়্গ চর্ম্মধারী, কিয়দংশ ধনুর্ব্বাণধারী, কতক বন্দুকবরদার এবং কতক শেল ও বর্শাধারী ছিল। কয়েকটি কামানও ছিল। কিন্তু তাহাদিগের শ্রেণী বিভাগ ছিল না। অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈনিকও কিছু ছিল। নাজীর দেও সৈন্যাধ্যক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণ কুঙর তাঁহার সহকারী ছিলেন; গোসাঞী ও খাসনবীস তাঁহাদের সঙ্গে২ চলিলেন। তাঁহারা এই সকল সৈন্য লইয়া বেহারের উত্তরদিকে নানা স্থানে থানা স্থাপন করিয়া সৈন্যদলকে বিভক্ত করিয়া সমাবেশ করিলেন।

এদিকে দেবরাজ ভোটান্তের আঠার দুয়ারের সৈন্য আহ্বান করিয়া ষোল কাহন সৈন্য একত্রিত করিলেন এবং আপন ভাগিনেয় জিম্পেকে তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ কোচবিহার রাজ্য অধিকার করিয়া একজনকে রাজা মনোনীত করিতে এবং মহারাজ, নাজীর দেও ও গোসাঞীকে পাইলে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ভোটিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কতক সৈন্যের মস্তকে

লৌহের পাক পাত্র, (যাহাকে 'লুইয়া' বলে) সর্ব্বাঙ্গে নানা বস্ত্রের উপ লৌহশৃঙ্খল জাল বেষ্টিত, কোমরে দুইখানা ভোটছোরা আবদ্ধ; হস্তে তীর ধনুক, কাহারও হস্তে বন্দুকও আছে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে বিশেষ অভ্যস্ত নহে। দূর হইতে তীরধনু এবং নিকটে আসিলে ভোটছোরা দ্বারা যুদ্ধে তাহারা অদ্বিতীয়। এরূপ খর্ব্বাকৃতি অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে আর কোন জাতি তাহাদিগের সমকক্ষ ছিল না। তাহাদের সকলের হস্তেই ছয় হাত পরিমিত একখানি তীক্ষ্ণাগ্র কাষ্ঠখণ্ড থাকিত, তাহারা রাত্রিকালে যে স্থানে অবস্থান করিত তাহার চতুর্দ্দিকে ঐ সকল কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত করিয়া শিবির নির্ম্মাণ করিত এবং প্রভাতে যাত্রা করিবার সময় নিজ২ কাষ্ঠখণ্ড লইয়া অগ্রসর হইত।

ভোটান্তের দক্ষিণদিক বাক্সা দুয়ার, লক্ষ্মীপুরের দুয়ার, হলদিবাড়ী দুয়ার ও অন্যান্য যে সকল দুয়ার দিয়া পর্ব্বত হইতে আসিবার পথ আছে, সব দুয়ার দিয়াই দলে২ ভোটসৈন্য নামিতে লাগিল এবং মহারাজের প্রেরিত সৈন্যের যেং২ স্থানে ছাউনি ছিল তাহা বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অনেক সৈন্য নিহত হইল। ক্রমে২ সর্ব্বত্রই রাজসৈন্য যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। ভোটিয়ারা জয়লাভ করিয়া রাজ্য আক্রমণ করিল। গোসাঞী, খাসনবীস ও নাজীর দেও বলরামপুর যাইয়া মহারাজ, রাজমাতা ও মহারাণীদিগকে সঙ্গে লইয়া পাঙ্গায় রাখিয়া রঙ্গপুর গমন করিলেন। নাজীর দেও তাঁহার পরিবারবর্গকে রাঙ্গামাটিতে পাঠাইয়া দিয়া কতক সৈন্য সহিত কখনও বলরামপুরে কখনও বা মোগলানে বাস করিতে লাগিলেন।

জিম্পে অবশেষে রাজধানী বেহার আক্রমণ করিলেন এবং রামনারায়ণ দেওয়ান দেওয়ের বালক পুত্র বীজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিয়া তাঁহাকে চেচাখাতাতে লইয়া রাখিলেন। কিন্তু বালক, পর্ব্বত ও ঝোড়ার জল বায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া লোকান্তর গমন করিল। ভোটিয়ারা রাজ্যের নানা স্থানে কোট (দুর্গ) নির্ম্মাণ করিতে লাগিল; তন্মধ্যে গীতালদহ, বালাডাঙ্গা, মাওয়ামারী (যেখানে শাখাতির হাট হইয়াছে) ও নিজ বেহার রাজধানীতে কোট নির্ম্মাণ করিয়া, জিম্পে বৃহৎ সৈন্যদলসহ রাজধানীর কোটে বাস করিতে লাগিলেন। মরাঘাট ও লক্ষ্মীপুরেও এক২ কোট নির্ম্মিত হইল। এইরূপ বেহার রাজ্য চতুর্দ্দিকে দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইল।

জিম্পের সৈন্যদলের মধ্যে ভোটান্তের উত্তরাখণ্ডের কতকগুলি লোক ছিল, তাহাদের উচ্চতা সাধারণ লোকের দেড়গুণ। তাহারা অতিশয় গৌরবর্ণ ছিল। তাহাদের ভাষা দক্ষিণাঞ্চলের ভোটিয়ারাই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের ব্যবহার পশুবৎ ছিল, সর্ব্বদা মদ্য মাংস এমন কি নরমাংস ভোজন করিত। জিম্পে ইহাদিগকে ভক্ষ্য সামগ্রী প্রদান করিবার জন্য এতদ্দেশীয় কতকগুলি স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ ধরিয়া আনিয়া, ছাগল,

ভেড়া প্রভৃতির ন্যায় রাখিতেন। অন্য কোন পশু না পাইলে প্রয়োজনমত প্রত্যহ মানুষ কাটিয়া তাহাদিগকে মাংস পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

রাজবাড়ীর রঙ্গমন্দিরে জিম্পে তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত করিলেন। রাজবাড়ীতে গমনাগমনের জন্য তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এক পথ উন্মুক্ত রাখিয়া রাজপথে এবং রাজবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে ভোটিয়ারা 'বিষ পাঞ্জিজি' পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। 'বিষ পাঞ্জিজি' এক অদ্ভুত জিনিষ। চারি কি ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ বাঁশের টুকরার অগ্রভাগ কণ্টকের ন্যায় তীক্ষ্ণ করিয়া তাহার উপর বিষ মাখাইয়া উর্দ্ধমুখে ঐ গুলি এরূপভাবে উহারা রোপণ করিয়া রাখিত যে, দৈবক্রমে যদি কাহারও পায়ে উহা বিদ্ধ হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত। ইহার কোন ঔষধ নাই। ইহাকেই 'বিষ পাঞ্জিজি' বলে। রাজবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্ব হইতেই অনেক বৃহৎ শিমূল ও অন্যান্য বৃক্ষ ছিল। ভোটিয়ারা ঐ সকল বৃক্ষের মধ্যে২ কাষ্ঠ পুঁতিয়া, বাঁশদ্বারা চতুর্দ্দিকে গড়বন্দী করিয়া ফেলিল। এইরূপে ভোটিয়ারা রাজ্য তাহাদের আয়ত্তাধীন করিল। রাজ্যের মধ্যে কেবল জেলা রহিমগঞ্জে, মহারাজের কতকগুলি বরকন্দাজ সহিত রূপন সিংহ জমাদার থাকিয়া ঐ স্থান মহারাজের অধীনে রাখিয়াছিল। সেই স্থান হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহা হইতে সৈন্যদের বেতনাদি দিয়া রূপন সিংহ অবশিষ্ট অর্থ মহারাণীর নিকট পাঠাইয়া দিত। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিজ বেহারের সম্পূর্ণই ভোটিয়া কর্ত্তৃক অবিকৃত হইল। খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীর দেও, গোসাঞী ও খাসনবীস অন্যের সাহায্য ভিন্ন ভোটিয়াদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। পূর্ব্ব সংগৃহীত সৈন্য মধ্যে গত যুদ্ধে অনেক বিনষ্ট হইয়াছিল, কতক২ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল। তখন সুবে বাঙ্গলা শ্রীশ্রীকোম্পানী বাহাদুরের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কোম্পানী বাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করাই সকলের অভিমত হইল। মহারাণীর আজ্ঞায় মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের পত্র লইয়া কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীস দিনাজপুর গেলেন এবং তথাকার কোম্পানীর কার্য্যকারক হারুস সাহেবকে (Mr. Harris) ঐ পত্র দিলেন। পত্রে এই প্রার্থনা করা হইয়াছিল যে মহারাজ কোম্পানীকে একলক্ষ টাকা দিবেন এবং কোম্পানী বাহাদুর ফৌজদ্বারা ভোটিয়া দিগকে নির্য্যাতন করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিবেন। হারুস সাহেব খাসনবীসকে সম্মান ও মর্যাদা দেখাইয়া, মহারাজের পত্র সদরের সর্ব্বাধিপতি লর্ড হেষ্টিংসের সমীপে ইংরেজি ভাষায় ভাবান্তর করিয়া প্রেরণ করিলেন। সদর কাউন্সিলে এই বিষয় বিবেচিত হইয়া সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে আজ্ঞা পত্র আসিল যে, 'কোম্পানী বাহাদুর কাহারও চাকুরি করেন না। যদি মহারাজ আপন রাজ্যের রাজস্বের লাটবন্দী করিয়া নিরূপিত কর সন২ দেন, তাহা হইলে কোম্পানী রাজ্য শত্রুমুক্ত করিয়া মহারাজকে দিবেন এবং সর্ব্বদা রাজ্য রক্ষা করিবেন।'

কাশীনাথ লাহিড়ী অতি দ্রুত এই সংবাদ বেহারে লিখিয়া পাঠাইলেন। তখন নাজীর দেও ও গোসাঞীজী মহারাণীর আজ্ঞা লইয়া দিনাজপুর গেলেন এবং উভয় পক্ষ মধ্যে চুক্তি পত্র লিখিত পঠিত হইয়া নাজীর দেও মহারাজের পক্ষে দস্তখত করিলেন। চুক্তি পত্রের দুই খণ্ড, দুই সরকারে থাকিল। উহাতে যে২ বিষয় লিখিত আছে তাহা এই উপাখ্যানে বিস্তারিত বর্ণিত করার কোন আবশ্যকতা নাই। ফলে রাজ্য কোম্পানী বাহাদুরের আশ্রিত হইল এবং মহারাজ নিরূপিত কর দিতে স্বীকৃত হইলেন।

তদনন্তর সদর হইতে মেস্তর পারলেঙ্গ সাহেব (Mr. Purling) সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া এক পল্টন সিপাহী ও চারটি কামান সহ রঙ্গপুর হইতে মোগলহাট পৌছিলেন। নাজীর দেও, গোসাঞী ও খাসনবীস সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সৈন্যদলের মধ্যে থাকিলেন। নাজীর দেওরের যে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল তাহা সজ্জিত করিয়া ভগবন্তনারায়ণ কুঙর যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। পারলিং সাহেব ভোটিয়া দিগকে সংবাদ দিলেন যে "আগামী কল্য দশ দণ্ড বেলার সময় আমি তোমাদের 'কোট' অধিকার করিব, তোমরা স্থানান্তরে যাইবে, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।" ভোটিয়ারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পর দিবস পারলিং সাহেব, অন্যান্য ক্যাপ্টেন ও লেফটেনাণ্ট সাহেব দিগের সহিত সসৈন্যে ধরলা নদী পার হইলেন। তাঁহাদিগের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই ভগবন্তনারায়ণ কুঙর গীতালদহের কোটে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় এবং কাল মাহাত্ম্যে ভগবন্তনারায়ণ কুঙরের প্রথম যুদ্ধেই কতক ভোট সৈন্য বিনষ্ট হইল ও অবশিষ্ট যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া বালাডাঙ্গার দুর্গে প্রবেশ করিল। ইহাতে সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া নাজীর দেও, গোসাঞী ও খাসনবীসকে আদেশ দিলেন যে, তাঁহার অনুভূতি ভিন্ন কেহ যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়।

সেই দিবস সাহেব অগ্রসর হইয়া দীনহাটার গড় পশ্চাতে রাখিয়া সৈন্য সহিত বিশ্রাম করিলেন। পর দিবস নাজীর দেও আদি সকলকে তথায় রাখিয়া সিপাহী কোম্পানীর পশ্চাতে এক শ্রেণীতে তোপ চতুষ্টয় রাখিয়া অগ্রসর হইয়া বালাডাঙ্গার কোটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ভোট সৈন্যগণ এককালে 'কিলিকিলি' শব্দ করিয়া সিপাহী শ্রেণীর দিকে ধাবমান হইয়া কেহ তীর কেহবা বন্দুক লইয়া নিকটবর্ত্তী হইল, কেহ২ অশ্বারোহণে ধাবিত হইয়া ভোট ছোরাদ্বারা সিপাহী দিগকে ছেদন করিতে উদ্যত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন সাহেব তাহাদিগকে ফয়েরের (Fire) আজ্ঞা না দিয়া দক্ষিণ মুখে দৌড়াইতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা একযোগে সকলে ধাবিত হইল। ভোট সৈন্য মনে করিল সিপাহীরা

পলায়ন করিল। তাহারাও তাহাদিগের পশ্চাৎ২ দৌড়াইতে লাগিল। যখন কোম্পানীর সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ তোপ গুলির দক্ষিণে এবং ভোট সৈন্যগণ তোপের উত্তরে গোলার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন ক্যাপ্টেন সাহেব একযোগে চারি তোপ 'ফায়ারের' আদেশ দিলেন। আজ্ঞার সঙ্গে২ তোপ 'ফায়ার' হইল। প্রবল বায়ুবেগে আন্দোলিত শুষ্ক বন মধ্যে অগ্নি প্রদান করিলে বনের যেরূপ অবস্থা হয়, তোপের গোলায় সেইরূপ শত২ ভোট সৈনিক বিনষ্ট হইল। অবশিষ্ট সৈন্যের কতক পলাইয়া ভেটাগুড়ির ছড়াতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কতক মানসাই নদী পার হইয়া মাওয়ামারীর কোটে প্রবেশ করিল। সাহেব বালাডাঙ্গার কোট আয়ত্ত করিয়া সে দিবস ঐ স্থানে থাকিলেন। পর দিবস নাজীর দেও, গোসাঞী ও খাসনবীসকে তথায় আনাইয়া, এক কোম্পানী সিপাহীকে নাজিরগঞ্জের পথে মানসাই নদী পার হইবার জন্য পাঠাইলেন। ভগবন্তনারায়ণকেও ঐ পথে সৈন্যসহ গমন করিতে আদেশ দিয়া তাঁহাকে দশ দণ্ড বেলার সময় মওয়ামারী কোটের পূর্ব্বভাগে উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। দুই কোম্পানী সিপাহী সহিত পারলিং সাহেব কাশীয়াবাড়ী ঘাটে মানসাই নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ভগবন্তনারায়ণ কুঙর পূর্ব্বদিক হইতে কোটের নিকট আসিয়া ভোটিয়াদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় পূর্ব্বদিক হইতে এক কোম্পানী ও পশ্চিমদিক হইতে দুই কোম্পানী সিপাহী অগ্রসর হইতেছে দেখিবা মাত্র, ভোটিয়াদের মধ্যে অর্দ্ধেক ভুরচুঙ্গমারীর পথে পেষ্টারঝাড়ে প্রবিষ্ট হইল, কতক বেহারের কোটে আসিল এবং কতক সৈন্য বিনষ্ট হইল। সাহেবেরা এই সময় কদাচিৎ 'ফায়ারের' আদেশ দিয়াছিলেন। প্রায়ই ভয় প্রদর্শন দ্বারাই শত্রুপক্ষ পলায়ন করিত।

ঐ দিবস অপরাহ্নকালে সাহেবেরা নিজ বেহারে উপস্থিত লইয়া দেবাই দিঘীর উত্তর দিকে ছাউনি করিলেন। দুই কোম্পানী সিপাহী রাজবাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে, এখন যেখানে দেওয়ান দেওতার বাড়ী অবস্থিত, সেই স্থানে থাকিল। অপর দুই কোম্পানী খাগড়াবাড়ীর উত্তরে ছাউনি করিল। ভোট সৈন্য রাজবাটীর কোটের মধ্যে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিল। রাত্রিকালে যে সকল সাহেবের চর বার্ত্তা জানিতে গিয়েছিল, তাহাদের মধ্যে তিনজন 'বিষ পাঞ্জিজ' বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অন্যান্য লোকে সংবাদ দিল যে, জিম্পে ভোট সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, "আমি পরাস্ত হইয়া যাইয়া দেবরাজকে মুখ দেখাইব না, যাহার প্রাণে ভয় থাকে সে পলায়ন করুক, আর যে প্রাণের ভয় রাখে না সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক ; প্রাণ যায় যাইবে কিন্তু লোকে চিরকাল সুখ্যাতি করিবে।" সেই রাত্রিতেই কোটের বায়ু কোন ভাঙ্গিয়া দুই হাজার ভোটিয়া সৈন্য পলাইয়া গেল। সিপাহীরা তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিল, কিন্তু সাহেবেরা প্রাণভয়ে পলায়নপর শত্রুকে বিনষ্ট করিবার আদেশ দেন নাই।

পর দিবস প্রাতে সাহেবরা অশ্বারোহণে কোটের তিন পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন পশ্চিম দিকে তোর্ষা নদী। 'বিষ পাঞ্জিজির' বৃত্তান্ত শুনিয়া, মজুর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা অনুমান একশত কদলী বৃক্ষ আনাইয়া তাহা মৃত্তিকার উপর দিয়া গড়াইয়া দিতে বলিলেন, তাহাতে সমস্ত 'বিষ পাঞ্জিজি' কদলী বৃক্ষে বিদ্ধ হইয়া উৎপাটিত হওয়ার পথ নিষ্কণ্টক হইল। পর দিবস প্রাতে সাহেবরা সৈন্যসহ পূর্ব্ব দ্বারে যাইয়া ঈশান কোণ দিয়া কয়েকজন সিপাহীকে কোটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহারা কিছু করিতে পারিল না। ভোটিয়ারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল। তখন তোপের গোলাদ্বারা দ্বার মুক্ত করিয়া সিপাহী সকল কোট মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘড়িখানার পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত হইলে, ভোটসৈন্যগণ অগ্নিতে যেরূপ পতঙ্গ বিনষ্ট হয়, ঐরূপ ভাবে দলে২ অগ্রসর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জিম্পে ইহা দর্শন করিয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার অনুরূপ উত্তরাখণ্ডের বিশ পঁচিশ জন ভোটিয়া সৈন্য সহিত, ইংরেজ সৈন্য মধ্যে এরূপ ভাবে আসিয়া প্রবেশ করিলেন যে, কেহ বুঝিতে পারিল না ইহারা বায়ুভরে আসিল অথবা শূন্য হইতে পতিত হইল। তাহাদের খর্ব্ব অস্ত্র লইয়া যুদ্ধের আশ্চর্য্য কৌশল আমি বর্ণনা করিতে অশক্ত। সিপাহীরা সঙ্গীন চালাইতে থাকিলে কদাচিৎ কাহারও গায়ে আঘাত লাগে, নতুবা বাম হস্ত দ্বারা বন্দুক টানিয়া ফেলিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তের ভোটছোরা দ্বারা সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপ অপূর্ব্ব বিক্রমে যুদ্ধ করিতে২ কেহ গুলিতে, কেহ সঙ্গীনের, কেহ কিরীচের আঘাতে ধরাশায়ী হইল। জিম্পে শরীরের বিংশতি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াও একদণ্ড পর্য্যন্ত দক্ষিণ হস্তে ভোটছোরা ঘুরাইতে লাগিলেন। ক্যাপ্টেন সাহেব নিকটে যাইয়া বলিলেন, 'তুমি যদি সম্মত হও, ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করি।' জিম্পে ইঙ্গিতে তাঁহাকে মদ্য পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সাহেব তৎক্ষণাৎ এক বোতল ব্রাণ্ডি সরাব আনাইয়া পান করিতে দিলেন। ব্রাণ্ডি পান করিয়াই জিম্পে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সাহেবরা সকলে একত্রিত হইয়া ঐ কয়েকজন ভোটিয়ার হস্ত, পদ, নাসিকা ও পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীরের মাপ মিলিয়া রাখিলেন। এরূপ উচ্চ ও বলিষ্ঠ মনুষ্য সচরাচর দেখা যায় না। অবশেষে ভোটিয়াদের মধ্যে কিয়দংশ পালন করিল, কতক তোর্ষা নদীতে ডুবিয়া মরিল ও অনুমান শতাবধি বা একশত পঁচিশ জন ধৃত হইল। ভোটিয়াদিগের রাজবাড়ীর কোটে যে সকল অস্ত্রাদি ও ধনরত্ন ছিল সিপাহীরা তাহা লুঠ করিল। সাহেবরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহারাজের নিশান ও কোম্পানীর নিশান উত্তোলন করিলেন এবং জয় ঢাক প্রভৃতিতে জয়বাদ্য বাজাইতে আদেশ দিলেন। নাজীর দেও, গোসাঞী, খাসনবীস প্রভৃতি সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজমাতা মহারাণী আদি সহিত মহারাজকে আনবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। তৃতীয় দিবসে তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত

হইলেন, কিন্তু রাজবাড়ীতে অনেক মৃতদেহ তখনও পড়িয়া থাকায় তথায় না থাকিয়া এখন যেখানে দেওয়ান দেওয়ের বাড়ী সেইস্থানে কতকগুলি ঘর উঠাইয়া অবস্থান করিলেন। রাজবাড়ী পরিষ্কৃত ও অভিষিক্ত হইতে লাগিল। সাহেবদের সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হইল এবং নানারূপ সমাদর ও আপ্যায়ন হইল। পারলিং সাহেব পাঁচ দিবস বেহারে থাকিয়া ষষ্ঠ দিবসে দুই কোম্পানী সিপাহী একজন ক্যাপ্টেন ও একজন লেপ্টেনাণ্ট মহারাজের রক্ষার্থে বেহারে রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্য, নাজীর দেও, গোসাঞী ও খাসনবীস সহ উত্তর অঞ্চলে অগ্রসর হইলেন। এক কোম্পানী সিপাহী জল্পেশ্বর অঞ্চলে প্রেরিত হইল। ফলে, যেখানে২ ভোটিয়াদের কোট ছিল তাহা পারত্যাগ করিয়া ভোটিয়ারা পর্ব্বতের উপরে চলিয়া গেল, আর কোনস্থানে যুদ্ধ হইল না। সাহেব সৈন্য সহিত তৃতীয় দিবসে বাক্সাদুয়ারে উপস্থিত হইয়া ভোটিয়াদের 'মাচাঙ্গ' আদি জ্বালাইয়া দিলেন। যাহারা রক্ষক ছিল তাহারা পূর্ব্বেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। এক কোম্পানী সিপাহী তথায় রাখিয়া সাহেব চেচাখাতায় আসিয়া থাকিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশতি অধ্যায়

২৬৩ রাজশকে (১৬৯৪ শকাব্দে ১১৭৯ বঙ্গাব্দে ও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) রাজ্য কোচবিহার কোম্পানী বাহাদুরের আশ্রিত হইল এবং ভোটিয়ারা নির্য্যাতিত হইল। পারলিং সাহেব চেচাখাতায় আসিয়া গভর্ণরের কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলেন যে 'যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ভোটিয়ারা বেহার পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছে ও রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। যদি পর্ব্বত অধিকার করিতে হয়, তাহা হইলে আরও অনেক সৈন্যের আবশ্যক।' কাউন্সিল হইতে উত্তর আসিল যে 'কোম্পানী বাহাদুরের ভোটান দেশ আক্রমণের ইচ্ছা নাই। যদি বেহারের মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে ও তাঁহার ভ্রাতা সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেওকে ভোটিয়ারা মুক্তি দেয় এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহার যে পর্য্যন্ত অধিকার ছিল, তাহা স্থির রাখিতে সম্মত হয়, এবং ভবিষ্যতে কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত না করে তাহা হইলে দেবরাজের সহিত সন্ধি হইতে পারে।' ভোটিয়ারা এই উত্তর আসিবার পূর্ব্ব হইতেই সন্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। দেবরাজ এই সংবাদ পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। একজন 'জিনকাপ' (পদস্থ কর্ম্মচারী) আসিয়া অল্প কথাবার্ত্তার পর কোম্পানী বাহাদুরের সহিত এক সন্ধি পত্র সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আটটি টাঙ্গন ঘোড়া, কুচিন, দেবাঙ্গ আদি নানা প্রকার বস্ত্র ও অন্যান্য উত্তম উত্তম সামগ্রী লৌকিকতা

প্রদান করিয়া দেওয়ান দেও ও অন্যান্য লোক সহিত বাক্সাদুয়ারের পথে চেচাখাতে তাঁহাদিগকে পৌছাইয়া দিলেন।

নাজীর দেও প্রভৃতি মহারাজের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মহারাজকে নজর প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ নাজীর দেওকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা নাজীর, রাজ্য কেন কোম্পানীতে দিলে ? ঈশ্বরদত্ত গজ সিকার (স্বাধীন) রাজত্ব। অন্যকে রাজকর দিলে তাহাকে ছত্রধারী রাজা কি প্রকারে বলা যায় ?" নাজীর দেও উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনাকে রাজ্য সহিত শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করার জন্য, কোম্পানীকে কর প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছি।" শুনিয়া মহারাজ কহিলেন, "আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে। বিশ্বসিংহের বংশধরের একজনের পরিবর্ত্তে না হয় অন্য একজন রাজা হইত। 'স্বয়ং সিদ্ধ' রাজা ছিলাম, এখন অন্যের অধীনতা কি প্রকারে স্বীকার করিব ?" এই বলিয়া মহারাজ নিস্তব্ধ হইলেন। ইহার পর কত লোক কত কথা জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু মহারাজ আর কোন উত্তর দিলেন না।

অতঃপর মহারাজ সৈন্যসহ নিজ বেহারে আসিলেন। নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ হইল। গোসাঞী খাসনবীস সকলেই মহারাজের ক্ষৌর কার্য্য করাইয়া রাজাসনে বসাইয়া রাজা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু মহারাজ সম্মত হইলেন না, কেবল বলিলেন, "বাবা ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছে, সেই রাজত্ব করুক।" এই বলিয়া স্থান বিশেষে অবস্থান করিয়া ভগবতীর চিন্তায় কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কেবল মাত্র শচীনন্দন মুস্তফী, রাম ঠাকুর ও কালা পূজারী প্রভৃতি কয়েক জন লোকের সহিত কখনও২ আলাপ করিতেন।

পারলিং সাহেব এক কোম্পানী সিপাহী সহিত ক্যাপ্টেন সাহেবকে এখানে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া রঙ্গপুরে গেলেন। কিছুকাল পরে ২৬৪ রাজশকে (১১৮০ বঙ্গাব্দে ও ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় বেহারে আসিয়া রাজস্বের হস্তবুদ করিয়া তাহার ৭৩ অর্দ্ধেক কিঞ্চিৎ কম লক্ষ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহারাণীর আজ্ঞানুসারে রাজকার্য্য হইতে লাগিল। ঐ হস্তবুদের কাগজ অনুসারে, খাসনবীস এক হিসাব উপস্থিত করেন, তাহা হইতে দেখা গেল, রাজত্বের মোট ভূমি মধ্যে মহারাজের অধীনস্থ 'ভূমির' পরিমাণ পাঁচ আনা সাড়ে সতর গণ্ডা ; নাজীর দেওয়ের অধীনস্থ ভূমি ভাগ নয় আনা দশ বট এবং দেওয়ান দেওয়ের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ এক আনা। রাজকর্ম্মচারিগণ বিবেচনা করিলেন যে, সৈন্যের বেতন দেওয়ার জন্যই এত ভূমি নাজীর দেওকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে রাজ্য কোম্পানীর সাহায্য লাভ করায় সৈন্যের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং নাজীর দেও কি কারণে এত ভূমি তাঁহার অধিকারে রাখিবেন ? কিন্তু নাজীর দেও এরূপ প্রতাপান্বিত ছিলেন যে, কেহ

তাঁহাকে সাহস করিয়া এই কথা বলিতে পারিল না। 'মহারাণীর আজ্ঞা' এইরূপ প্রকাশ করিয়া নাজীরাণের কোন২ স্থান তাঁহার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। নাজীর দেও পরম্পর এই সংবাদ অবগত হইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "বালক রাজাকে আমি রাজা করিয়াছি, রাজকার্য্য আমার আজ্ঞায় হইবে; সর্ব্বানন্দ গোসাঞী রাজগুরু, তাহার রাজ কার্য্যে কি অধিকার আছে?" ফলে দিন২ উভয় পক্ষ মধ্যে মনান্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নাজীর দেওয়ের দেওয়ান রামচন্দ্র রায়ের অল্প বয়স্ক পুত্র শ্যামচন্দ্র রায় ক্রমে ২ কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিলেন। কাশীনাথ লাহিড়ী রাজ্যের তিন তোকের রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানীর কর প্রদান করিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব প্রত্যেকের অংশ অনুসারে বিভাগ করিয়া দিতেন।

২৬৫ রাজশকের শেষ ভাগে জ্বরাদি রোগে মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ কৈলাসগামী হইলেন। মহারাণী নিতান্ত শোকার্ত্তা হইলেন। গোসাঞীজী ও খাসনবীস ধৈর্য্যেন্দ্র-নারায়ণকে পুনরায় রাজ সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া অভিষিক্ত করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে উনবিংশতি অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়

২৬৫ রাজশকের অন্তে (১১৮১ বঙ্গাব্দে ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় রাজা হইলেন কিন্তু রাজকার্য্য উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। যদি খাসনবীস নগদ মুদ্রা ও শাল প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র লইয়া সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানেই তাহা বিতরণের আজ্ঞা দিতেন, এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। রাজকার্য্য গোসাঞী ও খাসনবীস মহারাণীর আজ্ঞায় করিতেছিলেন। ক্রমশই গোসাঞী ও নাজীর দেওয়ের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গোসাঞীর বলরামপুর যাতায়াত বন্ধ হইল। এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে ২৬৭ রজশকে দিনাজপুরে লম্পট সাহেব (Mr. Lambert) আসিলেন, বলরাম বাবু তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। মহারাজ নাজীর দেও, গোসাঞী, খাসনবীস ও শ্যামচন্দ্র রায় সহিত যাইয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব মহারাজের পাল্কী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া বসাইলেন। তাহার পর নাজীর দেওয়ের সহিত শীকার সম্বন্ধে দুই তিনটি কথা বলিবার পর তাঁহাকে চতুর্থ কথা জিজ্ঞাসা করিতেই, নাজীর দেও সহসা ঘাড় ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আমরা এত ফাইক কথার মানশী নওঁা, অর্থাৎ আমরা এত বাজে কথার মানুষ নই।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাজীর দেও সাহেব কি বলিতেছেন?" খাসনবীস বলিলেন, "বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, নাজীর দেও

বাসায় যাইতে চাহেন।" সাহেব বলিলেন "আচ্ছা বেশ।" তাহার পর সকলে বিদায় লইয়া বেহারে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রঙ্গপুর, দিনাজপুর হইতে পৃথক হইয়া নূতন জেলায় পরিণত হইল এবং পারলিং সাহেব পুনরায় আসিলেন। বোদা, পাটগ্রাম, ও পূর্ব্বভাগ তিন চাকলার কাজ কর্ম্ম রামচন্দ্র রায় ও তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র শ্যামচন্দ্র রায় করিতেন এবং তাহার উপস্বত্ব প্রায় নিজেরাই আত্মসাৎ করিতেন। নাজীর দেওতাকে কিছু দিতেন, কখনও কিঞ্চিৎ মহারাজকে পাঠাইতেন। বোদার পূর্ব্ব কার্য্যকারক ফকিরচাঁদ, পাটগ্রামের দেবীপ্রসাদ ও পূর্ব্বভাগের কার্য্যকারক আলিমহম্মদ, ইহাদের 'চৌধুরী' উপাধি ছিল। যখন কার্য্যীরহাট প্রভৃতির কার্য্যকারকগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া আপনারা খোদ জমিদার হইলেন তখন ইহারা নিজেদের নাম লিখাইয়া খোদ জমিদার হইতে পারেন নাই। কিছু২ জমি 'নানকার' রাখিয়া সরকারের পক্ষেই চাকলাজাত শাসন করিতেছেলেন। ফকিরচাঁদ, দেবীপ্রসাদ ও আলীমহম্মদ নাজীর দেওয়ের বিরুদ্ধে পারলিং সাহেবের আদালতে নালিশ করিলেন। সাহেব বিচার করিয়া, হুকুম দিলেন যে, 'চাকলা মহারাজের সম্পত্তি, নাজীর দেও ও চৌধুরীদের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই।' কিন্তু শ্যামচন্দ্র রায় দরবারে উপযুক্ত তদ্বির করিয়া ঐ হুকুম প্রকাশিত হইতে দিলেন না এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থামত সব চালিতে লাগিল। এই সময়ে ব্রজ রায় সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সহিত সৃষ্টিধর ভাইয়া আসিয়াছিলেন। বেহার হইতে কোম্পানীর প্রাপ্য কর আদায় করিবার জন্য একজন 'সাজোয়াল' থাকিত। সৃষ্টিধর ভাইয়া ঐ কার্য্যে প্রথম বেহারে আসিয়াছিলেন।

নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের প্রভাব দিন২ বৃদ্ধি পাইতে লাগল। তিনি যদৃচ্ছ আচরণ করিতে লাগিলেন। নাজীর দেও মধ্যে২ বেহারে আসিতেন। একবার তিনি বেহারে আসিলে, দৈবাৎ তাঁহার পক্ষের লোকের সহিত রাজ পক্ষের লোকের একঘটি দধি লইয়া বচসা হইয়া উভয় পক্ষ মধ্যে মারামারি হয়। গোসাঞীজী ইহা শুনিয়া নাজীর দেওয়ের কয়েক জন লোক ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন। নাজীর দেও এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি যেরূপ প্রজ্জলিত হয়, সেইরূপ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গাসাঞীজীকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে এরূপ নিগৃহীত করিলন যে, প্রভুজীর আর উত্থান-শক্তি রহিল না। তৎপর নাজীর দেও গোসাঞীকে ছাড়িয়া দিয়া ঐ দিবসই বলরামপুর প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সময় মহারাজ রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি পূর্ব্বেই তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। ২৬৮ রাজশকে (১১৮৪ বঙ্গাব্দে) হঠাৎ এক দিবস মহারাজ তাঁহার নিকটস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, "আমি তীর্থযাত্রায় চলিলাম, আমার সঙ্গে যাহার২ যাইবার ইচ্ছা তাহারা আইস।" এই বলিয়া পদব্রজে মহারাজ যাত্রা করিলেন। কালা পূজারী

প্রভৃতি চারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং সাত আট জন ভৃত্য তাঁহার অনুগমন করিল। মহারাণী ইহা শ্রবণ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। গোসাঞী ও খাসনবীস শ্রবণ মাত্র উর্দ্ধশ্বাসে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার স্তুতিবাদ ও নীতিবাক্য বলিলেন কিন্তু মহারাজ কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। পরে হস্তী, ঘোটক, ডেরা তাম্বু প্রভৃতি সঙ্গে পাঠাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মহারাজ কিছুই সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তথাপি, অশ্ব, দোলা ও কয়েকজন অস্ত্রধারী লোক ও কিছু অর্থ পাঠান হইল। তাহারা কতক জ্ঞাতসারে কতক অজ্ঞাতসারে, মহারাজের অনুগমন করিতে লাগিল।

মহারাজ পদব্রজে গমন এবং বৃক্ষমূলে ব্যাঘ্র ও মৃগচর্ম্মোপরি শয়ন করিয়া ক্রমে দিনাজপুরে উপস্থিত হইলেন। দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ নানবিধ দ্রব্য সামগ্রী উপঢৌকন সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু মহারাজ কিছুই গ্রহণ করিলেন না। রাজা বিশেষ অনুরোধ করিলে মহারাজ ঐ সকল দ্রব্য দুঃখীদের বিতরণ করিয়া দিতে বলিলেন। ক্রমে মহারাজ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া গয়ায় গমন করিলেন। তথায় শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া গয়ালীকে ব্রহ্মত্র ভূমি ও প্রচুর নগদ অর্থ দক্ষিণা দিবার জন্য গোসাঞী ও খাসনবীসের নামে আজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিয়া বারাণসী ক্ষেত্রে গমন করিয়া নানাপ্রকার দান ও ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সকলে অগ্রসর হইয়া মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনয়ন করিলেন। তীর্থ দর্শনের ফলে মহারাজের অন্তঃকরণের মালিন্য অনেকাংশে দূরীভূত হইল।

কিছুদিন পরে সুরেন্দনারায়ন দেওয়ান দেওয়ের বিবাহ উপস্থিত হইল। সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইল। রঙ্গপুর হইতে গোসাঞীজী ও খাসনবীস আসিলেন। নাজীর দেও তাঁহার সমস্ত সৈন্যসহ স্বীয় শিবিরে আসিয়া অবস্থান করিলেন। বিবাহের সভা হইয়াছে, মহারাণী অন্তঃপুরের এক গৃহে বসিয়া বিবাহ দেখিতেছেন। পারলিং সাহেবের সময় হইতে কোম্পানীর তরফের কখনও এক কোম্পানী, কখনও চল্লিশ কখনও বা বিশ জন সিপাহী রাজধানীতে মহারাণীর আজ্ঞাবাহক রূপে থাকিত। বিবাহের সভায় গোসাঞীজী প্রভৃতি সকলেই বসিয়া আছেন, কিন্তু নাজীর দেওয়ের ভয়ে ত্রস্ত হইয়া গোসাঞী সিপাহীদিগকে বলিলেন, "মহারাণীর বিনা আজ্ঞায় নাজীর দেওকে অধিকলোক সহিত সভায় আসিতে দিবে না।" নাজীর দেও দুই তিন শত অস্ত্রধারী লোকসহ অন্তঃপুরে বিবাহ সভায় প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হইলে সিপাহীরা নিষেধ করিল। ইহাতে নাজীর দেও ক্রুদ্ধ হইয়া সভায় প্রবেশ না করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কতকগুলি লোককে হুকুম দিলেন "গোসাঞী, এই কুমন্ত্রণার হেতু তাহাকে বাঁধিয়া আন।" তাঁহার আজ্ঞানুসারে লোকগুলি এক সঙ্গে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া রজ্জু দ্বারা প্রভুজীর চরণদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তন্মধ্য দিয়া একটি বংশ দণ্ড প্রবেশ করাইয়া যেরূপে লোক মৃত দেহ বহন করিয়া লয় সেইভাবে লইয়া যাইতে লাগিল। সভাস্থ অন্যান্য লোক ঐ দৃশ্য দর্শনে পলায়ন করিল। মহারাজ বিবাহ সভায় আসেন নাই। তিনি সেই সময় একটি উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তিনি মুক্ত তরবারি হস্তে মহাবেগে চৌরাস্তায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন গোসাঞীকে লোকগুলি টানিয়া সেই স্থান পর্য্যন্ত আনিয়াছে। মহারাজাকে দেখিবামাত্র তাহারা গোসাঞীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মহারাজ গোসাঞীর পায়ের বন্ধন ছেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, গোসাঞীজীও তাঁহার পশ্চাৎ২ আপন গৃহে ফিরিলেন। নাজীর দেও তৎক্ষণাৎ বলরামপুর গমন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে বিংশতি অধ্যায় ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়

অতঃপর যাহা হইল শ্রবণ করুন। কয়েকটি রাজকুমারী জন্মগ্রহণ করিলেও মহারাজের পুত্র সন্তান না হওয়ায় সকলেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত ছিলেন। নাজীর দেও কখন রাজ্য হরণ করেন, তাহা চিন্তা করিয়া সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। ২১০ রাজশকে (১৭০২ শকাব্দে ও ১১৮৬ বঙ্গাব্দে) ফাল্গুন মাসে শুভলগ্নে, ষোল কলায় সম্পূর্ণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, সর্ব্বসুলক্ষণ বিশিষ্ট রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। যেমন সূর্য্যবংশ রামচন্দ্রের ও চন্দ্রবংশ বাসুদেবের জন্মে পবিত্র হইয়াছিল, সেইরূপ এই রাজকুমার জন্ম হওয়ায় বিশ্বসিংহের বংশ উজ্জল হইল। মহারাজ পরম আহ্লাদিত হইয়া পুত্রমুখ অবলোকন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া দান বিতরণ করিবার আদেশ দিলেন। মহারাণী ও অন্যান্য রাজ দারাগণ এই পুত্র লাভে সকলেই নিজেকে পুত্রবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার নৃত্য, গীত, বাদ্য ও তোপ ধ্বনি হইতে লাগিল। সপ্তম দিবসে পণ্ডিতগণ ও জ্যোতির্ব্বেত্তারা একত্রিত হইয়া লগ্ন বিচার করিয়া দেখিলেন যে, রাজকুমার দীর্ঘায়ু হইয়া বহুকাল রাজত্ব করিবেন, ইঁহার শত্রু সকল সমূলে বিনষ্ট হইবে,, ইনি হরতুল্য জ্ঞানী, ইন্দ্রতুল্য রাজা ও নারায়ণ তুল্য দয়াশীল হইবেন। এই জন্য ইঁহার নাম শ্রীশ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ হইল। কেহ বলিল বিশ্বসিংহ, কেহ বলিল নরনারায়ণ পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলি 'যোগিনী তন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে কৈলাসের পারিষদ সকলে বিশ্বসিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্য ভোগ করিবেন। এরূপ দানী, মহা মানী, প্রতাপান্বিত, সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত ও মহাজ্ঞানী ইনি স্বয়ং বীরভদ্র।'

রাজকুমার দিন২ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যথাকালে গোসাঞী ও খাসনবীস রঙ্গপুর হইতে আসিয়া রাজকুমারের শুভ অন্নারম্ভাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তথন

রঙ্গপুর জেলায় গুটল্যাড (Mr. Goodlad) সাহেব আসিয়াছেন। শ্যামচন্দ্র রায় সাহেবের অত্যন্ত অনুগ্রহভাজন হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে 'রাজা রাজকার্য্য করেন না, নাজীর দেওই সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তা।' ১১৮৭ সালে শ্যামচন্দ্র রায় নাজীর দেও সহিত বেহারে আসিয়া গোসাঞী ও খাসনবীসকে পূর্ব্ব আদায়ী রাজস্বের জমা খরচাদি হিসাব বুঝাইয়া দিতে বলিলেন এবং প্রত্যহ তাঁহাদের নিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাধ্যানুগত ও ঘনিষ্ঠ যে সকল লোক ছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কাহাকেও বেড়ি কাহাকেও দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নানা প্রকার লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। কালশরণ লাহিড়ী ও জীবনকৃষ্ণ লাহিড়ীকে মহারাণী অন্তঃপুরে রাখিয়া ছিলেন। দুই দিবস পর তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য যান আরোহণ করিয়া অন্দরের দুই জন করিয়া বাঁদী সঙ্গে লইয়া বেহারের সীমা অতিক্রম করিয়া রঙ্গপুর উপস্থিত হইলেন। গোসাঞী ও খাসনবীসের পায়ে লৌহশৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে নানারূপ ক্লেশ দিতে লাগিলেন। ইহাঁদের পক্ষের উকিল সর্ব্বদা সাহেবের নিকট অভিযোগ করিলেও সাহেব তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। গোসাঞী ও খাসনবীসকে রঙ্গপুরে লইয়া আসিতে বলিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে রাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক উকিল এক দিবস সাহেবের পায়ের উপর পড়িয়া কান্দিয়া বলিলেন, "গোসাঞী ও খাসনবীস এখন পর্য্যন্ত প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কিনা সন্দেহ।" তখন সাহেব তাঁহাদিগকে বেহার হইতে লইয়া যাইবার জন্য আটজন সিপাহী পাঠাইলেন। সিপাহীরা দুইজনকে লইয়া মোগলহাট পৌছিয়াছিল, এমন সময় শ্যামচন্দ্র রায় রঙ্গপুর যাইয়া সাহেবকে বলিয়া সিপাহী ফিরাইয়া লইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। গোসাঞীজী হাওলদারকে সহস্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়া ঐ রাত্রিতে বেড়ি সমেত রঙ্গপুরে পৌছিলেন। তখন কৃষ্ণপ্রসাদ—যাঁহাকে লোকে 'দাতারাম' বলিত—সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার চক্রান্তে গোসাঞী ও খাসনবীস খালাশ পাইলেন না, তাঁহাদিগকে আরও কিছু দিন কয়েদ থাকিতে হইল। খাসনবীসের অভিসম্পাতে "দাতারাম" অষ্টাহ মধ্যেই প্রায় সবংশে বিনষ্ট হইলেন। ইহার পর সাহেব গোসাঞী ও খাসনবীসকে খালাশ দিলেন।

নাজীর দেওয়ের আজ্ঞায় শ্যামচন্দ্র রায় রাজত্বে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতে ছিলেন। রাজ্যের অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতে লাগিল। নীলগোবিন্দ লাহিড়ীকে এরূপ প্রহার করিয়াছিল যে, চিরকালের জন্য তাহার পৃষ্ঠদেশ বক্র হইয়া রহিল। ধর্ম্মনারায়াণ রায় ও ধর্ম্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কেও অত্যন্ত প্রহার করিয়াছিল। নাজীর দেওয়ের ভয়ে সকলের হৃদকম্প হইত। গোসাঞী ও খাসনবীস সাহেবের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা হরিপ্রসাদ সরকার ও জানকী রাম সরকারকে উকিল নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় গভর্ণর জেনারেল

বাহাদুরের নিকট পত্রসহ প্রেরণ করিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে গুডল্যাড্ সাহেবের পত্র কলিকাতায় প্রেরিত হওয়ায় উকিলদিগের নিবেদন গ্রাহ্য হইল না।

এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতীত হইলে ২৭৪ রাজশকে (১১৯০ বঙ্গাব্দে) মহারাজ পীড়িত হইলেন এবং উত্তরোত্তর তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কবিরাজগণ মহারাজের ব্যাধির কোন প্রকার উপশম করিতে পারিলেন না। অগ্রহায়ণ মাসের যে দিবস তিনি পরলোক গমন করিবেন, সেই দিবস অপরাহ্ন কালে আজ্ঞা দিলেন "শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরকে আমার সম্মুখে আনিয়া বার দেও এবং শ্রীশ্রীমান রাজপুত্রকে আনিয়া আমাকে দেখাও।" নিকটস্থ লোকেরা তৎক্ষণাৎ ঠাকুর আনিয়া বার দিল ও রাজপুত্রকে আনিল। মহারাজ তখন এক আজ্ঞা পত্র—যাহাকে 'উছিয়তনামা' বলে—লিখিতে আদেশ দিলেন। সংক্ষেপে তাহা এই "আমার আসন্নকাল উপস্থিত, আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিলে বাবা শ্রীশ্রীমান হরেন্দ্রনারায়ণ রাজপুত্র নিজ বেহার ও চাকলাজাতের রাজা হইবেন। সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান কুঙর আমার নিতান্ত অনুগৃহীত, তিনি পূর্ব্ববৎ নিযুক্ত থাকিবেন। বাবা রাজা রাজকার্য্যের যোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত মহারাণী কামতেশ্বরী রাজকার্য্য করিবেন।" 'উছিয়ত নামায়' সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেও, বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুঙর আদি অনেকেই সাক্ষস্বরূপে দস্তখত ও স্ব২ মোহরাঙ্কিত করিলেন। মহারাজ সজ্ঞানে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে ২ অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য স্থান কৈলাসধামে গমন করিলেন। রাজদারা ও পুরবাসিগণ সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে নরখণ্ডে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১ ॥ শ্রীমুন্শী জয়নাথ ঘোষস্য রাজোপাখ্যানে নরখণ্ড সমাপ্ত হইল। ইহার পর প্রত্যক্ষ খণ্ড নিবেদন করিতেছি।

প্রত্যক্ষ খণ্ড

প্রত্যক্ষ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

২৭৪ রাজশকে (১১৯০ বঙ্গাব্দে, ১৭০৫ শকাব্দে ১১৯৯ হিজরী ও ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ অনিত্য দেহ পরিত্যাগ করিলেন। শ্যামচন্দ্র রায়ের চেষ্টায়, গোটলেট সাহেব (Mr. Goodlad) গোসাঞী ও খাসনবীসকে রংপুরে কয়েদ রাখিয়া ছিলেন। বেহারে শচীনন্দন মুস্তফী, শিবপ্রসাদ মুস্তফী, রূপচন্দ্র বড় কাহেত কার্য্যী, বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সী, জয়গোবিন্দ লাহিড়ী, ধর্ম্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথ বক্সী ও কৃষ্ণনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর প্রভৃতি রাজ্যের কার্য্যকারকগণ, সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, নাজীর দেও সর্ব্বদা রাজ্যাভিলাষী, এখন শুনা যাইতেছে যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে আনিয়া তাহাকে রাজা করিবেন, তিনি যে রাজ পুত্রকে রাজা করিবেন তাহা বিশ্বাস হয় না। কোম্পানী বাহাদুর সরকারের প্রেরিত দ্বাদশ জন সিপাহী সহিত, হাওয়ালদার জিতন সিংহ মহারাণীর আজ্ঞাবাহক ছিল। মহারাণীর দ্বারা তাহাকে আজ্ঞা দেওয়াইলেন যে, দণ্ড ও ছত্র রক্ষার জন্য সে যেন সিপাহী নিযুক্ত করে ও অন্তঃপুরের দ্বারে সিপাহী মোতায়েন করে এবং মহারাণীর আজ্ঞা ব্যতীত, দণ্ড ও ছত্র কাহাকেও প্রদান না করে বা অন্তঃপুর মধ্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেয়। অভিষেক সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। নাজীর দেওয়ের নিকট পূর্ব্বেই রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি চারি পাঁচ সহস্র সৈন্য সহ আপন পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে সঙ্গে লইয়া, রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ডঙ্কার শব্দ শুনিবা মাত্র, উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বেশী দূরে গেলেন না।

নাজীর দেও রাজবাটীতে আসিয়া সকল চক্রান্ত অবগত হইয়া, নিজ পুত্রকে রাজা করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও খেলারাম জমিদারিরা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন অভিষেকের সকল অনুষ্ঠান প্রস্তুত হইয়াছে কি না। তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত প্রস্তুত আছে অবগত হইয়া, রাজপুত্রকে আনিবার জন্য নিজে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্বার রক্ষক সিপাহীরা বলিল, "মহারাণীর বিনা আজ্ঞায় অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ।" তখন নাজীর দেও বলিলেন, "মৃত মহারাজ আমার পিতৃব্য, মহারাণী আমার পিতৃব্য পত্নী, রাজ অন্দর ও আমার অন্দর এক, তাহার দ্বারে কোম্পানীর সিপাহী নিযুক্ত করিয়া আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা কেবল দুষ্ট লোকের চক্রান্ত মাত্র। যাহা হউক আমি অন্তঃপুরেও যাইব না, কাহাকে রাজাও করিব না"। এই বলিয়া

ডঙ্কা দিয়া তৎক্ষণাৎ বলরামপুর রওনা হইলেন। যাইবার সময় রাজার ভৃত্যদের মধ্যে যাহাকে২ পাইলেন বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। মহারাণী এইরূপ বিপদে অভিভূত হইয়া কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কর্ম্মচারিগণ পুনরায় একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। দেব আই সত্যভামা, অর্থাৎ মৃত রাজার মাতা শোকাকুলচিত্তে, রাজ্য রক্ষার উপায় না দেখিয়া, নিজে যান আরোহণ করিয়া বলরামপুর গমন করিয়া নাজীর দেওকে নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া, পর দিবস সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বাজপক্ষী পতিত হইলে, অন্যান্য পক্ষী যেমন একযোগে উড্ডীয়মান হয়, সেইরূপ নাজীর দেওয়ের ডঙ্কা ধ্বনি শ্রবণ মাত্রই, উল্লিখিত রাজকর্ম্মচারী সকল স্থানে২ যাইয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। নাজীর দেও বারবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া মহারাণীকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন। মহারাণী রাজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কপট নাজীর দেওয়ের অন্তঃকরণে যাহাই থাকুক, শিষ্টাচারানুরোধে এই চারিটি সান্ত্বনা বাক্য মহারাণীকে বলিলেন। কহিলেন, "রাজপুত্রকে রাজা কর।" নাজীর বলিলেন, "যে আজ্ঞা, রাজপুত্রকে আমার ক্রোড়ে দেন।" মহারাণী ভাবিলেন, 'মত্তহস্তীকে সিংহ শাবক অর্পণ করিতে যাইতেছি। নাজীর দেও নিজে রাজ্যাভিলাষী, পুত্রকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। শিশু রাজপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া এখনই স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে।' অথচ কুমারকে নাজীরের হস্তে না দিলেও রাজপুত্র রাজা হইতে পারেন না, মৃত রাজার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াও সম্পন্ন হয় না। মহারাণী কিন্তু ইহা বিবেচনা করিলেন না যে, অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত সিংহশিশুও করিমস্তক বিদীর্ণ করিতে সমর্থ এবং স্বয়ং দশভূজা ভগবতী যে রাজপুত্রকে দশ হস্তে রক্ষা করিতেছেন তাহাকে বিনষ্ট করে কাহার সাধ্য? অতঃপর ধর্ম্মের নাম করিয়া মহারাণী রাজপুত্রকে নাজীরের ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া, দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে২ আসিলেন এবং দ্বারদেশে
৫। অবস্থিত হাওয়ালদার জিতন সিংহকে দ্বাদশ জন সিপাহী সহিত রাজপুত্রকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন।

নাজীর দেও রাজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, রঙ্গমন্দিরে যে স্থানে রাজাসন প্রস্তুত ছিল, সেখানে রাত্রি চারি দণ্ডের সময় আসিয়া উপবেশন করিলেন। রঙ্গমন্দিরে নাজীর দেওয়ের সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিল। তথায় কেবল কোম্পানীর সিপাহী কয়েক জন ভিন্ন, অন্য কোন লোক প্রবেশ করিতে পারিল না। পূর্ব্ব বর্ণিত রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে কেহ২ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া খিদমদ্গারদের মধ্যে, কেহ সিপাহীদিগের পশ্চাতে, কেহ বা বাহিরে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেও, বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুঙর, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও পুরোহিত আদি সকলে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের নামে মোহর অঙ্কিত হইল এবং প্রচলিত নিয়মমত

টাঁকশালের দারোগা রঘুনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর মহারাজের নামের মুদ্রাঙ্কণের ছাপ নির্ম্মাণ করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিলেন। তখন নাজীর দেও সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্রকে আমি রাজা করিতেছি কিন্তু আমার একটি কথা আছে। আমি আমার পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিবার নিমিত্ত সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না, তাহাকে আমি যুবরাজ করিতে চাহি।" সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল যে, রাজপুত্রকে এক্ষণে রাজা করিয়া পরে সুযোগ মত তাঁহাকে হত্যা করিয়া, নিজ পুত্রকে রাজা করাই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এই সময় জিতন সিংহের ইঙ্গিতে, সিপাহীরা বন্দুকে টোটা পুরিয়া, রাজপুত্র সহিত নাজীর দেও যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে 'ফাইল' করিয়া দাঁড়াইল। আর কেহ কোন কথা বলিল না কেবল বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুঙর বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা যুক্তি সঙ্গত যদি অনুগ্রহ করেন তবে আমাকে দেওয়ানি মনসবটি দিতে পারেন।" নাজীর দেও কোন উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বাপর এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, অভিষেকের পর "চাক বালিশ" অর্থাৎ রাজাসনে রাজা উপবেশন করেন এবং নাজীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছত্র ও দণ্ড ধারণ করেন এবং টাঁকশালের প্রথম টাকা দিয়া নজর দেন, কিন্তু মহারাজ রাজা হইবার সময় নাজীর দেও দণ্ড ও ছত্র আনাইয়া নিজে 'চাক বালিশে' উপবিষ্ট হইয়া, মহারাজকে অভিষেকান্তে বাম জানুর উপর বসাইয়া আপন পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণকে দক্ষিণ জানুর উপর বসাইলেন। ইহাতে মনে হইল, যেন মেঘমণ্ডল মধ্য হইতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মহারাজ উদিত হইতেছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বীরেন্দ্রনারায়ণ রাহুর ন্যায় বিরাজ করিতেছে; কিংবা রাজহংসের সহিত কাক উপবেসন করিয়া আছে। নাজীর দেও ঐ স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াই একবার ছত্র হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং টাঁকশালের নূতন টাকা দক্ষিণ হস্তে লইয়া মহারাজকে দেখাইয়াই, নজর দেওয়া ও ছত্র ধারণ করার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। অন্যান্য যাবতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকল বাহির হইতে বেদধ্বনি করিলেন। বাদ্যোদ্যম ও নহবৎখানাতে নহবৎ বাজাইবার আদেশ হইল। বন্দুক ও তোপধ্বনি হইল। পূর্ব্ব প্রচলিত রীতি অনুসারে, দেবীদত্ত ওয়াকানবীস কর্ত্তা কুঙরদিগের নামে মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ওয়াকা অর্থাৎ আজ্ঞাপত্র লিখিলেন। তখন নাজীর দেও ওয়াকানবীসকে আদেশ দিলেন যে, "আমার পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ কুঙরের নামের পূর্ব্বে দুই শ্রী লিখিয়া যুবরাজ ওয়াকা লিখ।" ওয়াকানবীস সামান্য ব্যক্তি, তাহার কি সাধ্য যে ইতস্ততঃ করে? সে তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল। নাজীর দেও প্রথমে মহারাজের হস্তে মোহর স্পর্শ করাইয়া নিজ হস্তে ওয়াকা দুই খানির উপর মোহর করিয়া, রাজ মোহর নিজের পকেটে রাখিলেন। তখন রূপচন্দ্র বড় কাহেত কার্য্যী ওয়াকায় 'সাক্ষাৎ হুকুম প্রমাণ' লিখিতেন এবং মুস্তফী 'সন তারিখ' লিখিতেন,

তাঁহারা উভয়েই প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকায়, উহা লিখা হইল না। নাজীর দেও যুবরাজী ওয়াকা আপন কটিদেশে রাখিলেন।

তখন রাজপক্ষের ব্যক্তিরা জিতন সিংহ হাওয়ালদারকে বলিলেন, "মহারাজের মোহর নাজীর দেও নিজ হস্তগত করিয়া, তদ্বারা আপন পুত্রের নামে যুবরাজী ওয়াকা মোহর করিয়া লইল। যদি ইহার পরও নাজীরের নিকট মোহর থাকে তাহা হইলে সে যে কি সর্ব্বনাশ করিবে বলা যায় না। যেরূপেই হউক, তুমি মোহর তাঁহার নিকট হইতে লইয়া কোম্পানীর সরকারে জিম্বা রাখ, পরে সাহেবরা যেরূপ হুকুম দেন সেইরূপ হইবে।" জিতন সিংহ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে নাজীরের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল যে "মোহর কোম্পানীর জিম্বায় থাকিবে, উহা আমার নিকট দিতে আজ্ঞা হয়।" নাজীর দেও প্রথমে তাহার কথায় মনোযোগ করিলেন না। খেলারাম কার্য্যী ও আঠারপালা খেদমতগারের অধ্যক্ষ জীবনাথ বড় কাহেত সর্ব্বদা মহারাজকে ক্রোড়ে লইত। তাহারা দুই জনেই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। নাজীর দেও মহারাজকে খেলারাম কার্য্যীর ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, "অন্তপুরে লইয়া যাও।" তাহারা দুই জন মহারাজকে লইয়া রঙ্গমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পাটআঙ্গিনায় গিয়াছে এবং মহারাজের কার্য্যকারকদিগের মধ্যে যাঁহারা লুক্কায়িত ছিলেন, তাঁহারাও বাহির হইয়াছেন, এমন সময় জিতন সিংহ পুনরায় নাজীর দেওয়ের নিকট উক্ত মোহর ফেরৎ পাইবার প্রার্থনা করিল। নাজীর দেও ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া, জিতন সিংহকে ধমক দিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন যে, ঐ দ্বাদশ জন সিপাহী তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে এক হাত দূরে সঙ্গীনসহ বন্দুক সোজা করিয়া ধরিয়া বেষ্টন করিয়াছে এবং জিতন সিংহের কিরীচের অগ্রভাগ তাঁহার উদরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। নাজীর দেওয়ের সৈন্যাধ্যক্ষগণ ঝন২ শব্দে তরবারি কোষমুক্ত করিল, কিন্তু আপন মনিবকে সঙ্গীন ও কিরীচে বিদ্ধপ্রায় অবস্থায় দেখিয়া তরবারি ব্যবহার করিলে মনিব নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ হইবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া এবং নাজীর দেওও প্রাণভয়ে তাহাদিগকে নিষেধ করায় তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল। নাজীর দেও সক্রোধে কটিদেশ হইতে মোহর বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। জনৈক সিপাহী মোহর উঠাইয়া রাখিল। জিতন সিংহ তখন বলিল, "আপনি আপনার লোক দিগকে হুকুম দেন যেন তাহারা তরবারি বন্ধ করিয়া সকলে নীচে চলিয়া যায়।" নাজীর দেও দেখিলেন তাহা না করিলে নিজ জীবন রক্ষার উপায় নাই সুতরাং বাধ্য হইয়া ঐরূপ হুকুম দিলেন। যখন ঘরে আর কোন লোক রহিল না তখন সিপাহীরা নাজীর দেওকে মুক্ত করিয়া 'ফাইল' করিয়া রহিল এবং রঙ্গমন্দিরের উত্তর দ্বার ও শিল দ্বার বন্ধ করিল। নাজীর দেও রঙ্গমন্দির হইতে ম্লানবদনে বাহির হইয়া নিঃশব্দে তৎক্ষণাৎ বাটীতে গমন করিলেন। জীবনাথ বড় কাহেত ও খেলারাম কার্য্যী মহারাজকে লইয়া দ্রুতগতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

মহারাণী এই সকল সংবাদ শুনিয়া সিপাহীসমেত জিতন সিংহকে নানা পারিতোষিক প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "যদি তোমাকে সাহেব ঐ বিষয়ে অপরাধী স্থির করিয়া তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করে তুমি যাবজ্জীবন এই রাজ সরকারে সরদারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।" স্বর্গগত মহারাজের অগ্নিসংস্কার কালে কয়েক জন রাজদারা তাঁহার সহগামী হইলেন।

সকলে শ্রবণ ও বিবেচনা করুন মহারাজ ভূপ বাহাদুর কিরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন। যে দিবস তিনি রাজত্বলাভ করিলেন, সেই দিবস, বলদর্পিত খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীর দেও, যাঁহার নাম শ্রবণে গর্ভিনীর গর্ভপাত হইত, যিনি মহারাজের রাজ্য ও প্রাণ উভয়ই গ্রহণ করিতে সমুৎসুক ছিলেন তাঁহার ন্যায় শত্রুও অনায়াসে দমিত হইল। মহারাজ রাজ্য লাভ করায় পৃথিবী ধন্য হইল। যেমন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র হইতে ইক্ষ্বাকুবংশ ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হইতে যদুবংশ উজ্জ্বল হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীশ্রীমহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রাজা হওয়াতে, মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশ যশোদীপ্ত হইল। মহারাজ গোব্রাহ্মণ রক্ষক ও পালক ছিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে দিবস মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করিলেন সেই দিবসই গোসাঞী ও খাসনবীসের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তাঁহারা গুডল্যাড্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া পরে উকিল দ্বারা রাজার মৃত্যু সংবাদ ও নাজীর দেওয়ের দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত করাইয়া বেহারে আসিবার অনুমতির প্রার্থনা করিলেন, তাহাও অগ্রাহ্য হইল। সাহেব বলিলেন, "নাজীর দেও মহারাজের জ্ঞাতি ভ্রাতা, তিনি কেন অনুচিত কার্য্য করিবেন? আর যদিই করেন তাহার উচিত ব্যবস্থা আমি করিব।" গোসাঞী ও খাসনবীস পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় রঙ্গপুরে থাকিয়া ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন।

নাজীর দেও রাজবাড়ীতে জিতন সিংহের দ্বারা অপমানিত হইয়া বাড়ী যাইয়া শ্যামচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন যে "তুমি যদি ইহার ব্যবস্থা না কর তাহা হইলে আমার সবই বৃথা, আর যদি ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পার তবে সবই তোমার।" শ্যামচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ গুডল্যাড্ সাহেবের নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে সাহেব অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আদেশ দিলেন যে, 'রাজা নাবালক, নাজীর তাঁহার পক্ষে রাজ্যের কর্তৃত্ব করিবেন' এবং নূতন হাওয়ালদার ও সিপাহী পাঠাইয়া জিতন সিংহকে আসিতে লিখিলেন। শ্যামচন্দ্র রায় বলিলেন, "এ সবই গোসাঞী ও খাসনবীসের চক্রান্তে

হইয়াছে।" সাহেব বলিলেন, "যথার্থ, আমি জানি উহারা বেহারে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, উহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।" শ্যামচন্দ্র রায় সকল সংবাদ নাজীর দেওকে লিখলেন। জিতন সিংহ যাইবার সময় মোহর মহারাণীকে দিয়া রঙ্গপুরে পৌছিবামাত্র কর্ম্মচ্যুত হইল। নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ এই সংবাদ পাইয়া আনন্দিত অন্তঃকরণে ভাবিলেন 'সাহেব আমার আজ্ঞাবাহক মাত্র, সুতরাং আমার মনস্কামনা কেন অপূর্ণ রাখি? মহারাজের পূর্ব্বে দুই শ্রী লিখিবে আমার পুত্র যুবরাজ হইয়াছে তাহার নামের পূর্ব্বেও শ্রী লিখিতে হইবে; আমি সকলের কর্ত্তা এবং প্রধান, আমার নামের পূর্ব্বেই বা এক শ্রী লিখিত হইবে কেন? আমি যাহাকে রাজা করি সেই রাজা হয়, আমি রাজা না করিলে রাজা হয় না। রাজপুত্রকে যেমন একবার রাজা করিয়াছি তেমনি তাহা রদ করিয়া আমি নিজে যাইয়া রাজা হইব।" মনে২ এইরূপ সংকল্প করিয়া মহারাজের অভিষেক হইতে দ্বাদশ দিবসে, সসৈন্যে বেহারে আসিয়া বৌনারপারে উপস্থিত হইয়া ডঙ্কা দিলেন। ডঙ্কার শব্দ শ্রবণ মাত্রই রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে কতক স্থানান্তর কতক দেশান্তর হইল। রাজবাড়ী জন মানব শূন্য হইল। মহারাণী সকলকে রক্ষা করার কোন উপায় না দেখিয়া বিদায় দিলেন ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া নূতন হাওয়ালদারকে দ্বারে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি আর কিছুই চাই না, রাজ্য, ধন, সর্ব্বস্ব, নাজীর দেও গ্রহণ করুক, কেবল মাত্র শিশু মহারাজ ও আমার প্রাণ রক্ষা কর নতুবা তুমি যদি বল তাহা হইলে আমি মহারাজকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করি।" হাওয়ালদার উত্তর দিল, "আমার প্রাণ থাকিতে অন্তঃপুরের নিকট নাজীর দেও আসিতে পারিবে না। আমি পাহারা নিযুক্ত করিলাম।"

নাজীর দেও রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও না পাইয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া, রঙ্গ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রাজাসন প্রস্তুত করিয়া নিজে রাজা হইলেন এবং ছত্র ও দণ্ড ধারণ করাইলেন। নিজ নামে মোহর ও নারায়ণী মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া নজর গ্রহণ করিয়া রঙ্গ মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নাজীর কর্তৃক রাজ্য গ্রহণ, কাকের শালগ্রামের সোনা কণ্ঠে ধারণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার নিজ পক্ষীয় লোকেরাই বলিতে লাগিল যে "ইঁহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কারণ এরূপ নিমকহারামী কখনও কেহ করে নাই।" নাজীর দেও রাজা হইয়া মহারাজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি দিগকে যেখানে পাইলেন সেই স্থানেই নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের চতুস্পার্শ্বে এরূপ পাহারা নিযুক্ত করিলেন যে, কাহার সাধ্য ভিতরে প্রবেশ করে কিংবা কিছু তণ্ডুল বা অন্য কোন আহার্য্য দ্রব্য তথায় প্রদান করে। খাদ্য দ্রব্য প্রেরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিলেন। মহারাণী হাওয়ালদারের সাহায্যে যদি তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাই সকলকে বণ্টন করিয়া দিতেন। অন্তঃপুরের অনেক লোককেই বাধ্য হইয়া বিদায় দিলেন। দৈবক্রমে

ঐ সময় মহারাজের দুই তিন দিবস এরূপ প্রবল জ্বর হইল যে, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিলেন না, অবশেষে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। নাজীর দেও এরূপ হীন প্রকৃতি ছিলেন যে, মহারাজের চিকিৎসার জন্য কোন রূপ ওঝা বা বৈদ্যকেও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। অনুগৃহীত জনকে ভগবান শত্রুহস্ত হইতে সততই রক্ষা করেন, কেহ তাহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, পতঙ্গের দীপ নির্ব্বাপিত করার চেষ্টার ন্যায় সে নিজেই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। মহারাজের বসন্ত রোগ আপনা হইতেই আরোগ্য হইল।

গোসাঞী ও খাসনবীস পূর্ব্ব হইতেই এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া রাজমাতা মহারাণীর ও মহারাজের পত্র গভর্ণরজেনারেলের নিকট প্রেরণ করিরাছিলেন এবং গুডল্যাড্ সাহেবকেও পূর্ব্বোক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। প্রথমে সাহেব বিশেষ মনোযোগ না করিয়া শ্যামচন্দ্র রায়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, "ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, মহারাণী নাজীর দেওয়ের খুড়ীমাতা তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন মাত্র।" ইহার পর বেহারে প্রেরিত নূতন হাওয়ালদার, নাজীর দেওয়ের রাজা হওয়া, অন্তঃপুরে রসদ বন্ধ করা ও মহারাজের বসন্ত রোগে চিকিৎসা করিতে না দেওয়ার বৃত্তান্ত লিখিলে এবং গোসাঞী ও খাসনবীস নাজীর দেওয়ের নিজ নামাঙ্কিত টাকা দেখাইলে সাহেব নিশ্চিতরূপে বুঝিলেন যে, তাঁহার শৈথিল্যের সুযোগ লইয়া নাজীর দেও যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন। তাঁহাকে আপন মনিব অর্থাৎ সকাউন্সিল গভর্ণরের নিকট অপদস্থ হইতে হইল। গোসাঞী ও খাসনবীস মহারাজের আজ্ঞাপত্র অর্থাৎ 'উচিয়ত নামা' সাহেবকে দেখাইলেন। সাহেব আদেশ দিলেন, "তোমরা বেহারে যাও আমি নাজীর দেও ও শ্যামচন্দ্র রায়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইব।" তাহার পর শ্যামচন্দ্র রায়কে ডাকাইয়া আনিয়া যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "নাজীর দেওয়ের এতদুর স্পর্দ্ধা যে, সে ভৃত্য হইয়া রাজাসনে বসিয়া রাজা হইয়াছে?" এই বলিয়া রায়কে কয়েদ করিবার হুকুম দিলেন। শ্যামচন্দ্র রায় নাজীর দেওকে লিখিলেন, "আপনি যত কার্য্য করিয়াছেন, সকলেরই আমি উত্তর দিতে পারিব, কিন্তু রাজপুত্রকে রাজা করিবার পরে যে আপনি নিজে রাজা হইলেন, ইহার কোন উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হইবে না।" নাজীর দেও এই সংবাদ পাইয়া অষ্টম দিবসে বেহার হইতে বলরামপুর গমন করিলেন; তাঁহার নামে যে সকল টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল এবং মুদ্রণের মূল ছাপটি যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া গেলেন।

গোসাঞী ও খাসনবীস বেহারে আসিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পরলোকগত নাজীর মহারাজের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সংক্ষেপে সম্পন্ন করিলেন। কিছুদিন পর গুডল্যাড্ সাহেব দেওকে আটজন সিপাহী সহ শ্যামচন্দ্র রায় সমভিব্যাহারে বেহারে পাঠাইয়া গুদামে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। রাজপক্ষ হইতে তাঁহাদিগের সহিত কোন প্রকার অসৎ ব্যবহার করা

হইত না, বরং খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ প্রেরণ করিয়া মহারাণী সর্ব্বদা তাঁহাদের সংবাদ লইতেন। সাহেব সমুদয় বৃত্তান্ত ও নাজীর দেওকে আবদ্ধ রাখার বিষয় গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট লিখিলেন। পূর্ব্বে মহারাণীর পত্রে উকিল বাচনিক গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সাহেবের পত্রে সঠিক অবস্থা অবগত হইয়া নাজীর দেও ভৃত্য হইয়া রাজাসনে বসিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করে এই সংবাদে বিস্মিত হইয়া এবং এই সকল বিষয়ে গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব নাজীর দেওয়ের সহায়তা করিয়াছেন সন্দেহ করিয়া গুডল্যাড্‌ সাহেবকে অন্যত্র বদলী করিয়া তাঁহার স্থলে পিটার মুর (Mr. Peter Moore) সাহেবকে রঙ্গপুরের কালেক্টার নিযুক্ত করা স্থির করিলেন।

পিটার মুর সাহেবের আসিবার কিছু বিলম্ব ছিল, ইতিমধ্যে একমাস অতীত হইবার পুর্ব্বেই নাজীর দেও কয়েদ হইতে পলায়ন করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। সাহেব, গোসাঞী, খাসনবীস বহু অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাঁহার কোন সংবাদ পাইলেন না। অবশেষে অনেক চেষ্টায়, এক বৈষ্ণবীর নিকট সংবাদ পাইলেন যে, তিনি পয়দায় শ্যামচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে আছেন। সাহেবকে এই বিষয় জানাইয়া পরওয়ানা সহিত চারিজন সিপাহীকে বৈরাগীর বেশে পাঠাইলেন। তাহারা হরিসংকীর্ত্তন করিতে২ রায়ের ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, নাজীর দেও তথায় বসিয়া পাশা খেলিতেছেন। তৎক্ষণাৎ তিনজনে তাঁহাকে ধরিয়া ও অপর জন পরওয়ানা জারী করিয়া নাজীর দেওকে একটি খাটিয়ায় তুলিয়া রজ্জু বদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল। পরওয়ানার বিরুদ্ধে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না।

সাহেব রঙ্গপুরের ধাপের কুঠীর অট্টালিকার উপরে আছেন খাসনবীসও তথায় আছেন, এই সময় সিপাহী নাজীর দেওকে তথায় উপস্থিত করিল। সাহেব সংবাদ শুনিবামাত্র আজ্ঞা দিলেন, "খাসনবীস, মহারাজের হুকুমে নাজীর দেওকে লইয়া যাও ও কয়েদ রাখ।" এই সময় নাজীর দেও খাটিয়া হইতে বন্ধন মুক্ত হইয়া, সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে যাইতে ছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে সরকারের এক জন উকিল, তাঁহাকে কোমর ধরিয়া সোপান হইতে নামাইয়া দিল, উপরে সাহেবের নিকট যাইতে দিল না। যে খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীর দেওয়ের মুষ্ট্যাঘাতে একদিন হস্তী পশ্চাৎগামী হইয়াছিল, কালক্রমে সেই নাজীর দেওকে একজন দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ কোমর ধরিয়া নামাইল। রক্ষিগণ তাঁহাকে গোসাঞীর বাটীতে হইয়া আসিল। গোসাঞী৪০ জন বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে দেউরী ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে খাসনবীস তথায় উপস্থিত হইলে, নাজীর দেও আসিয়া তাঁহার পদানত হইয়া বলিলেন, "আমার প্রাণরক্ষা কর।" খাসনবীস তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "সাহেব, আপনি আমার মনিব মহারাজের ভ্রাতা, আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনার কোন প্রকার

অসম্মান বা প্রাণদণ্ড হইবে না।" পরে গোসাঞীর সহিত পরামর্শ করিয়া রজতের তৈজসপত্র ও উত্তম শয্যা ও নানা প্রকার সামগ্রী এবং পাঁচজন ভৃত্য নাজীর দেওকে দিলেন। তাঁহার কোন প্রকার অসম্মান করিলেন না। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়

কিছুদিন পর সংবাদ আসিল যে, পিটারমুর সাহেব কলিকাতা হইতে আসিতেছেন। গোসাঞী ও খাসনবীস দুই জন উকিলকে দিনাজপুরের দক্ষিণ দিকে, এক দিনের পথ অগ্রসর হইয়া, সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা পথেই সাহেবের সহিত নানা প্রকার শিষ্টাচারাদি প্রদর্শন করিলেন এবং সাহেব দিনজপুর পৌছিবামাত্র নানা প্রকার উপঢৌকন প্রেরণ ও আতস বাজি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া সাহেবের সন্তোষ বিধান করিলেন। সাহেব রঙ্গপুর পৌছিয়া দেখিলেন, মহারাজের লোকজন কুঠীর চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। চারিদিকে সোলা, মোম, রাঙ্গতা ও অভ্রের ঝাড়ে পরিপূর্ণ। নানা প্রকার আতস বাজি ও রোসনাই প্রস্তুত। পাঁচ শত লোক উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত। সাহেব এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

পর দিবস গোসঞী ও খাসনবীস সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা প্রকার সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন এবং ধাপ মোকামে যে বড় কুঠী, মহারাজ পারলিঙ্গ সাহেবের নিকট হইতে চব্বিশ হাজার মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই বাটীতে সাহেবের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই সকল কারণে সাহেব ইঁহাদিগের বাধ্য হইলেন। শ্যামচন্দ্র রায় কয়েদ ছিলেন, তিনি সাহেবের দেওয়ান মহারাজ অমৃত সিংহের দ্বারা নিজের মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। অতঃপর সাহেব বেহারের সমুদয় বিষয় সদরে লিখিয়া হুকুম আনাইয়া, ২৭৫ রাজশকে ১১৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে, নাজীর দেও এবং শ্যামচন্দ্র রায়কে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বিশজন সিপাহী রক্ষক সঙ্গে দিয়া বেহারে পাঠাইয়া আজ্ঞা দিলেন যে, 'কোম্পানী সরকার বাহাদুরের পরামর্শে ও শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের আজ্ঞায় ইঁহাদের দণ্ড হইবে। সম্প্রতি আমার আজ্ঞায় কারাবদ্ধ থাকিবেন।' গোসাঞীজী মহারাজ অমৃত সিংহকে ধন দ্বারা বশীভূত করিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে সাহেব, তাঁহার মেম ও দুই পুত্র সহ আসিয়া, গুদামের যে স্থানে পরে মালকাছারী হইয়াছিল, সেই স্থানে তাম্বু ফেলিয়া অবস্থান করিলেন। রাজবাড়ীতে আসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযোগ্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। দ্বিতীয় দিবসে মহারাজ মহাসমারোহে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

সাহেব আসিয়া মহারাজকে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া হস্ত ধারণ করিয়া তাম্বুতে লইয়া উপবেশন করাইলেন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর মহারাজের সম্মুখে কতকগুলি চিত্রপট, ছুরি প্রভৃতি নানাবিধ খেলনার জিনিষ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ ইহার মধ্যে কোনটি লইতে ইচ্ছা করেন?" মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না। গোসাঞী ও খাসনবীস মহারাজকে বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, আপনি কিছু চান, আপনি যাহা চাহিবেন সাহেব তাহাই দিবেন।' মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাহা চাহিব সাহেব তাহাই দিবেন?" সাহেব শুনিয়া বলিলেন "হাঁ তাহাই দিব।" তখন মহারাজ বলিলেন, "তবে আমাকে নাজীর দেওকে দেও আমি উহাকে কাটিব।" সাহেব বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন বয়ঃক্রমে বালক হইলেও বুদ্ধিতে রাজার তুল্য, পরে বলিলেন, "নাজীর দেওকে আমি আপনার হস্তেই সমর্পণ করিলাম, আপনি যত ইচ্ছা ইহাকে শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু কাউন্সিলের বিনা অনুমতিতে হত্যা করিতে পারিবেন না।" পুনরায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ আর কি চান?" ঐ সময় সাহেবের ৩। ৪ বৎসর বয়স্ক দুইটি পুত্র তথায় যাতায়াত ও খেলা করিতে ছিল, মহারাজ তাহাদিগকে দেখিতে ছিলেন। সাহেব বারংবার তাঁহাকে কিছু চাহিতে বলায়, মহারাজ খাসনবীসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি যাহা চাহিব, সাহেব তাহাই দিবেন?" সাহেব উত্তর দিলেন "তাহাই দিব।" তখন মহারাজ সাহেবের পুত্রদ্বয় যতখানি উচ্চ বাম হস্তদ্বারা উঁচতা দেখাইয়া বলিলেন, "এইমত দুইটি ফিরিঙ্গীর ছেলে চাই।" সাহেব ভাবিলেন, মহারাজ তাহাদের সহিত খেলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ ফিরিঙ্গীর ছেলে লইয়া কি করিবেন?" মহারাজ বলিলেন, "গোলাম করিব।" শুনিবামাত্র সাহেব চমকিত হইয়া দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, ইনি রাজার পুত্র রাজা, ইনি গোলাম করিতে জানেন কাহাকেও হাকিম করিতে জানেন না। এইরূপ বুদ্ধি ও আত্মভিমান না থাকিলে ঈশ্বর ইহাকে গজসিক্কার (স্বাধীন) রাজ্যের অধিপতি কেন করিবেন? শ্রীশ্রীভগবান ইহার সহায়, ইনি শত্রুক্ষয় করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবেন ইহাতে সংশয় নাই।" পরে সাহেব নাজীর দেওকে ঐ সভায় আনয়ন করাইলেন। চতুষ্পার্শ্বে শান্ত্রী বেষ্টিত লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ পদ নাজীর দেও শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সম্মুখে আসিয়া আদাব করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহারাজ কোপান্বিত অন্তঃকরণে কটাক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নীরব রহিলেন। সাহেব তাঁহার জবানবন্দী লিখিয়া লইতে আদেশ দিলেন। নাজীর দেও বলিলেন, "সকল কথার জবাব শ্যামচন্দ্র রায় দিবে, কেবল রাজাসনে বসিয়া আমি যে রাজা হইয়াছিলাম তাহার জবাব আমি দিব। আমি কখনও২ পাগল হইয়া থাকি, বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে এ কার্য্য করিয়াছি।" তখন সরকার পক্ষের উকিল শিবনারায়ণ রায় বলিলেন, "যদি পাগলই হইয়াছিলে তবে ঢেলা কেন কুড়াইলে না,

মৃত্তিকাই বা কেন ভক্ষণ করিলে না?" খাসনবীস ইসারায় তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাহার পর শ্যামচন্দ্র রায়ের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। সকাউন্সিল গভর্ণরের পরামর্শ মতে ও মহারাজের আজ্ঞায় নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের পদ হইতে অপসারিত হইলেন। তাঁহাকে দণ্ডিত করা কিংবা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করার ভার শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের উপর অর্পিত হইল তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ সম্বন্ধে আজ্ঞা দিবেন। কোচবেহার ও চাকলা বোদা আদি সমস্ত শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের নিজস্ব, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল। ঢোলদ্বারা এই সকল বিষয় সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল।

মহারাজ সভা ত্যাগ করিয়া রাজবাটীতে আগমন করিলেন। শ্যামচন্দ্র রায় সহ নাজীর দেও কয়েদ রহিলেন। সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেওয়ের পুত্র জীবেন্দ্রনারায়ণ কুঙর নাজীরী মনসব প্রাপ্ত হইলেন। সাহেব রংপুর যাইয়া সকল বিষয় সদরে জানাইলে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সম্মানার্থ কোম্পানী বাহাদুরের সরকার হইতে লৌকিকতা প্রেরিত হইল তন্মধ্যে বড় মাখনা ও ভাগীরথি হাতী, চারিটি অশ্ব ও অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী ছিল। মহারাজও হস্তী, অশ্ব, দেবাঙ্গ, কুচিন প্রভৃতি বস্ত্র নানা প্রকার উত্তম সামগ্রী উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। কপ্তান ডঙ্খীশেন (Captiain Duncanson) ও গোলাব সিং সুবেদার এক কোম্পানী সিপাহী সহিত রাজদ্বারে নিযুক্ত হইল। তাহারা কোম্পানী বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিত, বেতন মহারাজের সরকার হইতে পাইত। ভূতপূর্ব্ব নাজীর দেও ও শ্যামচন্দ্র রায়কে আর কয়েদ রাখার আবশ্যকতা না থাকায় তাঁহারা মুক্তি পাইলেন। মহারাজ ও রাজমাতামহারাণীর আজ্ঞাধীনে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। ২৭৫ রাজশকে ১১৯১ বঙ্গাব্দে স্বর্গীয় মহারাজের সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ যথোপযুক্তভাবে সম্পন্ন হইল। গোসাঞী ও খাসনবীস সমুদয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ভূতপূর্ব্ব নাজীর দেও বৈদ্যনাথ ষড়ঙ্গী ও রামকান্ত চক্রবর্ত্তীকে তাঁহার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া রাজ্যের নয় আনা দশ কড়া অংশের দাবীতে নালিশ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং শ্যামচন্দ্র রায়কে দেওয়ানি হইতে বরখাস্ত করিয়া গোরাচাঁদ বক্সীকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। শ্রীশ্রীভূপাল দিন২ শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। এক দিবস বালকগণ এক ২ পক্ষে আট জন করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল রাজসৈন্য ও অপর দল নাজীর সৈন্য নাম দিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিল। গোসাঞী এই সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বিজয়ী পক্ষকে পুরস্কার দিবেন বলিলেন। উভয় পক্ষই প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, ফলে রাজপক্ষের বালকগণ কৃশকায় হইলেও তাহারাই জয়ী হইয়া পুরস্কার লাভ করিল। সকলেই বুঝিল সর্ব্বপ্রকারেই রাজ পক্ষের জয় সুনিশ্চিত।

ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

গোসাঞী ও খাসনবীস রাজমাতা মহারাণী আজ্ঞায় রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইঁহারা প্রায়ই রঙ্গপুরে থাকিতেন, কখনও কখনও বেহারে আসিতেন। পিটার মুর সাহেব অল্পদিন রঙ্গপুরে থাকিয়া বিলাত গেলেন। ২৭৬ রাজশকে ১১৯২ বঙ্গাব্দের শেষ ভাগে ম্যাকডোয়েল সাহেব (Mr. Macdowall) রঙ্গপুরে আসিলেন। ইঁহার নাজীর দেওয়ের প্রতি আন্তরিক অনুকম্পা ছিল। গোরাচাঁদ বসাকও কলিকাতা হইতে রঙ্গপুরে আসিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের দেহ দিন২ রূপলাবণ্যমণ্ডিত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া রাজমাতাগণ উল্লসিত ও প্রজাবৃন্দের নয়ন সার্থক হইল। মহারাজের বাল্যকালের ব্যবহার ও বাক্যালাপ হইতেই লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইনি বিশ্বসিংহ বংশের কুলপ্রদীপ হইয়া নিষ্কণ্টকে বহুকাল বসুমতী ভোগ করিবেন।

এই সময় সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেও পরলোকগত হওয়ায় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর দেওয়ান দেও হইলেন। শুভগ্রহ ও কুগ্রহ সকলের রাশিতেই থাকে। রাজা ও বাদশাহদিগের যেরূপ অপরিমিত সুখভোগ হয় তদ্রূপ বিপদেও প্রাণসংশয় হইয়া থাকে। জহিরুদ্দীন মহম্মদ বাবার শাহ বাদশাহের পুত্র নছিরুদ্দীন হুমায়ুন বাদশাহ পিতৃবিয়োগের পর হিন্দুস্থানের বাদশাহী পাইয়া সের সাহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভ্রাতাদিগের শত্রুতায় কত দুঃখ সহ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র জালাল উদ্দীন মহম্মদ আকবর শাহ বাদশাহ কিরূপ দুঃসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র আড়াই বৎসর তখন শত্রু বেষ্টিত শিবিরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামাতা উভয়কেই পলায়ন করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বর যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, কেইই তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। অবশেষে হুমায়ুন বাদশাহ পুত্রসহ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় বিস্তারিত বলা বাহুল্য। এক্ষণে প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

ভূতপূর্ব্ব নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া রাজকর্ম্মচারিদিগকে তাঁহার যে সকল ভূমি ছিল তাহা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তাঁহারা অস্বীকার করিলে তাঁহার সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। নাগেশ্বরী ও পায়রা ডাঙ্গায় এই সময় কতকগুলি সন্ন্যাসী ছিল তাহাদিকে এবং তাঁহার শ্বশুর রাঙ্গামাটির বুলচাঁদ বড়ুয়ার নিকট হইতে কিছু সৈন্য ও পূর্ব্বে তাঁহার পুরাতন চাকর দিগের মধ্যে যাহারা সন্নিকটে ছিল তাহাদিগকে একত্রিত করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িল যে, নাজীর দেও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং শীঘ্রই বেহারের রাজবাটী আক্রমণ করিবেন। সকলেই শঙ্কিত হইলে। গোসাঞী ও খাসনবীস সংবাদ পাইয়া ক্যাপ্টেন ডান্‌কান্‌সনকে রঙ্গপুর হইতে বেহারে আসিতে বলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,

"আমি কি করিয়া যাইব? তোমাদের রাজ্যে আমার সিপাহীদিগের অনেক কর্জ্জা টাকা পাওনা আছে, তাহা তোমরা আদায় করিতে দিতেছনা, সেই সকল টাকা সুদ সহ যদি সম্পূর্ণ আমাকে দেও, তাহা হইলে যাইতে পারি।" ইহার অর্থ এই যে, তৎকালে সিপাহীরা টাকা প্রতি দুই আনা, তিন আনা হার সুদে প্রজাদিগকে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া টাকা আদায় করিত। ইহাতে অনেক প্রজা দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইত। গোসাঞী ও খাসনবীস ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সাহেব আসিল না। তখন গোসাঞী ও খাসনবীস ম্যাকডোয়েল সাহেবকে, ক্যাপ্টেনকে বেহারে যাইবার জন্য হুকুম দিতে অনুরোধ করিলেন। সাহেব বলিলেন, "তোমরা নাজীর দেওয়ের আর কি অবশিষ্ট রাখিয়াছ যে, সে সৈন্য সংগ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিবে?" তিনি ক্যাপ্টনকে কোন হুকুম দিলেন না ফলে, ক্যাপ্টেনও আসিল না। রাজবাড়ীতে যে সকল বরকন্দাজ ও পালওয়ান ছিল কেবল তাহাদিগকেই একত্রিত করা হইল।

২৭৭ রাজশকে (১১৯৩ বঙ্গাব্দে) বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে অকস্মাৎ এক দিবস নাজীর দেওয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণ কুঙর, (যাঁহাকে সকলে 'খোঁড়া নাজীর' বলিত) চারিদণ্ড বেলার সময় অনুমান চারি সহস্র সৈন্যসহ রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাজবাড়ীর সকলে অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। গোলাব সিংহ সুবেদার তাহার সিপাহীদিগকে প্রস্তুত থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিল কিন্তু পরে ভগবন্ত নারায়ণ তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া অর্থে বশীভূত করিয়া একখানি কাগজ দেখাইয়া বলিলেন, "সাহেবের পরওয়ানা আছে যে, দ্বার ছাড়িয়া দিতে হইবে।" গোলাব সিংহ এই কথা সকল সিপাহীকে বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিল।

ভগবন্তনারায়ণ সৈন্যসহ দ্বার অতিক্রম করিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণদিক হইতে একদল সৈন্য রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া রাজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময়ে হিন্দুস্থানী সৈন্যদিগের বন্দুকের গুলি অন্দরের মধ্যে পড়িতে আরম্ভ করিলে রাজমাতা মহারাণী ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার আর উপায় না পাইয়া মহারাজকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া অন্দরের ৪০। ৫০ জন স্ত্রীলোক সহ শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজকে বক্ষে লইয়া অধোমুখে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে পতিত হইয়া রহিলেন। মহারাজের পাহারার সিপাহী বস্তিলাল আসিয়া ঐ ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। এই সময় নাজীর দেওয়ের সৈন্য, এখন যেখানে ঘড়িখানার দালান নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া গুলি চালাইতে লাগিল। মহারাজের পক্ষের কয়েক জন পালওয়ান কর্ত্তৃক দোল মঞ্চের পার্শ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিতে পাঁচ ছয় জন ও বস্তিলালের নিক্ষিপ্ত গুলিতে দুই তিন জন নাজীর পক্ষীয় লোক

নিহত হওয়ায় সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে পারিল না। নাজীর দেওয়ের লোকেরা তখন গোলাব সিংহকে বলিল, 'তুমি দ্বার ছাড়িয়া দিলে এখন তোমারই সিপাহী গুলি চালাইয়া লোক বিনষ্ট করিতেছে।" সুবেদার দ্বিতীয় সিপাহী পাঠাইয়া বস্তিলালকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া আনিল। বস্তিলাল ও অন্যান্য সিপাহীরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুবেদারকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া কহিল, "তুমি মহারাজের নিমক খাইয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলে।" সিপাহীরা কখনও ২ সুবেদারের বিনা হুকুমেও যুদ্ধে উদ্যত হয় কিন্তু কোম্পানী সরকারের নিয়ম ও শৃঙ্খলানুসারে তাহা অসম্ভব। সিপাহীরা মহারাজকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে নিজ২ শরীর দংশন করিয়া রক্তাক্ত করিতে লাগিল। সুবেদার তাহাদিগকে কাহাকেও 'বাবা' কাহাকেও 'মিঞা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিল।

বস্তিলাল ঐ স্থান হইতে চলিয়া আসিবার পর সন্ন্যাসী ও অন্যান্য সৈন্যগণ একযোগে গুলি চালাইলে, পালওয়ানগণ পলায়ন করিতে লাগিল। ইহাদের গুলি শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে থাকায় একটি পরিচারিকা পার্শ্বদেশে গুলি বিদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হওয়ার ঘরের মধ্য হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। এই সময় ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটী হইতে খেলারাম কার্য্যী বাহির হইয়া আসিয়া ঐ ঘরের ঈশান কোণের টাটি কাটিয়া নির্গত হইবার পথ করিয়া দেওয়া মাত্র, ঘরে যত লোক ছিল সকলে এবং রাজমাতা মহারাজকে কোলে লইয়া একযোগে বাহির হইয়া দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। খেলারাম কার্য্যী মহারাজকে, মহারাণীর ক্রোড় হইতে লইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নাজীর দেওয়ের সৈন্যগণ দৌড়াইয়া আসিয়া প্রথমে মহারাজকে খেলারাম কার্য্যীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া এক ভাঙ্গা পাল্কীতে বসাইল পরে রাজমাতামহারাণীকে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় ধরিয়া লইয়া চলিল। মহারাণীকে তাহারা যেরূপ ভাবে ও যে অবস্থায় লইয়া গেল তাহা বলিতে ও লিখিতে আমি অক্ষম। অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দুষ্ট দুঃশাসন পাণ্ডুবধূ দ্রৌপদীকে যেভাবে সভায় আনিয়াছিল, ভগবন্তনারায়ণ কুঙর সন্ন্যাসী দ্বারা সেইরূপে রাজমাতাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়া লইয়া চলিলেন। কতক সৈন্য রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিল। রাজমাতা মহারাণী দক্ষিণ হস্তে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া, চক্ষের জলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া চলিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে, কি কণ্টকে কি অগ্নিতে, কিংবা সর্পমস্তকে চরণপাত করিতেছেন তাহার জ্ঞান নাই। চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য রাজদারা এবং অন্দরের পরিচারিকাগণ মুক্ত কেশে, কেহ দ্বিবস্ত্র, কেহবা একবস্ত্র পরিহিত হইয়া 'হায়' 'হায়' শব্দ করিতে ২ কেহ বা উচ্চস্বরে রোদন করিতে ২ চলিল। এইরূপ ভাবে তাঁহাদিগকে দেবাইয়ের দীঘি পর্য্যন্ত লইয়া গেল।

এই সময় নাজীর দেওয়ের খুড়ীমাতা, রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেওতার ঈশরাণী মাননীয়া

মরিচমতী আই পূর্ব্ব হইতে নাজীর দেওয়ের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া যান আরোহণ করিয়া ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজমাতা মহারাণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া যান হইতে অবতরণ করিয়া রাজমাতার পদানত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজ্যেশ্বরি, রক্ষা কর। তোমরা নাজীর দেওয়ের পিতৃপুরুষের প্রভু, আমরা পুরুষানুক্রমে তোমাদের ভৃত্য। ভৃত্য হইয়া তোমাকে অপমান করিল, নিশ্চিত জানিলাম নাজীর দেও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।" মহারাণী সজ্ঞাহীন হইয়া রোদন করিতেছিলেন, কে পায়ে ধরিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। পরে মরিচমতী আই নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন এবং যে দুষ্ট সন্ন্যাসী রাজমাতার কেশ ধরিয়াছিল, সেও ছাড়িয়া দিল। তখন মহারাণী মুখের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মরিচমতী আই বলিলেন, "আপনি যান আরোহণ করুন আমি সাধারণ দাসীর ন্যায় ঐ যান ধরিয়া আপনার অনুগমন করিব।" মহারাণী উত্তর দিলেন, "যাহা বিধিলিপি ছিল হইল, আরও অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাও ঘটিবে, যদি আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু হন হইলে, আপনি আমাকে একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দান করুন, আমি তদ্দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভগবানকে আমার আত্মা সমর্পণ করি।" মরিচমতী আই অনেক রোদন করিয়া মহারাণীর মস্তকে হস্ত রাখিয়া বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন, "যদি আমাকে প্রাণধারণ করিতে বলেন তবে বাবা শ্রীশ্রীমান মহারাজকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দেন, আমি জন্মের মত তাহাকে একবার ক্রোড়ে ধারণ করি। আর প্রতিশ্রুতি দান করুন যে, আগে আমাকে হত্যা করিয়া তাহার পর বাবা রাজাকে যাহা ইচ্ছা করিবেন।" মরিচমতী আই ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া শপথ করিলেন যে, "ঐরূপ কখনও ঘটিবেনা, কেবল সন্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই নাজীর দেও আপনদিগকে লইয়া যাইতেছে। বলরামপুরও আপনার আবাস, আপনারই স্থান।" এইরূপ অনেক কথার পর শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরকে আনিয়া রাজমাতার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। মহারাজের অঙ্গ হইতে আভরণ সকল পূর্ব্বেই খুলিয়া লইয়াছিল। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মহারাণী, যেন কিঞ্চিৎকালের জন্য মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের ন্যায় বোধ করিলেন।

অতঃপর মহারাণী ঈশ্বর 'যাহা করেন তাহাই হইবে' এই চিন্তা করিয়া যান আরোহণ করিলেন। মরিচমতী আই পৃথক যানে মহারাণীর সঙ্গে২ বলরামপুর গমন করিলেন। বলরামপুরের আবাসের দ্বিতীয় দেউড়ির ভিতর অন্তঃপুরের বাহিরে একটি ঘর ছিল, সেই ঘরে ইঁহাদিগকে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে সন্ন্যাসীরা পাহারা দিতে লাগিল। এই সময় রঘু বক্সী বেহার হইতে তথায় গিয়াছিল, কিন্তু কে কাহার আর্ত্তনাদ গ্রাহ্য করে? অপরাহ্নকালে কয়েক জন চাষী লোক দ্বারা কয়েকখানি শয্যা, কয়েকটি ঘটি, কিছু চাউল ও অন্যান্য ভক্ষ্য সামগ্রী প্রেরিত হইলে তাঁহারা বসিবার আসন পাইলেন এবং কেহ২ কিছু আহার

করিলেন। মহারাণী তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী ছিলেন, পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আহার না করিয়া আর কি করেন? যৎসামান্য কিছু আহার করিতেন। কয়েকজন চাষী লোক এইরূপ ভাবে প্রত্যহ কিছু২ খাদ্যদ্রব্য পৌছাইয়া দিত তাহা আহার করিয়াই কোন প্রকারে তাঁহারা সন্ন্যাসীদের পাহারায় কয়েদ থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

ম্যাকডোয়েল সাহেব গোসাঞী ও খাসনবীসের অনুরোধ রূঢ় ভাষায় প্রত্যাখান করিলেন। ক্যাপ্টেন সাহেবও আসিলেন না। এদিকে তাঁহারা নাজীর দেও কর্ত্তৃক সৈন্য সংগ্রহের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রঙ্গপুরে যত বরকন্দাজ পাইলেন তাহাদিগকে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে২ বেহারে পাঠাইলেন এবং নিজেরাও বেহার যাত্রা করিয়া কালীদহের পাড় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিলেন। বরকন্দাজেরা রাত্রিতে মোগলহাটে পৌছিয়া পর দিবস বেহারে আসিতেছিল, এই সময় সংবাদ পৌছিল যে, মহারাণী ও মহারাজকে নাজীর দেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কি না তাহাও সঠিক অবগত হইতে পারিলেন না। গোসাঞীজী খাসনবীসের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, খাসনবীসও রোদন করিয়া পরে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করিয়া কি হইবে? যাহাতে জীবিতাবস্থায় উভয়কে উদ্ধার করা যায় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" আর বেহারে না আসিয়া তাঁহারা ঐ পথে ধাপের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। সাহেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় একবার কুঠীর উপর হইতে নীচে আবার নীচ হইতে উপরে উঠিতে২ বারংবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "মহারাণী জীবিত আছেন কি না? এখন উপায় কি?" গোসাঞী ও খাসনবীস বস্ত্র দ্বারা অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ডানকানসন্ ও সুবেদার গোলাব সিংহই এই সর্ব্বনাশ করিল।" সাহেব তৎক্ষণাৎ ডানকানসন্‌কে কয়েদ করিয়া সুবেদারকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

অতঃপর তিনজনে মিলিত হইয়া অনেক বিবেচনা করিয়া সদরে সংবাদ লিখিলেন। গোসাঞী ও খাসনবীস বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। রঙ্গপুরে সর্ব্বত্র এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, নাজীর দেও রঙ্গপুর আক্রমণ করিবেন। গোসাঞী ও খাসনবীস মহারাজের সংবাদ জানিবার জন্য নানা বেশে নানা প্রকার লোক পাঠাইলেন। রাত্রিতে ফকীর চক্রবর্ত্তী দ্বারা এক ব্রহ্মচারীকে আনাইয়া তত্ত্ব লইয়া জানিলেন যে, মহারাণীর ক্রোড়ে মহারাজ নিদ্রা যাইতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে সন্ন্যাসী পাহারা দিতেছে। ক্রমে২ অন্যান্য লোকেও ঐরূপ সংবাদই লইয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়া ইঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা করিলেন যে, নাজীর দেও কখনও২ সন্ধির কথা বলেন। এই মনে করিয়া বেহারে

যে সকল লোক ছিলেন তাঁহাদের নিকট পত্র দিলেন যে "তাঁহারা যেন বলরামপুর যাইয়া নাজীর দেও যাহা চান তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া মহারাজকে কোন প্রকারে দুর্বৃত্তের হাত হইতে মুক্ত করেন।" শচীনন্দন মুস্তফী আদি কয়েকজন বলরামপুরে যাইয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া প্রস্তাব প্রতিপালনার্থে শপথও করিয়াছিলেন কিন্তু নাজীর দেও সম্মত হইলেন না কিংবা মহারাণীকেও ছাড়িয়া দিলেন না বরং তাঁহাদিগকেই বন্দী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কোন প্রকারে তাঁহারা পলাইয়া আসিলেন। ঐ সময় শ্রীশ্রীভূপবাহাদুর আমাশয় রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। শ্রীশ্রীভগবতী মহারাজের সহায়, তিনিই তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

ক্রমশঃ নাজীর দেও তাঁহার কৃতকার্য্যের জন্য যথেষ্ট লজ্জিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কখনও২ রাত্রিকালে বলরামপুরের বাড়ীতে আসিতেন, প্রায়ই অন্যত্র থাকিতেন। গোরাচাঁদ বসাক এই সকল ব্যাপারের পরিণাম অত্যন্ত অশুভ বুঝিতে পারিয়া কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। বিশ দিন পর সদর সংবাদ আসিল যে জাহাঙ্গীর নগর হইতে দুই কোম্পানী এবং ধরমপুর হইতে দুই কোম্পানী সিপাহী প্রেরিত হইল। সিপাহী আসিতেছে সর্ব্বত্র এই জনরব প্রচারিত হইলে নাজীর দেও অত্যন্ত ভীত হইয়া ক্রমে২ নিজ পরিবার সহ সকলকে রাঙ্গামাটীতে লইয়া রাখিলেন রাজমাতা মহারাণী ও মহারাজের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইল এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা ভীতি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। কোন দিন তাঁহাদের আহার হইত কোন২ দিন অনাহারেই কাটিত।

এইরূপে দেড় মাস অতীত হইলে ঢাকা কাপ্তান রাটন (Captain Rattan) ও একজন লেফ্‌টেন্যান্ট দুই কোম্পানী সিপাহী সহ রঙ্গপুর পৌছিলেন, তাঁহাদের সহিত শোভা সিংহ সুবেদার ছিল। নাজীর দেওয়ের সৈন্য সংখ্যা ও তাঁহার যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি বিষয় অবগত হইয়া তাঁহারা কেবল মাত্র দুই কোম্পানী সিপাহী লইয়া অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া ধরমপুর হইতে দুই কোম্পানী সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কিছু দিন রঙ্গপুরে থাকিলেন।

যে দিন ধরমপুর হইতে সিপাহী রঙ্গপুরে পৌছিবে সেই দিবসই পূর্ব্ব দুই কোম্পানীসহ ক্যাপ্টেন রাটন রওনা হইয়া চতুর্থ দিবসে তিন ক্যাপ্টেন একজন লেফ্‌টেন্যান্ট ও চারি কোম্পানী সিপাহী নাজীরগঞ্জে একত্রিত হইলেন। আষাঢ় মাস, চতুর্দ্দিক জলে প্লাবিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সী প্রভৃতি সৈন্যদের রসদের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজপক্ষের সৈন্যগণ ঐ স্থানে চারি পাঁচ দিবস অবস্থান করিল। সদরের আজ্ঞানুসারে ক্যাপ্টেন রাটন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে গোসাঞী, খাসনবীস, ম্যাকডোয়েল সাহেব ও ক্যাপ্টেন সাহেবের বরাবরে মহারাণীর সাক্ষরিত এই মর্ম্মে পত্র আসিতে লাগিল যে

'নাজীর দেও আমার পর নহেন, ইহা ঘরোয়া বিষয়, তিনি যাহাই করুন আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না, তিনি নিজে হইতেই আমাকে বেহারে রাখিয়া আসিবেন। তোমরা কেন যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ফিরিয়া যাইবে ইত্যাদি।' পরোক্ষ বিশ্বস্ত লোক দ্বারা লিখিতেন, "আমি শত্রুর বশীভূত, আমাকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেছে, কখনও তরবারি দ্বারা কাটিতে আসে কখনও বা বন্দুকে গুলি পুরিয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়; তাহারা যাহা বলে তাহাই বাধ্য হইয়া লিখি, আমরা যে প্রাণে বাঁচিব তাহা মনে হয় না। মহারাজকে কখনও ঘরের বাহির হইতে দেয় না এইরূপ ভাবে আছি।"

দৈব দুর্যোগশান্ত হইলে সৈন্যগণ চারি দলে বিভক্ত হইয়া এক দিনেই বলরামপুর বেষ্টন করিয়া এক চতুর্থাংশ ক্রোশ দূরে ছাউনিক রিল। বলরামপুরের তিন দিকেই চেকাদারা নদী। অতি বৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক জলময় হওয়ায় নৌকা ভিন্ন পার হইবার কোন উপায় ছিল না। সাহেব চতুর্দ্দিকের পথ এরূপভাবে অবরোধ করিলেন যেন কোন খাদ্যদ্রব্য ভিতরে যাইতে না পারে। মহারাজকে যে স্থানে ও যে ঘরে রাখিয়াছে তাহার পথ সুন্দর ভাবে নক্সা করিয়া রাখিলেন। নৌকার জন্য সাহেবরা গয়েশমামুদ জমাদার, জ্ঞান সরদার ও অন্যান্য লোককে এরূপ বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহাদের দেহ হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা আর নৌকা সংগ্রহ করিতে পারিল না। এক২ দিকে শড়ঙ্গা নৌকা দিয়া দুই খানা করিয়া মাড় প্রস্তুত করিয়া দিল।

নাজীর দেওয়ের লোকেরা ঐ দিবস হইতে প্রত্যহ রাজমাতা মহারাণী ও মহারাজকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বারুদের বিছানার উপর বসাইয়া রাখিত এবং বলিত, "যখন কোম্পানীর সৈন্য পার হইয়া আসিবে প্রথমে এই বারুদে অগ্নি প্রদান করিয়া পরে যুদ্ধ করিব।" মহারাণী প্রাণভয়ে কাতর হইয়া মাথার দিব্য দিয়া ক্যাপ্টেন সাহেবকে পত্র দিলেন যে তোমরা যুদ্ধ করিও না ফিরিয়া যাও আমাকে নাজীর দেও ছাড়িয়া দিবে, নতুবা আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে না। আমরা বারুদের শয্যার উপর বসিয়া আছি, এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি প্রদান করার বিলম্ব মাত্র। সাহেবরা এই পত্র পাইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চারিজন প্রত্যহ একত্রিত হইয়া সন্ধি করা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন। দ্বিতীয় দিবসে রামরত্ন বক্সী আসিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি আর অত্যাচার না কর রাজমাতা সহিত মহারাজকে কাল আনিয়া দিব।" সাহেবরা বলিলেন, "তাঁহাদিগকে পাইবামাত্র আমরা উঠিয়া যাইবে।" বক্সী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ পাঠাইলেন,"নাজীর দেও আবাসে নাই তিনি আসিলেই যাহা হয় করা যাইবে।" এইরূপে ছয় দিন অতীত হইল। সপ্তম দিবস প্রত্যুষেই সাহেবরা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু শেষ রাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রভাতে সাহেবরা নিজ২ সৈন্য পার হইবার আজ্ঞা দিলেন এবং সকলে উত্তরদিকে, যেদিকে ক্যাপ্টেন রটন ছিলেন, সেই স্থানে আসিলেন ও সৈন্য নদী পার হইতে লাগিল। নৌকা

পার হইতে বিলম্ব হয় দেখিয়া তাঁহারা নিজ হস্তে লগী চালাইয়া শীঘ্র নদী পার হইয়া রটন সাহেব সহ চারিজন খোলা কিরীচ হস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পশ্চাৎ২ সিপাহীর 'ফাইল' বন্দুকে টোটা পুরিয়া আসিতে লাগিল। বেলা দুই দণ্ডের বেশী হয় নাই, প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছে, নাজীর দেওয়ের সৈন্যগণের অধিকাংশই তখনও শয্যাত্যাগই করে নাই, ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ; যে দুই একজন উঠিয়াছিল তাহারা এমন সময়ে সাহেবদিগকে সৈন্য সহ উপস্থিত হইতে দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এই অবসরে অতি দ্রুতবেগে সৈন্য সহিত সাহেবরা যে ঘরে মহারাজ ও রাজমাতা আবদ্ধ ছিলেন, তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া "কাঁহা মহারাজা, কাঁহা মহারাজা" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। মহারাজ তখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঐ ঘরের মধ্যেই খেলা করিতেছিলেন। শীত নিবারণের জন্য কেবলমাত্র একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র খণ্ড তাঁহার গলায় জড়ান ছিল। মহারাণী জাগ্রত অবস্থায় শুইয়া ছিলেন। ঘোর চিন্তায় মগ্ন, রাত্রি প্রভাত হইল এখন কি করিবেন, ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা স্বপ্নবৎ সাহেবদিগের কথা ও সিপাহীদিগের পাদক্ষেপের ধপ্ ধপ্ শব্দ শুনিয়া অতিদ্রুত উঠিয়া মহারাজের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি বল আমিই মহারাজ।" মহারাজ কিছুই বলেন না। সাহেবরা রাজমাতার কথা শুনিতে পাইয়া এবং বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সীর নিকট হইতে পূর্ব্বেই মহারাজের বর্ণনা শুনিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার রূপ লাবণ্য ও রাজলক্ষণাদি দর্শনে ইনি যে মহারাজ এবং দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়াই ইহার এইরূপ দুরবস্থা তাহা বুঝিতে পারিয়া এক ক্যাপ্টেন সাহেব মহারাজকে ক্রোড়ে লইয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইয়া নৌকায় উঠিয়া তাঁহাকে লইয়া নদী পার হইলেন। অন্যান্য সাহেবরা মহারাণীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "মেম সাহেব, তোমকা পিছে হাম লোককা জান হায়।" ইতিমধ্যে কতকগুলি প্রহরী সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলে, সিপাহীরা গুলি চালাইল। কতক সন্ন্যাসী সেইখানেই পড়িল কতক পলাইতে২ সিপাহীর গুলিতে আহত হইল। অপর তিনদল সৈন্য তিনদিক হইতে আসিয়া বলরামপুর বেষ্টন করিয়া যেখানে যাহাকে পাইল তাহাকেই গুলি করিয়া বা সঙ্গীন দিয়া মারিতে লাগিল। প্রায় ২৫০ জন লোকের মৃত্যু হইল, কতক অস্ত্রাঘাতে আহত ও কতক ধৃত হইল, অবশিষ্ট নদী সন্তরণ করিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

নাজীর দেওয়ের আবাসে বিশেষ কিছু ছিল না। যাহা ছিল তাহা সিপাহীরা লুঠ করিল এবং আগুন লাগাইয়া আবাসের কতকাংশ পোড়াইয়া দিল। দুই তিনটি ঘোড়া ও একটি হাতী সহকারে আনিল। সাহেবরা রাজমাতামহারাণীকে অন্যান্য সকলের সহিত নদী পার করিয়া কতক যানে, কতক দোলায় লইয়া চলিলেন। যেমন মহীরাবণ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে হরণ করিয়া পাতালে রাখিয়াছিলেন, পরে হনুমান পুরী সহিত ধ্বংস করিয়া শ্রীশ্রীভগবানকে উদ্ধার করিয়া সুবেল পর্ব্বতে আনিয়াছিলেন সেই রূপ ক্যাপ্টেন রটন

বলরামপুর ছারখার করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরকে বেহারে লইয়া আসিলে, ভূপতির সৌভাগ্য সূর্য্য মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিমান হইল। রাজমাতামহারাণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ রঙ্গমন্দিরে সাহেবদিগের সহিত উপবেশন করিলেন। সাহেবরা ইনাম প্রার্থনা করিলে মহারাজ কতকগুলি মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কার, দুইটি হাতী, চারিটি ঘোড়া, এবং নগদ দশ হাজার টাকা দিবার জন্য খাসনবীসের নামে পত্র দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। সদরের আজ্ঞানুসারে শোভা সিংহ সুবেদার এক কোম্পানী সিপাহী সহিত রাজসরকারের চাকুরীতে নিযুক্ত হইল এবং রাজাজ্ঞায় কর্ম্ম করিতে আদিষ্ট হইল। মহারাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার কর্ত্তা হইলেন। জিতন সিংহ তখন কোম্পানীর জমাদার এবং বক্তীলাল হাওয়ালদারীতে নিযুক্ত হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্যাপ্টেন সাহেবের সৈন্যগণ বলরামপুরের আবাসে আগুন লাগাইয়া ও রক্ষকদিগকে বিনাশ করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরকে রাজবাটীতে আনয়ন করিলে, নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ পলায়ন করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। তাঁহার পক্ষের উকিলেরা কলিকাতায় নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিল না। সরকার পক্ষে হরিপ্রসাদ সরকার ও জানকীরাম সরকার উকিল ছিলেন। রঙ্গপুর হইতে ম্যাকডোয়েল সাহেবও সদরে পত্র পাঠাইলেন। অবশেষে গভর্ণরের কাউন্সিলে সমস্ত বিষয় বিবেচিত হইয়া আদেশ হইল যে, বেহারে যাবতীয় বিষয়, নাজীর দেওয়ের দৌরাত্ম্য রাজ্যে তাঁহার কোন অংশ আছে কিনা, মহারাজ ভূপ বাহাদুরের রাজ্যের উপর কতদূর অধিকার, এবং ক্যাপ্টেন ডান্‌কান্‌সনের আচরণ এই সকল বিষয়ের বিচারের ভার মেস্তর মেছর সাহেব আর সুরবিট সাহেবের (Messrs Lawrence Mercer and John Lewis Chauvet) উপর ন্যস্ত হইল। সাহেবদ্বয় সন ২৭৮ রাজশকের (১১৯৪ বঙ্গাব্দে) আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে বেহার কিংবা বলরামপুরে না আসিয়া মোগলহাটে আসিয়া থাকিলেন। গোসাঞী সর্ব্বানন্দ ও কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীস গিতালদহে থাকিয়া সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভাইয়া সৃষ্টিধর রায়, কৃষ্ণপ্রসাদ রায় ও শিবনাথ রায় তিন জনকে সরকার পক্ষের উকিল নিযুক্ত করিয়া দিলেন, নাজীর দেওয়ের পক্ষে শ্যামচন্দ্র রায় উপস্থিত হইলেন।

সাহেবরা নাজীর দেওয়ের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু নাজীর ভয়ে উপস্থিত হইলেন না। পরে তাঁহারা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, রাজবাড়ী আক্রমণ করিয়া লুঠ করা এবং মহারাজ ও রাজমাতা মহারাণীকে ধরিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখার অপরাধ কোম্পানী বাহাদুরের সরকার কর্ত্তৃক ক্ষমা করা হইল। খাসনবীস উকিল দ্বারা এই আদেশের প্রতিবাদ করিলেন। সাহেবরা খাসনবীসকে অনেক প্রবোধ বাক্য বলিয়া বুঝাইলেন। পরে নাজীর দেও উপস্থিত হইলেন। বিচার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে উল্লেখ করা বাহুল্য, তজ্জন্য সংক্ষেপে বলিতেছি। ইঁহারা সকল বিষয় বিচার করিয়া তাঁহাদিগের অভিমত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলেন। সাহেবদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর রাজ্যের একমাত্র অধিপতি, তাঁহার কোন সরিক নাই। আদালত ও টাঁকশালের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। চাকলাজাত পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারই থাকিল। নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ পদচ্যুত হইয়াছেন, তিনি দুশ্চরিত্র ও দুর্নীতি-পরায়ণ, গ্রাসচ্ছাদন জন্য তিনি মাসিক পাঁচশত টাকা ও বলরামপুরের তাঁহার বাসস্থান পাইবেন। নগেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেও শিশু, তাঁহার পক্ষে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, তিনি পূর্ব্বৎ থাকিবেন। ক্যাপ্টেন ডান্‌কান্‌সন, এবং সুবেদার গোলাব সিংহ আপন অন্নদাতা মনিবকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দিয়াছে। কোম্পানী বাহাদুর মহারাজের হিতার্থে যত কিছু করিয়াছিলেন, ইহাদিগের দ্বারা তাহার অন্যথাচরণ হইয়াছে, এজন্য তাহারা দেশান্তরিত হইবে, এবং ইহাদের অধীনস্থ সিপাহীরা রাজ্যের প্রজাদের নিকট টাকা কর্জ্জ দিয়া তিন আনা হিসাবে সুদ অদায় করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের যে সকল টাকা কোচবিহার রাজ্যে পাওনা আছে তাহা আর আদায় করিতে পারিবে না। কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীসের অনেক প্রশংসা করিয়া বহি সমাপ্ত করিয়া তাহার একখণ্ড কাউন্সিলে পাঠাইলেন ও একখণ্ড জেলায় থাকিল।

সাহেবদ্বয় চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে পিনিসে চড়িয়া রাজধানীতে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে মহারাজ শিশু হইলেও সিংহশিশু। শ্রীশ্রীমহারাজ বাল্যকাল হইতেই সাহেবদিগের সহিত অতি সুন্দর বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। তিনি সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাজীর দেওয়ের কি দণ্ড ব্যবস্থা করিলেন?" সাহেবদ্বয় একটু থামিয়া বলিলেন, "তাঁহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, তিনি রাজ্যচ্যুত ও বিষয়চ্যুত হইয়াছেন; শারীরিক দণ্ড দানের কর্ত্তা আপনি স্বয়ং, আপনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইচ্ছা করিলে গভর্ণর ও কাউন্সিলের পরামর্শমত দণ্ড দিতে পারিবেন, এক্ষণে উহা স্থগিত থাকিল। রাজকার্য্য মহারাজের আজ্ঞানুসারে কার্য্যকারক দ্বারা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।" সাহেবদ্বয় বিদায় লইয়া কলিকাতা গমন করিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজের আজ্ঞায় রাজমাতা মহারাণী গোসাঞী ও খাসনবীস দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। শুভলগ্নে ও শুভদিনে শ্রীশ্রীভূপতির বিদ্যারম্ভ হইল। শ্লোকাদি অভ্যাস করাইবার জন্য হরিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে বঙ্গলা ও পারসী শিখাইবার জন্য বহুবেত্তা ও বহুদর্শী পণ্ডিত নৃসিংহ মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়

স্থষ্টিধর ভাইয়া খাসনবীসের পেস্কার নিযুক্ত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী গৌরীনন্দন মুস্তফীর পুত্র শিবপ্রসাদ মুস্তফী দেওয়ানি ও ফৌজদারীর কার্য্য পূর্ব্ব হইতে করিতেছিলেন। গৌরী নন্দন মুস্তফী অবর্ত্তমানে তিনি একবার দেওয়ানি সনদও পাইয়াছিলেন। টাঁকশালের দারোগা পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর ছিলেন। এই প্রকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ২৮০ রাজশকে (১১৯৬ বঙ্গাব্দে) লর্ড কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর বেহারের সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া, শ্রীশ্রীমহারাজ অল্প বয়স্ক বিধায় এবং রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য সকল কার্য্য নির্ব্বাহার্থে শ্রীযুক্ত মেস্তর হেনরি ডিকনিষ (Mr. Henry Douglas) সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন এবং শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরকে পত্র দিলেন যে, "আপনি অপ্রাপ্তবয়স্ক, রাজকার্য্যাদি সমস্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তগত হওয়ায় নানা প্রকার অনিষ্ট হইতেছে; রাজ্যে কাহার কি স্বত্ব আছে তাহা জানিবার জন্য এবং রাজ্যের সকল কার্য্য আপনার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হইবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত সাহেবকে কমিশনার অর্থাৎ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলাম। সাহেব রাজ্যশাসন করিয়া নিরূপিত 'লালবন্দী' (কর) গ্রহণ করিয়া, নাজীর দেওয়ের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য মাসিক ৫০০ টাকা এবং আপনার নিজ খারচ ও অন্যান্য বিভাগের ন্যায্য খরচ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট টাকা, আপনার আজ্ঞা সাপক্ষে মজুদ রাখিবেন। আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, আপনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সকল কার্য্য আপনার হস্তেই সমর্পন করা হইবে।"

হেনরি ডগ্‌লাস সাহেব মাঘ মাসে বেহারে পৌঁছিয়া কাগজ পত্র বুঝিয়া লইতে লাগিলেন এবং সকল বিষয় জ্ঞাত হইলেন। তখন গৌরমোহন বাবু সাহেবের দেওয়ান ও জয়গোপাল সিংহ তাঁহার মুন্‌শী ছিলেন। ২৮১ রাজশকে (১১৯৭ বঙ্গাব্দে) সকল বিষয় নিজ হস্তে লইয়া সাহেব জয়গোপাল সিংহকে দেওয়ানি কর্ম্মাধ্যক্ষ করিলেন। গোসাঞীজীকে সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া সদরের অভিপ্রায় অনুসারে খাসনবীসের সহিত মিলিত হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। স্থষ্টির ভাইয়া কর্ম্মচ্যুত হইলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ রায় ফৌজদারীর কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। শিবপ্রসাদ মুস্তফী অতিশয় বিশ্বস্ত বলিয়া তাঁহাকে হুজুরের মোহরবরদার নিযুক্ত করা হইল। দলিল পত্রে মহারাজের মোহরযুক্ত হইবার পর সাহেবের নামের মোহর অঙ্কিত হইত। মহারাজের নামীয় মোহর রাজমাতা মহারাণীর নিকট থাকিত। যখন আবশ্যক হইত শিবপ্রসাদ মুস্তফী, খাসনবীস সহ ঐ মোহর লইয়া সাহেবের নিকট যাইতেন। দেওয়ানী আদালত, ফৌজদারী ও মালের পৃথক২ মোহর এবং তাহার উপরেরদিকে 'শ্রীশ্রীমহারজার হুকুম' এইরূপ অঙ্কিত হইল। রাজাজ্ঞা সকল পূর্ব্বোক্ত মোহরযুক্ত হইয়া সাহেবের দস্তখতে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিছুদিন মধ্যেই রাজ্যের ও রাজকার্য্যের যথেষ্ট শৃঙ্খলা হইল। জয়গোপাল সিংহের ক্রমশঃ পদোন্নতি

হইয়া তিনি সাহেবের দেওয়ান হইলেন। গৌরবাবুর বয়স অল্প ছিল তিনি দেশে গেলেন। মহাল সমুহের ডাক বন্দোবস্ত হইবার নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় মহালের জমা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইল। সাহেব সরকারের খরচ অত্যন্ত কমাইয়া কেবল যাহা ব্যয় না করিলে চলেনা, সেই পরিমাণ ধার্য্য করিলেন এবং কর্ম্মচারীর সংখ্যাও অনেক কমাইয়া দিলেন কিন্তু মাস শেষ হইলেই সমস্ত পাওনা পারিশোধ করিয়া দিতেন কিছুই বাকী থাকিতনা। সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও প্রতিমাসে অনেক টাকা সঞ্চিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমহারাজের পারসী, বাঙ্গলা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য সাহেব অনেক চেষ্টা করিতে লগিলেন। সপ্তাহের পর২ মহারাজ যাহা শিক্ষা করিতেন, সাহেব তাহার পরীক্ষা লইতেন। প্রতি তিন মাস অন্তর তাঁহার হস্তাক্ষর দেখাইবার উদ্দেশ্যে পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত পত্র গভর্ণরের কাউন্সিলে প্রেরিত হইত। পারসী পড়াইবার জন্য মৌলভী মেহের আলি এবং লেখা শিখাইবার জন্য লালা স্বরূপ সিংহ নূতন খাসনবীস নিযুক্ত হইল। অতি অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ নানা বিদ্যা অভ্যাস করিলেন এবং অশ্ব ও গজারোহণে সুদক্ষ হইলেন। প্রতিদিন প্রাতে মহারাজ যখন রঙ্গভূমির ধূলি শরীরে মর্দ্দন করিয়া ব্যায়াম করিতেন তখন তাঁহার মূর্ত্তি অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত; বিভূতিমণ্ডিত দেহ ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনমণ্ডল যেন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমহাদেব।

২৮৩ রাজশকে (১১৯৯ বঙ্গাব্দে) মহারাজের শুভ চূড়াকরণ সম্পন্ন হইল। সেই সময় জীবেন্দ্রনারায়ণ নাজীর দেওয়েরও চূড়াকরণ হইল। শ্রাবণ মাসে সাহেব লমশডিন (Mr. Lumsden) সাহেবের নিকট কার্য্যের ভার দিয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে ডগলাস্ সাহেবের পরিবর্ত্তে হোন বরেণ চারণছ ওরূন বরুছ (Hon'ble Charles Andraw Bruce) সাহেব কমিশনার নিযুক্ত হইয়া বেহারে আগমন করিলেন, ডগলাস্ সাহেব পাটনায় গেলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়

ব্রুস সাহেব কমিশনার হইয়া আগমন করিলে দেওয়ান জয়গোপাল সিংহ কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেশে গেলেন। সাহেবের সহিত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, হিঙ্গনলাল বাবু ও রাজীব-লোচন বসু তিন জন মুৎসদ্দী আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালতের কর্ত্তা, হিঙ্গনলাল বাবু খাজাঞ্চী ও রাজীবলোচন বসু খাসনবীসের পেস্কার নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে সাহেব হিঙ্গনলাল বাবুর পরামর্শ লইতেন এবং খাসনবীস সহিত একত্রে কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। সাহেব তিন বৎসরের জন্য বেহারের যাবতীয় মহাল ডাক বন্দোবস্ত করিয়া ইজারা পত্তন দিলেন। ইহাতে অনেক টাকা আয় হইয়া নিরূপিত খরচ করিয়াও দুই তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইল।

রাজ্যের রাজা, প্রজা, ছোট, বড়, সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিতেই পারসী ও বাংলায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন এবং তাঁহার হস্তাক্ষর এত সুন্দর হইল যে, সকলেই তাহার প্রশংসা করিতেন। বিশেষঃত কেহই তাঁহার ন্যায় পারসী লিখিতে পারিতেন না। মহারাজ চিত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা, পুষ্প প্রভৃতি অবিকল অঙ্কিত করিতে পারিতেন। অশ্বারোহণে ও গজ চালনায় অদ্বিতীয় এবং তীরন্দাজ ও গোলন্দাজিতে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। অন্যান্য শিল্পকলাও মহারাজ শিক্ষা করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ গীতবাদ্য, তাল, মান, রাগ ও রাগিণী প্রভৃতি এরূপ বুঝিতেন যে, প্রসিদ্ধ গায়কগণও হুজুরের সম্মুখে সঙ্গীত করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। মহারাজ ক্রমে২ গুণবোদ্ধা, গুণগ্রাহী ও অশেষ গুণশালী হইলেন। তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে পরম ভক্তি করিতেন। দয়ালু, মিষ্টভাষী, শিষ্ট মহারাজকে দেখিয়া সকলে চক্ষু সার্থক মনে করিত।

সাহেব কখনও২ রাজবাড়ীতে আসিতেন, ভূপতিও কখনও২ সাহেবের বাড়ীতে যাইতেন। মহারাজের পুরোভাগে নিশান, ঘোড়ার ডঙ্কা, হাতীর উপর হাওদা, তুরী, ভেরী, রোসন চৌকি, ঝাঁজ প্রভৃতি বাদ্য, বরকন্দাজ ও খাসবরদারের শ্রেণী, সিপাহীর 'ফএল' (File) বরশীবরদার ও ধানুকীর শ্রেণী, ঘোড় সওয়ার, তুরুক সওয়ার, ঘোড়, হাতী, সওয়ারী গাড়ী, অগ্র পশ্চাৎ শৃঙ্খলা অনুসারে গমন করিত। ছাতা ও পাখা বরদার, নকিব, সোঁটা বরদার, আসা বরদার, চতুষ্পার্শ্বে খেদমতগার, কেহ পানদান, কেহ হুঁকা, কেহ ঝারি, কেহ গোলাব, কেহ নানা প্রাকার স্বর্ণময় •বাসন, যাহা প্রয়োজন সম্ভব, তাহা সঙ্গে২ লইয়া যাইত। ভূপতি কোন দিবস হস্তী কোন দিবস ঝালরদার পাল্কীতে আরোহণ করিতেন। দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর আন্দোলিত হইত। দেওয়ান দেও, নাজীর দেও, বৈকুণ্ঠনারায়ণ সাহেবের পুত্র গজেন্দ্রনারায়ণ, খাসনবীস আদি মন্ত্রিবর্গ মহারাজের পশ্চাৎ২ গমন করিতেন। কুঠীর নিকট সোয়ারি পৌছান মাত্র সাহেব মাথার টুপি খুলিয়া সোয়ারি হইতে মহারাজের হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে লইয়া উপবেশন করাইতেন। নানাবিধ আলাপ শেষ করিয়া মহারাজ কখনও পাল্কীতে কখনও গাড়ীতে রাজবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

এইরূপ ভাবে মহারাজ পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে ক্রুস সাহেব একবার কলিকাতায় যাইয়া রাজ্যের যাবতীয় ব্যয় তাঁহার আদেশ সূত্রে হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। সাহেব মহারাজের জন্য কয়েকজন মোসাহেব নিযুক্ত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গুরুপ্রসাদ বাবু একজন ছিলেন। একজন সাহেব শিল্পী আনাইয়া ইংরেজি কায়দায়, অতি সুন্দর বৈঠকখানা দালান নির্ম্মাণ করাইলেন এবং আয়না ঝাড়, প্রভৃতি নানা প্রকার গৃহসজ্জার সামগ্রী দ্বারা উহা সুসজ্জিত করিলেন। নৃপতি মধ্যে২ নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দেখিতেন ও গান শুনিতেন।

২৮৪ রাজশকে (১২০০ বঙ্গাব্দে) আকস্মাৎ পশ্চিম দেশ হইতে হাজারা সিংহ নামক একজন দুর্দান্ত দস্যু চারি পাঁচ হাজার সৈন্যসহ নেপাল ও ভোটরাজ্য দিয়া পাহাড়ে২ আসিয়া বেহার হইতে ষোল ক্রোশ দূরে সোনাজোলা নামক স্থানে উপস্থিত হইল। ক্রমে২ সংবাদ আসিল যে, হাজরা সিংহ বেহারের কোষাগারে কত ধন সঞ্চিত আছে তাহা জানিতে আসিয়াছে। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া, ক্রুস সাহেব তখন কলিকাতায় থাকায়, খাসনবীস অন্যান্য মন্ত্রিসহ পরামর্শ করিয়া মালখানায় যে ধন সঞ্চিত ছিল, তাহা হস্তীতে ও গাড়ীতে উঠাইয়া রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন এবং যতদূর সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং রাজমাতা মহারাণীকে গোসানীমারীতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীভূপ বাহাদুরকেও স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন, "হাজরা সিংহ আসিলে যুদ্ধ করিব।" পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, এক কোম্পানী সিপাহী সহিত এক ক্যাপ্টেন সাহেব, পাটগ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। তখন ক্যাপ্টেন সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য শিবপ্রসাদ মুস্তফীকে পাঠান হইল। ক্যাপ্টেনের সহিত যে সকল সিপাহীরা আসিয়াছিল তাহারা সহরে আসিয়া এরূপ উপদ্রব ও এত লোক পীড়ন করিল যে, সকলে মনে ভাবিল ইহা অপেক্ষা হাজরা সিংহ লুঠ করিলেও ভাল ছিল। সাহেব দুইদিন থাকিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিলেন। পরে জানা গেল যে, হাজরা সিংহ সৈন্য সহিত আসামের দিকে প্রস্থান করিয়াছে। বেহারে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

ক্রুস সাহেব কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের শুভ-বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। যদুনাথ ঈশরের কন্যা ও পদ্মনাথ কার্য্যীর কন্যাকে দুই মহারাণী ও আর কয়েকজন কন্যা পাত্রী স্থির করিয়া, সাহেবের আদেশে গোসাঞী ও খাসনবীস বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান করিলেন। বিবাহের দশ দিন পূর্ব্ব হইতেই মজলিস হইতে লাগিল। রজতের সিংহাসন নির্ম্মিত হইল। রঙ্গমন্দিরের সম্মুখে অনেক স্থান তক্তাদিয়া পাটাতন করিয়া তাহার উপর সামিয়ানা উঠান হইল। সামিয়ানার নীচে ও রঙ্গমন্দিরে একসঙ্গে ফরাস করা হইত। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে হিঙ্গনলাল বাবু প্রথমে আসিয়া সভা সুসজ্জিত করিতেন। রজতনির্ম্মিত চারিটি দণ্ডের উপর অপূর্ব্ব ঝালরবিশিষ্ট চন্দ্রাতপ, তাহার নীচে মূল্যবান কুচিন বস্ত্রের মছলন্দের উপর সিংহাসন স্থাপিত ; তাহার সম্মুখে ফরাস। ফরাসের উপর আতর দান, গোলাব পাষ, ফুলদান, পুষ্পের ঝাড় আদি নানা প্রকার রমণীয় সামগ্রী স্থাপন করায় এবং আয়না, ঝাড় ও ফানুস প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করায় সভা অতি সুদৃশ্য ও মনোহর হইত। সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে সাহেবের চেয়ারের পরে গোসাঞীজীর তাহার পর খাসনবীসের চেয়ার তাহার নীচে গালিচার উপর, যে সকল মুৎসদ্দী মহারাজের মর্য্যাদার পাত্র, তাঁহারা উপবেশন করিতেন, অন্যান্য লোক তথায়

বসিতে পারিতনা। বামপার্শ্বে কুঙর, কার্য্যী, ঈশর, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলেই নতজানু হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবেশন করিতেন। শ্রেণী রক্ষা না করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ হইয়া উপবেশন করিলে দরবার খাঁ আসিয়া ঠিক করিয়া বসাইয়া দিত। পশ্চাৎদিকে খেদমতগারগণ, খেদমতের নানা বস্তু লইয়া দণ্ডায়মান থাকিত। রঙ্গমন্দিরের বাহির দরজা হইতে দক্ষিণদিকে পাটাতন অতিক্রম করিয়া বহিরঙ্গন পর্য্যন্ত সিপাহীর শ্রেণী এবং বামদিকে ঐরূপ বরকন্দাজগণ দণ্ডায়মান থাকিত। বাহিরে পশ্চিমদিকে খাসবরদার, ঘরের পশ্চাতে বরশীবরদার, ধানুকী, খাঁড়াধরা, তরকষধরা প্রভৃতি দাঁড়াইয়া থাকিত। কাহারও অগ্র পশ্চাৎ হওয়ার কিংবা কোন প্রকার শব্দ করার সাধ্য ছিলনা। স্বর্ণময় আসা ও স্বর্ণ বাঁধান বেত্র হস্তে দরবার খাঁ সভাস্থ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত। কোন প্রকার অগ্র পশ্চাৎ কিংবা শব্দ করিলে তৎক্ষণাৎ ধমক দিত। ভূপতি এক২ দিবস এক২ বেশে যখন সিংহাসনে উপবেশন ও রাজছত্র ও দণ্ড ধারণ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া সকলে ভাবিত যেন দেবসভায় ইন্দ্র উপবিষ্ট হইলেন। নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যে দীপ্তিমান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মহারাজের প্রতি সহস্র২ লোক একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত। তাঁহার সম্মুখে বাই, ভাঁড়, কথক ও গায়ক প্রভৃতি নিজ২ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিত। প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকারের আতস বাজি পোড়ান হইত। এইরূপে দশ দিন মজলিস হইল। কত প্রকারের বাদ্য হইল তাহা লিখা অসম্ভব। চারিটি নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিত। সংখ্যাতীত বন্দুক ও তোপের ধ্বনি হইল। গুদাম হইতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা এরূপ আলোকিত হইত যে, অন্য লোকের মশাল কিংবা পৃথক আলোকের কোন প্রয়োজন ছিলনা। সোনা, রাঙ্গ, অভ্র, মোম প্রভৃতির কত প্রকার ঝাড় হইয়াছিল তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সকাউন্সিল গভর্ণর সাহেব, শ্রীশ্রীদেবরাজ, দিনাজপুরের রাজা প্রভৃতি অন্যান্য জমিদারগণ সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

যথাসময়ে শুভলগ্নে কুলচার মতে পূর্ব্বোক্ত দুই মহারাণী ও কয়েকজন কন্যা পাত্রী সহিত শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের নিকট লৌকিকতা প্রেরিত হইল এবং মন্ত্রিবর্গকে পারিতোষিকস্বরূপ শাল প্রভৃতি নানা বস্ত্র ও অশ্ব প্রদান করা হইল। এই বিবাহে যে পরিমাণ শাল ক্রয় ও বিতরণ হইয়াছিল সচরাচর তাহা দেখা যায় না। এইরূপ মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে চৌষট্টি হাজার টাকা দিয়া পরমেশ্বরী নোট (Promissory note) ক্রয় করা হইল, প্রতিসন তাহার সুদ পাওয়া যাইত। কিছুদিন পর গুরুপ্রসাদ বাবু পুনরায় আসিয়া মহারাজের পার্শ্বচররূপে থাকিলেন এবং ক্রমেই হুজুরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিতে লাগিলেন। ২৮৬ রাজশকে (১২০২ বঙ্গাব্দে) ক্রস সাহেব হুগলীর জজ হইয়া বেহারা হইতে প্রস্থান করিলে, রঙ্গপুরের কালেকটার সাহেব কিছুদিন এখানকার কাজকর্ম্ম করিতেন

পরে মেস্তর উলিএম টোরছ ইসমিট (Mr. W. T. Smith) সাহেব এখানকার কমিশনার হইয়া আসিলেন। ইতি রাজোপাখ্যান প্রত্যক্ষ খণ্ডে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

নবম অধ্যায়

স্মিথ সাহেব এখানে আসিলে, হিঙ্গনলাল বাবু ও রাজীবলোচন বসু বিদায় হইলেন। শ্যামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেওয়ান হইলেন, সাহেবের মুন্সী মিত্রজিৎ সিংহ খাজাঞ্চী হইলেন। রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী খাসনবীসের পেস্কার নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পর শ্যামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা পদ্মলোচন দেওয়ান হইলেন। সমুদয় কাজকর্ম্ম কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীসই করিতেন। গুরুপ্রসাদ বাবু ফৌজদারী আদালতের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় রাজোপাখ্যান বক্তা আমি, বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলাম। শ্রীশ্রীভূপ বাহাদুর আমাকে আনাইয়া হুজুরের মুন্সীর নৃসিংহ মুন্সীর স্থলে নিযুক্ত করিয়া মুন্সী খেতাব প্রদান করিলেন। সেই হইতেই ভূপালের চরণ ছায়ায় কালাতিপাত করিয়া আসিতেছি।

শ্রীশ্রীমহারাজ বাহাদুর প্রথম যৌবনে প্রত্যহ প্রাতে ব্যায়াম করিতেন। কখনও অশ্বে কখনও গজে, কখনও চেরট গাড়ী (Chariot) কখনও বগীতে আরোহণ করিতেন। মধ্যে২ শিকারে যাইয়া পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তু গুলি করিতেন। রাত্রিতে প্রায়ই নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতেন। পার্শ্বচরগণ এবং আমরা সর্ব্বদা সন্নিকটে থাকিয়া আমোদ আহ্লাদে যোগদান করিতাম। ঐ সনে ভূপতি বৈকুণ্ঠপুরের দর্প দেওয়ের দৌহিত্রী ও বিজয়েশ্বর কার্য্যীর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার উপাধি হইল বড় মধ্যম আই দেবতী। ঐ বিবাহে যথেষ্ট সমারোহ হইয়াছিল। ইহার পর কোন বিষয়ে খাসনবীসের উপর মহারাজ অসন্তুষ্ট হওয়ায় খাসনবীস সাত আট মাস পর্য্যন্ত মহারাজের সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত থাকেন।

২৮৭ রাজশকে (১২০৩ বঙ্গাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে ভূপ বাহাদুরের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেব—লোকে যাঁহাকে 'বড় কাছুয়া' সাহেব বলিয়া ডাকে—জন্মগ্রহণ করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র মহারাজ পরম আহ্লাদে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গোসাঞী জীকে প্রণাম করিয়া কুলাচার মতে স্নান করিয়া পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া খাসনবীসকে স্মরণ করিলেন। খাসনবীস অতি হৃষ্টচিত্তে তথায় আগমন করিলে, মহারাজ গোসাঞী, খাসনবীস সহ রঙ্গমন্দিরে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার দান বিতরণ করিলেন। সে দিবস দুঃখী, কাঙ্গালী প্রভৃতি যাহারা জীবনে অর্দ্ধ মুদ্রা কেমন তাহা দেখে নাই, তাহাদিগকেও মহারাজ পাঁচ টাকা দান করিলেন। পাঁচ টাকার কম কোন দান হইল না। ব্যক্তি বিশেষে দশ, বিশ, পঞ্চাশ, দুই শত টাকা পর্য্যন্ত দান পাইল। নানা প্রকার নৃত্য, গীত, মহোৎসব প্রভৃতি হইতে লাগিল এবং এক রাত্রিতেই সপ্তদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইল। সপ্তাহ পর্য্যন্ত নহবৎ বাজনা, নানাবিধ বাদ্য ও তোপ, বন্দুক প্রভৃতির অসংখ্য ধ্বনি হইল ও

সিপাহীদিগের কুচ কাওয়াজ হইল। পরে, মধ্যম কাছুয়া, মেঘেন্দ্রনারায়ণ কুঙর, যাহাকে লোকে 'টেপর সিংহ' বলিত, জন্মগ্রহণ করিলেন এবং যথোপযুক্ত নহবৎ বাদ্য, তোপ প্রভৃতি হইল। ১২০৪ সালের কিছুদিন অতীত হইলে স্মিথ সাহেব স্থানান্তরে গমন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়

২৮৮ রাজশকে (১২৪০ বঙ্গাব্দে) মেস্তর রিচারড আমটি (Mr. Richard Ahmuty) সাহেব বেহারের কমিশনার হইয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস দেওয়ান আসিলেন। ইনি অতিশয় অর্থ লোলুপ ছিলেন এবং এক বৎসর মধ্যে লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিলে খাসনবীসের সহিত মনান্তর হওয়ায় স্থানান্তরিত হইলেন। ফৌজদারীর কার্য্যে শিবনারায়ণ বাবু নিযুক্ত হইলে গুরুপ্রসাদ বাবু পুনরায় মোসাহেব সামিল হইলেন। ব্রজনন্দন মুস্তফী নৃপতির অনুগ্রহ লাভ করিলেন। ভূপতি রাজকার্য্য সকল নিজে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সকল গুণে গুণবান তাঁহার বর্ণনা আমি কি করিব। রূপে কন্দর্প তুল্য, আজানুলম্বিতভুজ লোকে শুনিয়াছে, কিন্তু আমার ভূপতি ভিন্ন অপর কাহাকেও বোধহয় দেখে নাই। আরক্তিম চক্ষু, আকর্ণ বিস্তৃত ভ্রূযুগ, যুবতী মনমোহন রূপ। সতত ব্যায়াম করায় বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, সুদৃঢ় বাহু যুগল, রঙ্গভূমির ধুলি শরীরে মর্দ্দন করিলে তাঁহাকে স্বয়ং গঙ্গাধরের ন্যায় দেখাইত। কবিগণ অনেকে ঐ রূপের বর্ণনা করিয়াছেন আমি তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করিতে অক্ষম। অনেক অদ্বিতীয় কুস্তিগীর মহারাজকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে। মহারাজ এই সময় হইতে ক্ষুদ্র পশু ও পক্ষীর উপর গুলি চালনা বন্ধ করিলেন। ব্যাঘ্র, মহিষ ও গণ্ডার সর্ব্বদা শিকার করিতেন। মহারাজ বলি দিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এক সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশটি পাঁঠা কাটিতেন এবং তিন বৎসর বয়স্ক ও এক হস্তেরও অধিক শৃঙ্গ বিশিষ্ট মহিষ এক আঘাতেই ছেদন করিতে পারিতেন। মহারাজ শীতকালেও শীত বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, মাঘ মাসের রাত্রিতেও পাতলা চাদর ব্যবহার করিতেন। ন্যূনপক্ষে, মহারাজের পঞ্চাশ ঘড়া জলের কম স্নান হইত না প্রত্যহ আহ্নিক, হোম, সমাপন করিয়া পুরাণ শ্রবণ এবং তণ্ডুল ও স্বর্ণ দান করিয়া ফোটা ধারণ করিয়া রাজাভরণ ও রাজবেশ পরিধান করিতেন। রমণী মনমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া লোকের চক্ষু সার্থক হইত। ভূপতি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে দান বিষয়ে দধীচি ও কর্ণের তুল্য, প্রতাপে রাবণের ন্যায়, বিচারে বৃহস্পতি ও প্রজাপালনে শ্রীশ্রীরঘুপতির ন্যায় ছিলেন। তাঁহার তুল্য রাজা কলিযুগে হয় নাই, কেহ দেখেও নাই। মহারাজ এরূপ মিষ্টভাষী ছিলেন যে, কেহ মহাদুঃখে দুঃখিত হইয়াও তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে, শ্রীমুখের একটি বাক্য শ্রবণ করিলেই অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় তাহার সর্ব্বদুঃখ দূর হইত। যাঁহার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিতেন, সে মনে করিত তাহার রাজ্য লাভ হইল। মহারাজ সদা হাস্যময় ও আনন্দিত-

চিত্ত ছিলেন, কেহ তাঁহাকে কখনও বিষণ্ণ দেখে নাই। কখনও অপভাষা শুনিতেন না, বা বলিতেন না। সামান্য বিষয়েও সাধারণ লোকের প্রতি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই। রাজধর্ম্মে ও রাজকর্ম্মে তৎপর ছিলেন। মহারাজ শিবসন্তান, স্বয়ং শিব আশুতোষ নরদেহে আবির্ভূত। দেবার্চ্চনা, নিত্য উৎসব ও প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন এবং দোলের সময় এত সমারোহ হইত যে, সেরূপ উৎসব কেহ কোথাও দেখে নাই বা শোনে নাই। হোলীতে পনর দিন যাবৎ মজলিস হইত। রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের জজ, কালেক্টার সাহেব তাঁহাদিগের মেম সাহেব ও কুঠীর সাহেবেরা উৎসব দেখিতে আসিতেন। বাইজী, ভাঁড়, কথক, কালোয়াৎ প্রভৃতি কত আসিত তাহার সংখ্যা নাই। আবির, কুঙ্কুম, আতর, গোলাব ও পুষ্প প্রভৃতির সীমা সংখ্যা ছিল না। যে স্থানে মজলিস হইত তাহার বর্ণনা আর কি লিখিব। সহরের সমস্ত পথ ঘাট আবিরে রক্তিমবর্ণ, পিচকারী লইয়া সাহেব ও মেম সাহেবরা নানা রঙ্গে হোলী খেলিতেন। কখনও কখনও সাহেবরা একপক্ষ ও ভূপতি কর্মচারী সহিত অন্য পক্ষ হইয়া কুঙ্কুমের লড়াই হইত। সোনার, গালার, রাঙ্গের কুঙ্কুম বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইত। আতস বাজি তোপ ও অন্যান্য কত প্রকার রঙ্গ তামাসা হইত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শারদীয়া পূজার দ্বিতীয়া তিথিতে কুলাচার মতে 'দেও দেখা' অর্থাৎ ভূপতি শ্রীশ্রীপ্রতিমা দর্শন করিতেন। সেই দিবস হইতে পূর্ব্ব বর্ণিত মত সোয়ারি করিয়া নাচ ও রঙ্গ তামাসা প্রভৃতি দেখিতেন। নানা স্থান হইতে সাহেব ও মেম সাহেব ঐ সকল সমারোহ দেখিতে আসিতেন। মহাষ্টমীর দিন, সহস্র পাঁঠা ও এক শত মহিষ কাটা হইত এবং রক্তের নদী প্রবাহিত হইত। পূজার বস্ত্র, আভরণ, তৈজস প্রভৃতি ও মিষ্টান্নের আয়োজনের সীমা ছিল না। এক দিনেই এগার বার পূজা হইত। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া নিশা পূজা পর্য্যন্ত পূজা ও বলির বিরাম হইত না। অন্যান্য বাদ্য ছাড়াও, একশত ঢাকের বন্দোবস্ত থাকিত, ইহার সহিত নহবৎ, তোপের শব্দ এবং লোকের কোলাহল মিলিত হইয়া মনে হইত যেন খণ্ড প্রলয় উপস্থিত। নানা স্থানে কত নৃত্য, গীত, বাদ্য হইত তাহার কোন ইয়ত্তা ছিল না। ছয় সাত লক্ষ হোম হইত এবং শত২ ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতেন। নৃপতি অন্যবিধ অর্চ্চনা করিয়া স্বর্ণ ও রজত পুষ্পের অঞ্জলি প্রদান করিয়া সপ্তবার দেবী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিতেন।

পূজা সমাপনান্তে বিজয়া দশমীর দিবস যাত্রা ও রাজ অভিষেক হইত। মহারাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন এবং রাজছত্র ও দণ্ড ধারণ করা হইত। কলিযুগে এমন এক রাজা কে কোথায় দেখিয়াছে যিনি সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন? যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছে তাহারা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিত।

এই প্রকার সর্ব্বদা উৎসব ও আনন্দে মহারাজ রাজ্য ভোগ করিতেছেন, এমন সময় ২৮৮ রাজশকের বিজয়া দশমীর দিবস সঙ্গীয় একজন ব্যক্তির অপরাধের জন্য, সর্ব্বানন্দ

গোসাঞী রাজবাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গুদামে খাসনবীসের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কয়েক মাস পরে বৎসরের শেষভাগে বৈকুণ্ঠ লাভ করিলেন। সর্ব্বানন্দ গোসাঞী নাজীর দেওয়ের হস্ত হইতে রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া ছিলেন। চাকলা বোদা সহিত সম্পূর্ণ রাজ্য ইঁহার চেষ্টায় রক্ষা পাইয়াছিল। গোসাঞী ক্রমে২ অনেক সম্পত্তি ব্রহ্মত্র করিয়া ও নানারূপ প্রবঞ্চনা করিয়া নিজের আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ ঐ সকল ভূমি সরকার কর্ত্তৃক পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। অনেক লোক অন্যায়রূপে সরকারের বহু ভূমি নিষ্কর ভোগ করিত, মিঃ আমুটি সদর হইতে অনুমতি আনাইয়া ঐ সকল ভূমির কর ধার্য্য করিলেন এবং সম্পূর্ণ রাজ্য জরিপ করিয়া জমা নির্দ্ধারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

২৮৯ রাজশকের (১২০৫ বঙ্গাব্দে) শেষ ভাগে শ্রীশ্রীভূপতি এক অনির্ব্বাচ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন গুদামে ছিলেন। আমুটী সাহেবও ঐ কুঠীতে থাকিতেন। ম্যাকনর সাহেব (Mr. Mac Callum) ও ওয়াগনার সাহেব ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় অল্পদিন মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিয়া মহারাজ রাজবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেও অতি সুন্দর ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, এই সময় তিনি অতি অল্প বয়সে পরলোক গমন করিলে, শ্রীশ্রীভূপাল অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ জীবেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে—ইনি তৎকালে নাজীরী মনসবে ছিলেন—দেওয়ানি মনসব প্রদান করিয়া গের্দ্দ পাটছাড়া তাঁহাকে দিলেন এবং নাজীরী মনসবে অমর দেওকে দিয়া পঁচিশটি গ্রাম তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রদান করিলেন। মহারাজ রঘু বকৃশীর পিতার দাসী পুত্র ভোলানাথ দাসকে জমাদার নিযুক্ত করিলেন। মহারাজের খেদমদগারের সংখ্যা ২০ জন হইতে ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ জন হইয়াছিল তাহাদিগের প্রায় সকলকেই সিপাহী নিযুক্ত করিয়া হিন্দুস্থানী সিপাহী দ্বারা তাহাদিগকে কুচ কাওয়াজ শিক্ষা দিলেন, তাহাতে একটি কোম্পানী গঠিত হইল। ঐ সনে মহারাজ ধাতুময়ী শ্রীশ্রীজয়তারা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সেবার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নানাদেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া ভূপতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। দিনাজপুরের রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় তথাকার কড়া মজুমদারের পুত্র রামদুর্লভ ও নীলু বকসী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে মহারাজ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আমুটী সাহেবের দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বেহারে আসিয়া এক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার প্রতিকারের জন্য এবং বয়ঃপ্রাপ্তে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য, ওয়াগনার সাহেব ও কৃষ্ণপ্রসাদ রায়কে, ব্রজনন্দন মুস্তফীর পরামর্শ অনুসারে মহারাজ কলিকাতায় পাঠাইলেন।

২৯০ রাজশকের (১২০৬ বঙ্গাব্দে) প্রথম ভাগে শ্রীশ্রীভূপতি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রথমে

চাকলা, বোদা, পাটগ্রাম, পূর্ব্বভাগ খোদ বন্দোবস্ত অর্থাৎ মহারাজের নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবার হুকুম, সদর হইতে আসিলে অনেক আমোদ আহ্লাদ তোপধ্বনি ও নহবৎআদি হইল। চাকলাজাতের কাজকর্ম্ম ভূপতির আদেশমত হইতে লাগিল। এই সময় মহারাজ এই রাজোপাখ্যান বক্তা আমাকে তাঁহার নিজ মুন্সীগিরিতে নিযুক্ত করিয়া ক্রমেই আমার প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আমার পরামর্শ অনুসারে অনেক কার্য্য করিতেন। আমুটী সাহেব, ওয়াগনার সাহেবের কলিকাতায় যাওয়ার সংবাদ পাইয়া রাগান্বিত হইয়া সরকারের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গের্দ্দ ভক্কার একাংশ ভুটিয়াদিগকে প্রদান করিয়া তাহার দখল ছাড়িয়া দিলেন। সদর হইতে নাজীর খগেন্দ্র-নারায়ণকে চাকলাজাত সম্বন্ধে নালিশ করিবার অনুমতি আনাইয়া দিলেন। তিনি রঙ্গপুরের জজ সাহেবের নিকট নালিশ করিলেন। গভর্ণরের কাউন্সিল হইতে মহারাজের টাঁকশাল বন্ধ করাইবার হুকুম আনাইলেন। ওয়াগনার সাহেব ও কৃষ্ণপ্রসাদ দ্বারা কোন কাজ হইল না, কেবল আমুটী সাহেবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় নানারূপ বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল। মহারাজ ব্রজনন্দন মুস্তফীর ও জমানবীশ হরনন্দন হিসাবিয়ার নিকাশ লইবার জন্য গুরুপ্রসাদ বাবুকে নিযুক্ত করিলেন। নিকাশের ফলে হিসাবিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন এবং তাঁহার স্থলে গুরুপ্রসাদ রায় নিযুক্ত হইলেন। পৌষ মাসে রাজমাতামহারাণী কামতেশ্বরী কৈলাস গমন করিলে অতি সমারোহে মহারাজ তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের কলিকাতায় মৃত্যু হইল। ওয়াগনার সাহেব কিছু অর্থ নষ্ট করিয়া স্থানান্তর গমন করিলে ও ভবানী চৌধুরী কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সাহেবের ক্রোধ নিবৃত্তি হইল।

২৯১ রাজশকের (১২০৭ বঙ্গাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসে জলপাইগুড়ির দর্প দেওয়ের দ্বিতীয়া দৌহিত্রী বিজয়েশ্বর কার্য্যীর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ প্রথমে মুস্তফী ও খাসনবীসকে বলিলেন তাঁহারা অর্থাভাব বলিয়া আপত্তি করায় মহারাজ গুরুপ্রসাদ বাবুকে বলিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "ইহাতে আর বাধা কি? অবশ্যই সম্পন্ন হইবে।" "পর দিবস মহারাজ আমাকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, যে তুমি ও গুরুপ্রসাদ ভাইয়া একত্রে এই বিবাহের অনুষ্ঠান কর।" গুরুপ্রসাদ বাবু মুস্তফীর নিকাশ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা আদায় করিলেন এবং সাহেবের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া এবং লইয়া এবং চাকলাজাতের খাজনা হইতে কতক টাকা আনাইয়া শুভ বিবাহ সম্পন্ন করা হইল। আইয়ের উপাধি হইল ছোট মধ্যম আই দেবতী। গুরুপ্রসাদ বাবু এই সময় হইতে মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিলেন এবং মুস্তফীর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

ভূপতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া প্রতি ছয় মাস অন্তর গভর্ণরের কাউন্সিলে প্রেরিত হইতেছিল, তদ্দৃষ্টে মহারাজ ভূপ বাহাদুরের নানারূপ সুখ্যাতি প্রকাশিত হইল। ঐ সনের মাঘ মাসে কমিশনার উঠাইয়া দিয়া রাজকার্য্য শ্রীশ্রীমহারাজার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হইবার এবং ফৌজদারী আদালতের বিচার, দ্বিতীয় আদেশ সাপক্ষে, পূর্ব্ববৎ মহারাজের মোহরযুক্ত হইয়া রঙ্গপুরের জজ সাহেবের নিকট হইবার অভিপ্রায় সদর কাউন্সিল হইতে ব্যক্ত হইল। আমুটী সাহেব সদরের এই আদেশ গুরুপ্রসাদ বাবু ও রামকান্ত বসুর মারফতে মহারাজকে বলিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র মহারাজ আমাকে ডাকাইয়া আনিয়া মঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিলেন। আমি ফৌজদারী আদালতের বিষয় অবগত হইয়া একটু চুপ করিয়া রহিলাম পরে ভূপালের আনন্দ দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া আমোদ আহ্লাদে যোগদান করিলাম। তোপ, নহবৎ প্রভৃতি হইবার আদেশ হইল। দান, বিতরণ, নৃত্য, গীতাদি অনেক হইল। খাসনবীস অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন তজ্জন্য মহারাজ তাঁহাকে ডাকিলেন না।

শ্রীশ্রীভূপবাহাদুরের নূতন আবাস ক্ষেতি লক্ষ্মীপুর দেখিবার ও ঐ অঞ্চলে শিকার করিয়া শিবরাত্রিতে শ্রীশ্রীজল্পেশ্বর দর্শন করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল; তজ্জন্য আজ্ঞা দিলেন যে 'সাহেব কাগজপত্র প্রস্তুত করুন, আমি আসিয়া তাঁহাকে বিদায় করিবন' ভূপতি যাত্রা করিলেন আমি ও গুরুপ্রসাদ বাবুর ভ্রাতা অনুগমন করিলাম। লক্ষ্মীপুর যাইয়া দুই তিন দিনে অনেক মহিষ, গণ্ডার ও ব্যাঘ্রাদি শিকার করিলেন। শূকর, মৃগ প্রভৃতি যে কত শিকার হইল তাহার সংখ্যা নাই। ইতিমধ্যে গুরুপ্রসাদ বাবুর আরজি সমেত সাহেবের এক পত্র আসিল তাহাতে সাহেব লিখিয়াছেন যে, "আপনি আমাকে সকল কাগজপত্র গুরুপ্রসাদ বাবুকে বুঝাইয়া দিতে এবং আপনি আসিয়া আমাকে বিদায় দিবেন, এই মর্ম্মে পত্র লিখিবেন।" মহারাজ আমাকে নিভৃত স্থানে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রের জবাব কি দেওয়া যায়?" আমি নিবেদন করিলাম, "সাহেবের পত্রানুসারে উত্তর দিলে খাসনবীসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। এখন হুজুরের ইচ্ছা।" মহারাজ বলিলেন, "আমি রাজকার্য্য করিব, খাসনবীস উপদেষ্টার ন্যায় থাকিবেন, আমি কোনরূপ ভ্রম করিলে খাসনবীস তাহা সংশোধন করিবেন। কাগজপত্র এখন গুরুপ্রসাদ বুঝিয়া লউক, বেহারে যাইয়া সকল বিষয় বিবেচনা করিব।" পত্রের উত্তর ঐমর্ম্মে দেওয়া হইল। নৃপতি শ্রীশ্রীজল্পেশ্বর দর্শন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সংবাদ পাইলেন যে, বখস্থ বেগম বাঈ ও কলিকাতা হইতে চেন্টি বাঈ আসিয়াছে। আমাকে হুকুম দিলেন যে, অদ্যই বেহারে যাইয়া মজলিস করিব। কতক হস্তীতে, কতক ঘোটকে, কতক সোয়ারীতে, চৌদ্দক্রোশ পথ আসিয়া রাজবাটীতে মজলিস হইল। গুরুপ্রসাদ বাবু আমুটী সাহেবের বিদায়ের বিষয় মহারাজ সমীপে উপস্থিত

করিয়া তাঁহাকে সাফিনামা ও রসিদের মুসাবিদা দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, "কমিশনার সাহেব নিযুক্ত হওয়া অবধি তাঁহাকে বা তাঁহার অধীনস্থ আমলাদিগকে কিছু দেওয়া হয় নাই।" মহারাজ সাহেবকে সাফিনামা না দিয়া কেবলা মাত্র রসিদ দিতে আদেশ দিলেন। মজুদ তহবিলের ফর্দ্দে দেখিলাম কেবলমাত্র কয়েক শত টাকার তাম্রখণ্ড মজুদ আছে। প্রমিসারি নোট চাহিলাম গুরুপ্রসাদ বাবু বলিলেন, "সাহেব বলিয়াছেন রেভিনিউ বোর্ডের অফিসে উহা আছে।" আমি বলিলাম, "চৌষট্টি হাজার টাকার কিছু নিদর্শন না পাইলে রসিদ দিতে পারিব না।" গুরুপ্রসাদ বাবু বিষণ্ণ হইয়া এই কথা সাহেবকে বলিলেন। সাহেব বলিলেন, "তোমার কর্ম্ম নয়।" পর দিবস সাহেব এক পত্র প্রতাপনারায়ণ ঘোষের মারফত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, "চৌষট্টি হাজার টাকার প্রমিসারি নোট সদরে আছে আপনি যখনই তলব করিবেন, তখনই উহা পাইবেন।" ইহার পর সাহেবের রসিদ দস্তখত ও মোহরযুক্ত হইল, সাহেব আসিয়া বিদায় লইলেন। কাগজপত্র সমুদয় গুরুপ্রসাদ বাবু বুঝিয়া লইলেন। আমুটী সাহেব সারারাত্রি নাচ দেখিয়া প্রভাতে নীলকুঠির গ্রাণ্ট সাহেবের মেম সাহেবকে চুরি করিয়া নৌকায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। রঙ্গপুরে যাইয়া ফৌজদারীর কাগজপত্র ও মোহর ওজিরণ সাহেবকে দিলেন। বেহারের সমুদয় রাজকার্য্য গুরুপ্রসাদ বাবু করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথম বার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নানারূপ পত্রাদি সঙ্গে লইয়া গেলেন।

সাহেব চলিয়া যাইবার দুই দিবস পর কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীস রাজবাড়ীতে আসিয়া ভূপতির সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজ প্রণাম করিয়া ফরাসের উপর উত্তম আসন দিতে বলিলেন। তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া উভয়ের মঙ্গল প্রশ্নাদির পর খাসনবীস বলিলেন, "রাজকার্য্য মহারাজের আজ্ঞাধীন হয় ইহাই আমার মনস্কামনা ছিল। ভগবানের ইচ্ছায় তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমার চতুর্থ কাল উপস্থিত, শরীরও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাও নাই। অতএব কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিয়াছি।" খাসনবীস মহারাজের ভৃত্য, মহারাজ মনিব, কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে কিরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। "দাদা" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন, সম্মুখে না বসিয়া একটু পাশ ফিরিয়া বসিতেন এবং তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইয়া সভাস্থ অপর কাহাকেও উপলক্ষ করিয়া মৃদুস্বরে তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। ঐদিন সভায় বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সী ও আমি উপস্থিত ছিলাম, অন্যান্য লোকও উপস্থিত ছিল। কখনও আমাকে কখনও বক্সীকে অবলম্বন করিয়া মহারাজ অতি মিষ্টভাষায় বলিতে লাগিলেন, "এই রাজ্যরক্ষার জন্য ও শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য উদ্ধারসাধন করিতে খাসনবীস যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। রাজকার্য্য আমার আজ্ঞাধীন করিবার জন্য যে, তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা

করিয়াছেন তাহাও আমার অবিদিত নাই। শ্রীশ্রীভগবতীর কৃপায় রাজকার্য্য আমার হস্তগত হওয়ায় খাসনবীসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তাহাও সত্য। কিন্তু রাজকার্য্য আমার আজ্ঞাধীন হইলেই আমি যে রাজ্য শাসন করিতে পারিব তাহা খাসনবীস কিরূপে জানিতে পারিলেন? অতএব আমার ইচ্ছা এবং খাসনবীসের প্রতি আদেশ যে, তাঁহার আজ্ঞায় রাজ্য পরিচালিত হউক। খাসনবীস যদি পরিশ্রম করিতে অশক্ত হইয়া থাকেন তবে বাড়ীতে থাকিয়া পূজা আহ্নিক করুন। রাজকার্য্যে আমি যে সকল আজ্ঞা দেই, তাহার ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করুন এবং তাহাতে যদি কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে আমি আশাকরি খাসনবীস তাহা সংশোধন করিবেন।" মহারাজের এই সকল মিষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়া গদগদচিত্তে খাসনবীস বলিলেন, "আমি মহারাজের শ্রীমুখের বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইলাম, মায়া পরিত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম, দ্বিগুণ মায়ায় আবদ্ধ হইলাম।" পরে মহারাজ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মুন্শী, খাসনবীস সকল পুরাণ শ্রবণ করিয়াছেন, বহুদর্শী ও বহুবেত্তাও বটেন, আমার ইচ্ছা তাঁহার নিকট কিছু রাজধর্ম্ম শ্রবণ করি।" খাসনবীস তিন প্রকার শাস্ত্রসম্মত রাজধর্ম্ম ও কলিযুগে রাজা ও বাদশাহগণ যেরূপভাবে রাজকার্য্য করিয়াছেন এবং আধুনিক কালের রাজনীতি ও রাজধর্ম্ম ভীষ্মদেব যেরূপ শরশয্যায় শয়ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে শান্তিপর্ব্ব বলিয়াছিলেন, সেইরূপ অনেক বিষয় বলিলেন। তন্মধ্যে যাহা স্মরণ আছে তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীস বলিলেন, "মহারাজ শ্রবণ করুন। রাজা ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র ও পৃথিবী এই সপ্ত দেবতার সপ্ত ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবেন। ইন্দ্র যেরূপ বর্ষার চারিমাস পৃথিবীকে জলপূর্ণ করেন এবং সূর্য্য যেমন আটমাসকাল বৃক্ষাদি রক্ষা করিয়া পৃথিবী হইতে রসগ্রহণ করেন, রাজা সেইরূপ প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের পরিবার পরিজন প্রতিপালনে কোন প্রকার বাধা না জন্মাইয়া কর গ্রহণ করিবেন। বায়ু যেমন সকল প্রাণীর বাহ্যান্তর ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা সকলের যাবতীয় বিষয় চর দ্বারা অবগত হইবেন। যম যেমন প্রিয় অপ্রিয় বিবেচনা না করিয়া সকল জীবকেই নিয়মিতকালে সংহার করেন, নৃপতিও সেইরূপ ন্যায় দণ্ডে সকলকে শাসন করিবেন। বরুণ যেরূপ পাশদ্বারা সকলকে বন্ধন করেন, রাজা তদ্রূপ চোর, দস্যু প্রভৃতিকে বন্ধন করিবেন। চন্দ্রদেব যেমন ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া নিজ কিরণে সকলকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ ভূপতি নানা ধন বিতরণে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন। সকলের দুঃখক্লেশ পৃথিবী যেমন সমভাবে ধারণ ও সহ্য করেন, নৃপতিও সেই প্রকার সকল প্রজার সম্পূর্ণ ভার নিজে বহন করিবেন। খাসনবীস পুনরায় বলিলেন মহারাজ শ্রবণ করুন। রাজা সর্ব্বদা ধর্ম্ম, ধন,

প্রজা ও বল এই চারিটি বিষয় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত থাকিবেন। স্ত্রী, অক্ষক্রীড়া ও দিবা-নিদ্রা এই তিন বিষয়ে লিপ্ত হইবেন না। পাপ, কলহ, দুষ্ট সংসর্গ হইতে নৃপতি বিরত থাকিবেন। স্ত্রী, অশ্ব, গজাদি প্রতিপাল্য পশু, স্বর্ণ ও কারাগারস্থ লোক সকলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবেন। মন্ত্রণাকালে অপর লোককে তথায় থাকিতে দিবেন না এবং গুপ্ত বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। শত কারণ থাকিলেও কলহে প্রবৃত্ত হইবেন না কিন্তু প্রবৃত্ত হইলে সহস্র কারণেও তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। শত্রু পক্ষের কোন ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করিবেন না এবং বিনা মন্ত্রণায় রাজকার্য্যে আজ্ঞা দিবেন না। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে প্রজা ও ভৃত্যবর্গ যেরূপ দণ্ডার্হ হয়, সেইরূপ রাজা নিজ আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে পাপগ্রস্ত হন। ভূপতি বর্ষীয়ান, পরামর্শদর্শী লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিবেন, শঠ, প্রবঞ্চক, কামাতুর মন্ত্রীর সহিত কদাচ মন্ত্রণা করিবেন না ও সামান্য ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবেন না, সর্ব্বদা রাজধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রজা রক্ষা করিবেন। ন্যায় বিচারই রাজাদিগের স্বর্গ ও নরকের কারণ অর্থাৎ ন্যায় দণ্ডে তাঁহাদিগের স্বর্গ লাভ এবং অন্যায় দণ্ড দান করিলে তাঁহাদের নরকপ্রাপ্তি ও রাজ্য নষ্ট হয়। রাজা যদি অপরাধীকে দণ্ড না দেন তাহা হইলে নিজে ঐ অপরাধের ভাগী হন। রাজা দায়ভাগ, দণ্ডবিবেকাদি শাস্ত্রানুসারে বিচার করিবেন, কিন্তু মনুস্মৃতিবিরুদ্ধ কোন মত গ্রহণ করিবেন না; যদি ব্রাহ্মণও অপরাধী হয় তাহাকেও যথাশাস্ত্র দণ্ডিত করিবেন।

শ্রবণ করুন। অযোধ্যায় শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে এক দিবস সভামধ্যে এক কুকুর উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, "আমি রাজপথে শয়ন করিয়াছিলাম এক ব্রাহ্মণ আমাকে লগুড়াঘাত করায় আমার মস্তক হইতে রুধিরপাত হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ তাহা স্বীকার করিলে মহারাজ লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি এই ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইয়া কলিঙ্গদেশের রাজা কর।" ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, ইহার কারণ কি?" রঘুনাথ উত্তর দিলেন, "কলিঙ্গদেশের রাজা জন্মান্তরে কুকুর হইবে, ইহাই ব্রাহ্মণের রোদনের কারণ।" পরে লক্ষ্মণ আজ্ঞামত ব্রাহ্মণকে কলিঙ্গ-দেশের রাজা করিলেন। সূর্য্যবংশে যখন রঘু রাজা ছিলেন, সেই সময় শঙ্খ মুনি পরিশ্রান্ত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ এক মুনির বদরিকা, তাঁহার বিনানুমতিতে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শঙ্খমুনি, নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে অযোধ্যায় গমন করিলেন। রঘুরাজ উত্থান করিয়া মুনিকে স্বর্ণাসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। শঙ্খমুনি বলিলেন, "মহারাজ, আমি রাজশাসনযোগ্য হইয়াছি কি প্রকারে পাদ্যাদি গ্রহণ করিব? আমাকে আপনি শাসন করুন।" রাজা মুনির পদানত হইয়া স্তুতিবাক্যে বলিলেন, "আমার কি সাধ্য যে মুনিকে দণ্ড প্রদান করি?" "মুনি ক্রোধে জলন্তানলপ্রায় হইয়া কহিলেন, "তুমি মূর্খ ও অজ্ঞান। আমি চৌর্য্যবৃত্তিতে অপরাধী হইয়াছি, রাজা তাহার

যথোচিত দণ্ড বিধান না করিলে আমাকে যমের শাসনাধীন হইবে।" পরে রঘুরাজ বশিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, "চোর ব্রাহ্মণকে আনয়ন কর, এবং যে দক্ষিণ হস্তদ্বারা চুরি করিয়াছে, সেই হস্ত ছেদন কর।" আজ্ঞামাত্র ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইল। ব্রাহ্মণ যথোচিত দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়া তপস্যাবলে পুনরায় হস্ত প্রাপ্ত হইলেন।

খাসনবীস বলিলেন, "মহারাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে নৃপতিগণ যেরূপভাবে বিচার ও দণ্ড দান করিতেন তাহা আপনি পুরাণ পাঠ করিয়া অবগত আছেন। কলিযুগে হিন্দুস্থান যবন কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, বাদশাহগণ আদালত স্থাপিত করিয়া যে সকল বিচার করিয়াছেন তন্মধ্যে দুই একটি বিচিত্র বিচারের কথা বলিতেছি। আমির তৈমুরের সন্তান আকবর বাদশাহের পুত্র নুর উদ্দীন মহামদ। জাহাঙ্গীর শা বাদশাহের বেগম নুরজাহান, অতিশয় সুন্দরী, বিদুষী ও বাদশাহের আত্মস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার অদর্শনে বাদশাহ একদণ্ড প্রাণধারণ করা নিষ্ফল বলিয়া মনে করিতেন। বেগমের দুই ভ্রাতা ছিলেন, একজন গুজরাটের সুবেদার ও অপর জন মোসাহেবের ন্যায় বাদশাহের নিকট থাকিতেন। এক দিবস বাদশাহ সভায় উপস্থিত, এমন সময় গুজরাট হইতে এক রজকিনী আসিয়া বাদশাহের হস্তে এক দরখাস্ত দিল, তাহাতে এই অভিযোগ ছিল যে, গুজরাটের সুবেদার, নুরজাহান বেগমের ভ্রাতা এই অহঙ্কারে, তাহার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া পুত্রবধুকে হরণ করিয়াছেন। বাদশাহ এই দরখাস্ত পাঠ করিবামাত্র স্বয়ং উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া এবং রজকিনীকে তাঁহার পশ্চাতে উঠাইয়া লইয়া যাত্রা করিলেন। কিসের জন্য, কিংবা কোথায় তিনি যাইতেছেন, তাহা কাহাকেও বলিলেন না। তিন দিন, তিন রাত্রি অনাহারে গমন করিয়া গুজরাটের চাঁদনিচক মধ্যে উপস্থিত হইয়া রজকিনীকে নামাইয়া দিলেন। উষ্ট্রোপরি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বীপুরুষকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল। কোতওয়াল বাদশাহকে চিনিতে পারিল। বাদশাহ তাহাকে সুবেদারকে উপস্থিত করিতে আদেশ দিলেন। সুবেদার বাদশাহের আগমন সংবাদ পাইয়া গলায় কুঠার বাঁধিয়া আসিয়া হুজুরে উপস্থিত হইল এবং বাদশাহের প্রশ্নের উত্তরে নিজ অপরাধ স্বীকার করিল। বাদশাহের আদেশে কোতওয়াল সুবেদারের গললগ্ন কুঠার দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। সুবেদারের সম্পত্তি হইতে লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রজকিনীকে প্রদান পূর্ব্বক নমাজ পাঠ ও কিঞ্চিৎ আহার করিয়া, দ্বিতীয় উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া বাদশাহ তিন দিবস ও তিন রাত্রি অন্তে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর, বাদশাহের মোসাহিবীতে বেগমের যে অপর ভ্রাতা নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এমন এক গুরুতর অপরাধ করিলেন যে, কাজীরা তাঁহার কর্ণে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা দিলেন। নুরজাহান বেগম এই সংবাদ শুনিবামাত্র অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বাদশাহের নিকট যাইয়া ধুলিতে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "বাদশাহ, আপনি আমার ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করুন।" বাদশাহ প্রাণাধিকা বেগমকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে লইয়া, নিজ বস্ত্রদ্বারা তাঁহার শরীরের ধূলি ও চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "নুরজাহান তুমি, আমার অত্যন্ত প্রিয়, একটি জিনিষ ভিন্ন তোমাকে আমার অদেয় কি আছে? ধন, মন, সর্ব্বস্ব, বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রাণ, বল ইহাদের মধ্যে কোনটি চাও? ইহদের মধ্যে যে কোনটি আমি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আদালত কর্ত্তৃক যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—যাহা দ্বারা আমার পরমার্থ রক্ষা হইবে—তাহার অন্যথা করিতে পারিবনা। তবে তোমার অনুরোধে এই করিতে পরি যে, কাজীরা সীসা গলাইয়া কর্ণে দিবার ব্যবস্থা দিয়াছে আমি তাহার পরিবর্ত্তে সোনা গলাইয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া বেগম হতাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং বাদশাহ তাঁহার ভ্রাতাকে আদালতের নির্দ্দেশানুসারে দণ্ডিত করিলেন।

কিছুকাল পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহের পুত্র শাহজাদা সাজাহান অতিশয় ক্ষমতাপন্ন রাণার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, বাদশাহ নিজে প্রত্যুদ্গমন করিয়া পুত্রকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং পুত্রের কল্যাণার্থে বহু ধন রত্ন বিতরণ করিলেন। এক দিবস ঐ পুত্র অশ্বারোহণে ভ্রমণ করা কালে, দৈবাৎ এক অতিশয় দীনহীনা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের একমাত্র পুত্র তাঁহার অশ্বের পদাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বৃদ্ধা বাদশাহের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, বাদশাহ তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তৎক্ষণাৎ শাহজাদাকে আনাইয়া, স্ত্রীলোকটির হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার পুত্র তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছে, অতএব আমার পুত্রকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা কর।" বৃদ্ধা শাহজাদার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া চলিল। শাহজাদও এরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন যে, তিনিও পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ বৃদ্ধার সহিত চলিলেন। সভাস্থ সমুদয় লোক হাহাকার করিতে লাগিল। বাদশাহের ক্রোধ ও আরক্তিম মুখমণ্ডল দর্শনে কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইল না। বেগমেরা স্ত্রীলোকটিকে বহু ধন রত্ন পাঠইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে শাহজাদাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা তাহা গ্রহণ করিল না। পরে শাহজাদাকে লইয়া মৃত পুত্রের চতুর্দ্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যাও, তোমাকে আমার পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া প্রাণ দান করিলাম।" শাহজাদা কোন প্রকারে রক্ষা পাইলেন।

খাসনবীস বলিতে লাগিলেন, "রাজধর্ম্মে বিচারালয় অপেক্ষা কিছুই বড় নহে। এক্ষণে কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবরা রাজকার্য্য করিতেছেন। ইহারা দেবতুল্য, ইহারা যেরূপ শৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, অন্য কোন আমলে এরূপ ছিলনা। যত দেশ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারভুক্ত হইয়াছে সকল স্থানেরই যাবতীয় কার্য্য সকাউন্সিল গভর্ণরের জ্ঞাতসারে ও আজ্ঞায় হইতেছে। এমন কোন রাজকার্য্য নাই যাহা গভর্ণরের

বিনা আজ্ঞায় হইতে পারে। ইঁহারা এরূপ আইন, কানুন ও শৃঙ্খলার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে, তাহা অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নাই। রাজকর আদায়ের এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন যে, নির্দ্ধারিত করের অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও আদায় করিবার কাহারও শক্তি নাই। এই সকল কারণে প্রজাবর্গ অতি সুখে বাস করিতেছে। মহারাজ! আমি রাজ্য কোচবিহারের যাবতীয় প্রজার জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া, যে কর ধার্য্য করিয়া দিয়াছি যদি কেহ তাহার অতিরিক্ত আদায় না করে এবং প্রজার উপর দৌরাত্ম্য না হয় তাহা হইলে দিন২ প্রজাবৃদ্ধি হইয়া রাজকরও বৃদ্ধি পাইবে নতুবা রাজ্য নষ্ট হঁইবে। আমুটী সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ একলক্ষ নারায়ণী টাকা 'লালবন্দী' (কর) দেন, যদি মহারাজ রাজ্যে সিক্কা টাকা প্রচলন করেন তাহা হইলে তেষট্টি হাজার সিক্কা টাকায় কর বন্দোবস্ত হইতে পারে।" আমি বিবেচনা করিলাম সিক্কা টাকায় 'লালবন্দী' দিতে স্বীকার করিলে নারায়ণী টাকার ও টাঁকশালের আর কোন অস্তিত্ব থাকিবেনা, তজ্জন্য আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। যে পর্য্যন্ত নারায়ণী টাকা প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, ততদিন সিক্কা টাকায় 'লালবন্ধী' দিতে স্বকৃত হওয়া উচিত নহে। যদি টাঁকশালের আশা না থাকে তাহা হইলে তেষট্টি হাজার সিক্কা টাকায় 'লালবন্দী' স্থির করা উচিত। ফৌজদারী আদালত রঙ্গপুরে আছে তাহাও শীঘ্র মহারাজের হস্তগত হইবে।")

এইরূপ নানাপ্রকার আলাপ হইল। শ্রীশ্রীভূপবাহাদুর অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন। খাসনবীস মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন। ঐ দিবস পথে যাইবার সময় বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সী, কৈলাসনাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, মান্দু ভাণ্ডার ঠাকুর ও আমি খাসনবীসের পশ্চাৎ যাইতেছিলাম, আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "যোগিনী তন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, কৈলাসের পরিষদগণ বিশ্বসিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখভোগ করিবেন। মহারাজের লক্ষণদৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় ইনি কৈলাসের পারিষদ শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র।" ইহার পর খাসনবীস এখানে বেশীদিন ছিলেন না। চৈত্র মাসের শেষ ভাগে জগৎ শেঠের কুঠীর নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার জন্য রঙ্গপুর গেলেন, সেখানে অসুস্থ হইয়া ভূপতির নিকট পত্রদ্বারা বিদায় লইয়া কাশীনাথ কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিলেন এবং আষাঢ় মাসে করতোয়ার পশ্চিম তীরে বর্দ্ধনকুঠীর নিকটে সজ্ঞানে স্বর্গলাভ করিলেন। ভূপতি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যেরূপ রাজা, সেইরূপ খাসনবীসও ব্রহ্মর্ষি ন্যায় মহাজ্ঞানী মন্ত্রী ছিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সকলে শ্রবণ করুন। কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীস পরলোক গমন করিলে গুরুপ্রসাদ বাবু দেওয়ান হইয়া সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর প্রত্যহ প্রাতে নানা দেশীয় মল্লবীরদের সহিত ব্যায়াম করিয়া দুগ্ধ পান করিয়া বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইতেন এবং যে সকল লোক হুজুরকে দর্শন করিতে আসিত তাহাদিগের সহিত নানা প্রকার শাস্ত্র, পুরাণ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। ভূপতির বাল্যকাল হইতে চিত্রাঙ্কনে বিশেষ অনুরাগ ছিল। কয়েকজন চিত্রকরকে নিকটে রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ চিত্রপট অঙ্কিত করাইয়া লইতেন কখনও২ স্বহস্তে চিত্র অঙ্কিত করিতেন। ভূপতি তৎকালেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে ভাষায় পদ রচনা করিতেন এবং নানা প্রকার তাল, মান, রাগ, রাগিণীযুক্ত প্রসিদ্ধ গীত রচনা করিতেন। যথা সময়ে আমার মুন্‌শীখানাসম্পর্কিত কাগজাদি শ্রবণ ও দস্তখত করিতেন। তাহার পর দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় আসিয়া দেওয়ানি সংক্রান্ত রাজকার্য্যাদির কথা নিবেদন করিতেন। মহারাজ ঐ সকল বিষয় শ্রবন করিয়া দস্তখত করিতেন ও মোহরাঙ্কিত করিতে আদেশ দিতেন। ইহার পর সভা ত্যাগ করিয়া তৈল গ্রহণ করিতেন। স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া সুবেশ ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া ভোজন করিতেন এবং আহারান্তে কখনও তেমহলা অট্টালিকায় কখনও বা অন্য২ রঙ্গমন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নানা প্রকার কাব্য, কৌতুক, রস, রঙ্গ, আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন কখনও বা নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দেখিতেন। ঐ সকল স্থানে সকল লোক যাইতে পারিত না। কোন২ দিবস মহারাজ শিকারে যাইতেন এবং নানা প্রকার বন্য জন্তু শিকার করিতেন। এইরূপ আদেশ ছিল যে, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও মহিষের সংবাদ পাইলেই মহারাজকে জানাইতে হইবে। সংবাদ পাইবামাত্র মহারাজ তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া নিজ হস্তে রাইফেল অথবা দোনালা বন্দুকের গুলিতে শিকার করিতেন। ভূপতি অব্যর্থ সন্ধান ছিলেন, তাঁহার গুলি কখনও ব্যর্থ হইত না।

মহারাজ এইরূপে পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। যে সকল দেবকন্যাগণ বহুকাল তপস্যা করিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে২ ভূপতির সহিত পত্নীরূপে মিলিত হইলেন। ক্রমে মহারাজের কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ২৯২ রাজশকে বাঙ্গলা ১২০৮ সালে শুভ পুণ্যাহ সম্পন্ন হইল ও দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। জীবেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেও পূর্ব্বে হুজুরের মোসাহিবিতে দেড়শত টাকা বেতন পাইতেন, তিনি দেওয়ানি মনসব প্রাপ্ত হইয়া ও গের্দ্দ পাটছড়ার আধিপত্য লাভ করিয়া দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় মহারাজের প্রতি অনুপযুক্ত ব্যবহার ও অসৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ মহারাজ ইহাতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেন ও কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান করিতেন না। কিন্তু অবশেষে অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিলে দেওয়ান

দেওয়ের কুমন্ত্রিবর্গের মধ্যে হরেশ পূজারীকে ধরিয়া আনিয়া মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দিলেন এবং অন্যান্য লোকদিগকেও দমন করিলেন। দেওয়ান দেও উকিল দ্বারা রঙ্গপুরে নালিশ করিয়া মেস্তর মনগামরী সাহেবকে (Mr. Montgomery) বেহারে আনাইলেন। তিনি সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া গভর্ণনের কাউন্সিলে জানাইলে, সেখান হইতে পত্র আসিল যে, ইহা অনুচিত হইয়াছে। ইহার পর অনেক দিবস পর্য্যন্ত দেওয়ান দেওয়ের হুজুরের নিকট আসা নিষেধ ছিল। ভূপতি আশুতোষ, ক্রমে২ তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। ঐ সালে এক দিবস গুদামে একটি গুরুতর ডাকাতি হইয়াছিল তাহাতে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে ভোটানে ঐ সকল দস্যু ধৃত হইয়াছিল। এই সময় গুরুপ্রসাদ বাবুর প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় অর্থলোভী ছিলেন, ক্রমশঃ রাজকার্য্যে তাঁহার অন্যায় আচরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। হরনন্দন হিসাবিয়া, ব্রজনন্দন মুস্তফী, ভোলানাথ জমাদার সকলে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। গোসাঞী সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি লোক যে সকল স্বকর ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতেন, তাহা পুনরায় কর ধার্য্য করিয়া সরকার হইতে কর আদায় হইতেছিল, গুরুপ্রসাদ বাবু অর্থে বশীভূত হইয়া ঐ সকল ভূমির কর আদায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ২৯৩ রাজশকে, ১২০৯ বঙ্গাব্দে এই সকল বিষয় মহারাজ অবগত হইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অগ্রহায়ণ মাসে এক দিবস মহারাজের সম্মুখে আমাকে সরকার পক্ষে কথা বলিতে হইল, তাহাতে দেওয়ান গুরুপ্রসাদ ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক কটু কথা বলায় ভূপতি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া সিংহ দরজার নিকট গমন করিয়া তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিলে মন্ত্রিবর্গ ভয়ে কম্পিত হইলেন। ডগলাস সাহেবের দেওয়ান জয়গোপাল সিংহের পরিচিত হিরালাল নামে এক ব্যক্তি মহারাজের নিকট থাকিত এবং মহারাজের ব্যায়াম কালে সাহায্য করিত, ঐ ব্যক্তি পর দিবস মহারাজকে জয়গোপাল সিংহকে আনিবার কথা বলিল। নৃপতি তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাকে পাঠাইবার জন্য ডগলাস সাহেবকে পত্র লিখিতে বলিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যে গোপনে জমাইতলাল ও গোলাব সিংহ আসাবরদারকে পাঠান হইল। হরনন্দন হিসাবিয়া ও ব্রজনন্দন মুস্তফী, গুরুপ্রসাদ বাবু যত অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ১০৮ শ্লোক রচনা করিয়া মহারাজকে শুনাইলেন এবং লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করিলেন, ফলে গুরুপ্রসাদ রায় দেওয়ানি কার্য্য হইতে অপসৃত এবং তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। রাজকার্য্য মহারাজের আদেশ অনুসারে অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

১২০৯ সালের চৈত্র মাসে জয়গোপাল সিংহ আসিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার আমলে যাবতীয় সুনিয়ম ও সুরীতির ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। পূর্ব্বে উৎকোচ লওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ইহার আমলে উৎকোচের পরিমাণ যথেষ্ট হইলে গ্রহণ করিতেন, কম হইলে উৎকোচ দাতার কর্ণ মর্দ্দনের ব্যবস্থা হইত। এক বিষয়েই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সরকারের চৌদ্দ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিলেন, তাহাতে আমি প্রতিবাদ করায় ও হুজুরের খাস খরচ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করায় আমার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইল। আমি অবস্থা সুবিধা নয় দেখিয়া, কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গমন করিলাম। জয়গোপাল সিংহ কোন প্রকারে আড়াই বৎসর দেওয়ানি করিলেন। এই সময় সদরের অভিপ্রায় অনুসারে মেস্তর ফরানশীস প্রাড (Mr. Francis Pierard) সাহেব ভূপতিকে বুঝাইয়া যাহাতে আদালত কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে লইতে পারেন, তজ্জন্য বেহারে আসিলেন। হুজুর তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পুনরায় সেঞ্জ সাহেব (Mr. John French) আসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ভোলা জমাদারের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অবশেষে সে সেনাপতি খেতাব প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ হইল এবং অনেক সময় রাজকার্য্যেও মন্ত্রণা দিতে লাগিল। এই সময় নিজ কার্য্যবশতঃ রামচন্দ্র বড় কাহেত কার্য্যী স্থানান্তর গমন করিলেন। ক্রমে২ ভূপবাহাদুর বোদার আই দেবতী ও শীতলখুচীর আই দেবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ২৯৬ রাজশকে ১২১২ বঙ্গাব্দে দেওয়ান জয়গোপাল সিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার মৃতদেহ কুকুর, শৃগালে ভক্ষণ করিল, কেহ তাঁহার অগ্নিসংস্কার করিল না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চোত্তালাল দেওয়ান হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ভোলানাথ সেনাপতিরই রহিল। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর সর্ব্বদা মৃগয়ায় গমন করিতেন এবং নাচ, রঙ্গ, তামাসা লইয়া কাল কটাইতেন। কত বাই, ভাঁড়, কথক, কালোয়াৎ প্রভৃতি আসিত তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যহই দেবার্চ্চণা, আনন্দ, উৎসব, প্রভৃতি হইত। সর্ব্বদাই নানাবিধ বাদ্য ও ধ্বজাপতাকা প্রভৃতি উড্ডীন হইত। চারিদিকেই আনন্দ, উৎসব লোকে কোনদিকে কি দেখিবে তাহা স্থির করিতে পারিত না।

মহারাজ এইরূপে পরম সুখে রাজ্য করিতেছেন, এই সময় ঐ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিয়া বেহারের ফৌজদারী আদালতের বিচারের ভার রঙ্গপুরের জজ সাহেবের নিকট হইতে ভূপতিকে অর্পণ করিয়া পত্র লিখিলেন যে, "আপনি সকল কার্য্য নিজ হুকুমে আপন লোক দ্বারা করাইবেন। যদি কোন বিষয় আপনার নিকট দুরূহ বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে কমিশনার সাহেবের দ্বারা

ঐ বিষয় গভর্ণরের কাউন্সিলে জানাইলে, সেখান হইতে উপযুক্ত পরামর্শ লিখিয়া পাঠান হইবে।" মেস্তর মনগমরী সাহেব (Mr. Montgomery) তখন রঙ্গপুরের কালেকটার ছিলেন, তিনি ফৌজদারী আদালতের মোহরাদি ও কাগজ পত্র আনিয়া দিয়া তাহার রসিদ লইলেন এবং শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী আদালতের ও ফৌজদারীর কার্য্য দেওয়ান চেত্তালাল করিতে লাগিলেন। মহারাজের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন রাজা হিন্দুস্থানে আর কেহ রহিল না। ফৌজদারীতে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা লইয়া শাস্ত্রানুসারে বিচার হইয়া অপরাধীদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড প্রদত্ত হইতে লাগিল। অপরাধ বিশেষে মহারাজের নিজ আজ্ঞায় অপরাধীদিগের ফাঁসি ও শূল দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীভূপবাহাদুরের আজ্ঞানুসারে আদালত ও ফৌজদারীর কার্য্য পরিচালিত হওয়ায় রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯৮ রাজশকে ১২১৪ বঙ্গাব্দে মহারাজ সাগর দীঘি নামে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম পাড়ে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং সমারোহ পূর্ব্বক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ঐ দীঘি প্রতিষ্ঠা করিলেন। অদ্যাপি ঐ কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। দীঘির জল এত সুমিষ্ট যে, লোকে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সময় ভোলানাথ জমাদারের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ বেহারের নয় আনা দশ বট অংশ দাবী করিয়া যে নালিশ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে গভর্ণরের কাউন্সিল কর্ত্তৃক এইরূপ নিষ্পত্তি হইল যে, শ্রীশ্রীমহারাজ রাজ্যের একমাত্র মালিক, তাঁহার কেহ অংশীদার নাই। নাজীর দেও মাসিক ৫০০ টাকা খোরাকি পাইবেন এবং তাঁহার বলরাপুরের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে এক২ ক্রোশ করিয়া চারি ক্রোশ ভূমি পাইবেন; সম্পূর্ণ রাজত্ব মহারাজের নিজের অধিকারে থাকিবে। শিবগোবিন্দ মজুমদার যাইয়া নাজীর দেওকে তাঁহার প্রাপ্ত ভূমি চিহ্নিত করিয়া দিলেন। মহারাজ নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ঐ সালে দেওয়ান চোত্তালাল পরলোক গমন করিলে রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী দেওয়ান হইলেন এবং গুরুপ্রসাদ বাবু ফৌজদারীর কর্ম্মকর্ত্তা ও দুলারাম দেওয়ানি আদালতের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ব্রজনন্দন মুস্তফী নিকাশ নবীস নিযুক্ত হইয়া নিকাশের ও খানগীর (মহারাজের নিজস্ব সম্পত্তি) কার্য্যাদি করিতে লাগিলেন, কখন২ দ্বারের কার্য্যও করিতেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহারাজ এইরূপে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ভূপতি মহাবলপরাক্রম ইন্দ্রতুল্য রাজা ও রাবণের ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন এবং মুক্তহস্তে দান বিতরণ করিতেন। নানা দেশ হইতে প্রধান২ লোক সকল আগমন করিয়া ভূপতির আশ্রয় লইয়া কালাতিপাত

করিত। মহারাজ তাঁহাদিগের যথাযোগ্য মাসোহারা নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। নবাব সৈয়দ মহম্মদ রেজা খাঁ মজফর জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র নবাব সৈয়দ মেদি খাঁ—যিনি নবাব জান নামে পরিচিত—ভূপতির আশ্রয়ে চিরকাল ছিলেন। মহারাজও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। রাজসভায় নানা দেশীয় ওমরাহগণ প্রধান২ মুৎসদ্দি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল সর্ব্বদা নানা প্রকার শাস্ত্রীয় আলাপ ও পূর্ব্বকালের রাজা বাদশাহদিগের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে দুই তিন বৎসর অতীত হইলে ৩০১ রাজশকে ১২১৭ বঙ্গাব্দে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় মহারাজ রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ীর উপর অসন্তুষ্ট হওয়ায়, তিনি দেওয়ানি পদত্যাগ করিলেন এবং মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রিয় মন্ত্রী শচীনন্দন মুস্তফীর কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজনন্দন মুস্তফী ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রবিনন্দন মুস্তফীও মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত পদ কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিলেন। ব্রজনন্দন মুস্তফী কিছুদিন ঐ কার্য্য করিলে, গুরুপ্রসাদ রায় নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া ঐ কার্য্য হস্তগত করিয়া দেওয়ান হইলেন। আমাকে তৎকালে খালিগার সেরেস্তাদারি কার্য্যে নিযুক্ত করার সময় হইতে ঐ কার্য্য করিয়া আসিতেছি। দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় মাল, দেওয়ানি ও ফৌজদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দুলারাম দেওয়ানি আদালতের কাজ করিতে থাকিলেন। ভোলানাথ সেনাপতির আধিপত্য ক্রমশঃ ক্ষুণ্ন ও রামপ্রসাদ মুন্সী ক্রমে২ ক্ষমতাপন্ন হইতে লাগিলেন।

৩০২ রাজশকের প্রথমভাগে মহারাজ গুরুপ্রসাদ বাবুকে ডঙ্কা ও নিশান সিরোপা এবং আমিরউল ওমরাও মোদারে মোহাম খেতাব প্রদান করিলেন। গুরুপ্রসাদবাবুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইল। ঐ বৎসরের শেষভাগে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর নেপালের অন্তর্গত বুটেল নামক দেশের রাজদুহিতাকে আনিয়া বহু সমারোহে বিবাহ করিলেন, তাঁহার উপাধি হইল শ্রীশ্রীমতী বড় মহারাণী। দেওয়ান দেও পুনরায় মহারাজের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিলেন এবং হরেশ পূজারী পূর্ব্বদণ্ডের বিষয় বিস্মৃত হইয়া মহারাজের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করায় ভূপতি তাহাকে কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখেন তাহার পর তাহার মৃত্যু হয়। এই কারণে দেওয়ান দেও রঙ্গপুরের কালেক্টার ডিগবিস (Digby) সাহেব দ্বারা ভূপতির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সদরে উপস্থিত করিলেন। ৩০১ রাজশকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালে রাজবাড়ীতে অত্যন্ত ভৌতিক উপদ্রব হওয়ায় শ্রীশ্রীমহারাজ সিঙ্গাজানী মওয়ামারী, দুই তালুকের মধ্যস্থিত ভেটাগুড়ি নামক নদীর ছাড়ার মধ্যে নূতন রাজধানী ও অতি সুন্দর রাজবাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজপ্রাসাদ, মন্ত্রীর অট্টালিকা ও নানা প্রকার বিচিত্র মন্দির সমূহ নির্ম্মিত হইল এবং বেহার নিবাসী যাবতীয় লোক ভেটাগুড়ি গমন করিয়া আপন২

যোগ্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বাসস্থান প্রস্তুত করিল। অগ্রহায়ণ মাসে কার্ত্তিক পূর্ণিমায় রাস যাত্রার দিবস সন্ধ্যাকালে ভূপতি স্বজনসহ নূতন আবাসে গমন করিলেন। শত২ সওয়ারিতে অশ্বে ও গজে আরোহণ করিয়া লোক চলিতে লাগিল। জটোদকা (যাহাকে লোকে মানসাই বলে, উত্তীর্ণ হইয়া শুভলগ্নে মহারাজ আবাসে প্রবেশ করিলেন। সেই খানেই রাসযাত্রা হইল। দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় অন্যান্য কার্য্যকারকগণের সহিত গোসাঞীগঞ্জে থাকিলেন। অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ, সদাগর, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আদি সহস্র২ লোক ভেটাগুড়িতে বাস করিতে লাগিল। রাজপথ, দীঘি, দেবালয় ও পুষ্পবাটীকাদি দ্বারা সহর সুশোভিত হইয়া কিছুকাল মধ্যেই ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইল। ভূপতি পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। দেওয়ান দেওয়ের নালিশ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ডিগবী সাহেব সদর হইতে প্রেরিত হইয়া, তাঁহার দেওয়ান রামমোহন রায় সহিত আসিয়া ভেটাগুড়ির অপর পারে অবস্থান করিলেন। ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিরোধ মিমাংসা করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। গুরুপ্রসাদ বাবু সিপাহী, বরকন্দাজ, চোপদার, প্রভৃতি সহ মহাসমারোহে, সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাহেবের আদেশক্রমে এক চাপরাশী আসিয়া বলিল যে, "সাহেবের ইচ্ছা আপনি অল্প লোক লইয়া তাঁহার নিকট যান, এত সমারোহ করিয়া যাইবেন না।" ইহাতে দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় তাহাকে গালি দিলেন। তখন সাহেবের সোঁটাবরদার আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি নিজে সোয়ারি সমেত সাহেবের নিকট যাইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত লোক জন এইখানে থাকিবে, নতুবা সাহেবের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে না।" ইহা শুনিয়া দেওয়ান গুরুপ্রসাদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সাহেবের রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন এমন কি, তাঁহারা লোক পাঠাইয়া ভেটাগুড়ি হইতে যাহাতে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিতে না পারেন তজ্জন্য পারাপারের খেয়া নৌকা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। ডিগ্‌বী সাহেব ও রামমোহন রায় মোগলহাট হইতে রসদ আনাইয়া দুই তিন দিন তথায় থাকিয়া রঙ্গপুর চলিয়া গেলেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেওয়ান গুরুপ্রসাদ রায় পরে রঙ্গপুর যাইয়া এই বিবাদ মিমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, সাহেবের ক্রোধ শান্ত হইল না। তিনি সদরে এই বিষয় জানাইলে তথা হইতে সকল বিষয় তদন্ত করিবার জন্য ১২২০ সালের পৌষ মাসে ত্বরমান মেকনোট সাহেব (Mr. Norman Mac Leod) বেহারে আগমন করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মৌলভী আসমত উল্লা খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। এই সময় সদরের অভিপ্রায় অনুযায়ী গুরুপ্রসাদ বাবু ও রমেপ্রসাদ মুন্সী উভয়ে দেওয়ান দেওয়ের সহিত বিবাদ আপোষ মিমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সাহেব মৌলভীর কুপরামর্শে নিজেই ফৌজদারীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গুরুপ্রসাদ

বাবুর জবানবন্দী লইয়া তাঁহাকে বেহার হইতে রঙ্গপুরে পাঠাইলেন ও রামপ্রসাদ মুন্সীকে কিছুদিন এখানে হাজতে রাখিয়া পরে রঙ্গপুরে পাঠাইয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী দেওয়ানি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দুই কোম্পানী সিপাহী দুইটি কামান ও গোরা সৈন্য সহ সাহেব ভেটাগুড়ি নদীর তীরে রাজবাড়ীর সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক মহারাজকে পত্র দিলেন যে 'মহারাজ যেন তাঁহার নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ করেন।' তৎকালে রাজসরকারের সাত কোম্পানী সিপাহী ছিল, তন্মধ্যে পূর্ব্বতন কোম্পানী বাদে অবশিষ্ট সিপাহীদিগকে বেতন দিয়া এবং পূর্ব্বের বাকী বেতন পরে পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাদিগের বন্দুক, কার্ত্তুজ প্রভৃতি লইয়া সাহেব তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেন। তৃতীয় দিবসে মহারাজ নদী পার হইয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তোপখানা ও সিপাহী সমেত সাহেব আসিয়াছেন, কি জানি মহারাজের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন—এই মনে করিয়া সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। বেহারে সে দিবস এমন কোন লোক ছিলনা যাহার চক্ষু হইতে অশ্রু পতিত হয় নাই। সাক্ষাৎকার হইলে সাহেব মহারাজকে বলিলেন, "গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর আপনার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আপনি যদি বিচার বিভাগ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইবেন।" "বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব।" এই বলিয়া মহারাজ রাজবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ম্যাক্ লিওড সাহেব ঐস্থানে অবস্থান করিয়া মহারাজকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন ও বহুবিধ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ভূপতি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সাহেবের নির্দ্দেশমত পত্র লিখিয়া ফৌজদারী আদালতের মোহর সাহেবকে দিলেন। সাহেব ফৌজাদারীর মোহর হস্তগত করিয়া মহারাজকে বলিলেন, "দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি। ইনি কার্য্যের উপযুক্ত নহেন, মৌলভী আসমত উল্লা খাঁকে দেওয়ান করুন।" মহারাজ এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় সাহেব দেওয়ানকে বলিলেন, "তুমি এখানে থাকিতে পারিবেনা, অন্যত্র যাও" এবং আমাকে বলিলেন, "তোমার এখানে থাকা আমি পছন্দ করিনা।" লাহিড়ী দেওয়ান ও আমি ভূপতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া রঙ্গপুরে প্রস্থান করিলাম। হুজুর আদেশ করিলেন, "তোমরা রঙ্গপুর হইতে এই সকল বিষয়ের প্রতিকারের চেষ্টা কর।" বেহারে খানগীর (মহারাজের নিজস্ব) মহালের কার্য্যই কেবলমাত্র মহারাজের আজ্ঞাধীন থাকিল। মালের যাবতীয় কার্য্য, শ্রীযুক্ত বড় কাছুয়া সাহেবকে উপলক্ষ মাত্র রাখিয়া, আসমত উল্লা খাঁই করিতে লাগিলেন। সাহেব স্বয়ং ফৌজদারীর কার্য্য করিতেন। রাজদ্বারে কেহ থাকিতে সাহস করিত না। যদি কেহ সরকারের পক্ষে কোন কথা বলিত তাহা হইলে সাহেব তাহাকে ধরিয়া লইয়া দিনহাটায় কয়েদ করিয়া রাখিতেন। গোরা সৈন্যগণ রাজধানীতে আসিয়া নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। নৃপতি ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া

কেবল বিপদভঞ্জিনী শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ঈশ্বরীর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।" সাহেব যে সকল পত্র দিতেন তাহার কোন উত্তর দিতেন না, বলিতেন, "আমার মুৎসদ্দী নাই, কে উত্তর লিখিবে?" সাহেব সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে দেখা করিতেন না। দিনহাটায় কুঠি তৈয়ার করাইয়া সাহেব দুই কোম্পানী সিপাহীসহ তথায় দুই বৎসর কয়েক মাস অবস্থান করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

লাহিড়ী দেওয়ান ও আমি রঙ্গপুরের অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমরা কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম না। বেহারের কর্ম্মচারীরা কেহ আমাদিগের সহিত আলাপ করিত না, বলিত 'ম্যাকলিওড সাহেব ক্রুদ্ধ হইবেন।' এই সময় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা পশ্চিমে গিয়াছিলন। নিওরনোট সাহেব, ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার নিকট এক পত্র প্রেরণ করা হইল এবং লর্ড ময়রার বরাবর এক পত্র দিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীকে পাঠান হইল। রাসবিহারী সরকার কলিকাতার উকিল ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেণ্ট সাহেব উত্তর দিলেন যে, 'ম্যাকলিওড সাহেব যাহা কিছু করিয়াছেন, সবই সদরের অভিপ্রায় অনুসারে, সুতরাং তাহার কোনরূপ অন্যথা হইবে না।' লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী কানাপুরে যাইয়া লাট সাহেবকে ঐ পত্র দেওয়ায় তিনি আদেশ দিলেন যে, "যদিও ম্যাকলিওড সাহেব সদরের আজ্ঞানুসারে- কার্য্য করিতেছেন তথাপি ঐ সকল বিষয়ের তদন্ত হওয়া উচিত।" রাসবিহারী সরকার বিদায় না লইয়াই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া রহিলেন। রমানাথ লাহিড়কে হুজুরের পত্র সহ কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। এই সময় এবনেণ্ট সাহেব ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তিনি ম্যাকলিওড সাহেবের ভায়রা এবং ম্যাকলিওড সাহেবের মেম সেই সময় কলিকাতায় যাইয়া ইঁহার বাটীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। রমানাথ লাহিড়ী হুজুরের পত্র প্রদান করিলে উত্তর দিলেন যে, "এই সকল বিষয়ের উত্তর পূর্ব্ব পত্রেই দেওয়া হইয়াছে, তুমি এই স্থান পরিত্যাগ কর।" লাহিড়ী উত্তর দিলেন, "আমি আপনার আদেশে এখানে আসি নাই, আমার মনিব মহারাজ আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার বিনা আজ্ঞায় যাইতে পারি না।" সাহেব বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" ম্যাকলিওড সাহেবের প্রার্থনা অনুসারে রঙ্গপুরের জর্জ ডিবটী ইসকাট (Mr. David Scott) সাহেবের উপর আদেশ আসিল যে, "রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী ও গুরুপ্রসাদ বাবু রঙ্গপুরে থাকিয়া মহারাজকে কুমন্ত্রণা দিতেছে, তাহাদিগকে যেন রঙ্গপুরে থাকিতে দেওয়া না হয়।" গুরুপ্রসাদ বাবু স্থানান্তরিত হইলেন লাহিড়ী দেওয়ান কোন প্রকারে রহিয়া গেলেন।

লর্ড ময়রার পশ্চিম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইলে ম্যাকলিওড সাহেব যেরূপ অত্যাচার করিয়া ফৌজদারী আদালত কোম্পানীতে দেওয়ার পত্র মহারাজকে দিয়া লিখাইয়া লইয়াছিলেন এবং এই রাজ্যের উপর তিনি ও তাঁহার দেওয়ান যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন লাট সাহেবের নিকট ক্রমে২ ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত পত্র প্রেরণ করা হইল। তিতোলিয়ার মেজর সাহেবও সদরে এক পত্র দ্বারা জানাইয়া ছিলেন যে, "বেহারের মহারাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করেন না এবং কোম্পানীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত সৈন্য ও তাঁহার নাই। তথাপি ম্যাকলিওড সাহেব দুই কোম্পানী সিপাহী ও তোপখানা তথায় রাখিয়া রাজার উপর অত্যাচার করিতেছেন।" অবশেষে লর্ড ময়রা কলিকাতায় আগমন করিলে, রামানাথ লাহিড়ীর যোগে হুজুরের পত্র ও ইংরাজি দরখাস্ত লর্ড সাহেবের সমীপে উপস্থিত করা হইল। ইহাতে সেখানকার সেক্রেটারী সাহেব লাহিড়ীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। যাহাহউক, ভূপতির রাশিতে দুই বৎসরের জন্য যে কুগ্রহ বিরাজ করিতেছিল তাহার অবসান হইয়া শুভগ্রহেয় উদয় হইল। লাট সাহেব ঐ সকল পত্র দুই দিবস কাউন্সিলে বিবেচনা করিয়া ম্যাকলিওড সাহেব যে অত্যাচার করিয়া রাজকার্য্য নিজের অধীন করিয়া লইয়াছেন তাহা তাহা অবগত হইয়া হুকুম দিলেন যে, "মহারাজ নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা ফৌজদারী আদালতের কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন ম্যাকলিওড সাহেব ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। নিরূপিত 'লালবন্দী' যথাসময়ে প্রদত্ত হইল কিনা ইহা দেখাই তাঁহার মুখ্য বিষয়।" এই সংবাদ যেদিন রঙ্গপুরে পাইলাম, মনে হইল জীবনে ঐরূপ আনন্দের দিন আর হয় নাই। রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী তৎক্ষণাৎ বেহারে লোক পাঠাইলেন। ম্যাকলিওড সাহেব সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে এই সংবাদ প্রকাশ করা নিষেধ ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর প্রথম আজ্ঞা দিলেন যে, এই সংবাদ যেন প্রকাশিত না হয় কিন্তু শত্রু নির্য্যাতিত হওয়ায় ও সরকারের মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় আনন্দে উল্লসিত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে না পারিয়া বাজারে যত সন্দেশ ও মিষ্টান্ন ছিল সব আনিয়া দেবালয়ে ভোগ দিতে আদেশ দিলেন এবং ছয় দণ্ড রাত্রিকালে সভায় বসিয়া নৃত্য দেখিতে লাগিলেন এবং সেই সময় হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত একশত তোপ ধ্বনি হইল। ইহাতে দুই প্রহরের পথ পর্য্যন্ত অধিবাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ম্যাকলিওড সাহেব যাহা ঘাটিয়াছে, মনে২ তাহা অনুমান করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি মহারাজের সহিত একটি আপোষ মিমাংসা করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন, এক্ষণে সেই চেষ্টা আরও বৃদ্ধি পাইল। যথাকালে তিনি পত্র পাইলেন। লাহিড়ী দেওয়ানকে পত্র দ্বারা রঙ্গপুর হইতে আনাইয়া রাজবাড়ী ও দিনহাটার মধ্যস্থলে পুটিমারী তালুকে তাম্বু উঠাইয়া ৩০৭ রাজশকে (১২২৩ বঙ্গাব্দে) উভয়ে সাক্ষাৎকার হইয়া, সাহেব দেওয়ানকে সদরের পত্র এবং ফৌজদারী আদালতের মোহর প্রত্যর্পণ করিলেন। ভূপতি সকল কার্য্যের ভার লাহিড়ী

দেওয়ানের উপর অর্পণ করিয়া তাঁহাকে হস্তী ঘোটকাদি নানা প্রকার শিরোপা প্রদান করিলেন। দেওয়ানি আদালতের কার্য্য শ্রীযুক্ত বড় সাহেব করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পর ম্যাক্লিওড সাহেব রঙ্গপুরের জজ সাহেবের সহিত কার্য্য বদল করিয়া রঙ্গপুরের জজ হইলেন এবং ইশকাট সাহেব (Mr. Scott) বেহারে আসিলেন। ম্যাক্লিওড সাহেব যখন সকল বিষয় মহারাজকে প্রত্যর্পণ করিলেন তখন রাজ সরকারের নিকট কোম্পানী বাহাদুরের লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। ক্রমেঃ ঐ টাকা পরিশোধিত হইল। রামপ্রসাদ মুন্‌শী মুক্তিলাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রতিপত্তি সহ কাজ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীভূপবাহাদুর সর্ব্বদা নৃত্য, গীত, আনন্দ উৎসবে কাল ক্ষেপণ করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

১২২৭ সালে বড় মধ্যম আই স্বর্গলাভ করিলেন। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায় সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ৩১০ রাজশকে (১২২৬ বঙ্গাব্দে) সাহেব তাঁহাকে ফৌজদারীর আহেলকারী ও খানগীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, লাহিড়ী দেওয়ানের নিকট কেবল বেহারের খালিশার, চাকলাজাতের এবং আপীলের কার্য্যের ভার থাকিল। এই সময় রাজলক্ষ্মী শ্রীমতী ঈশ্বরী আই কাশী হইতে বেহারে আগমন করিলেন। ঐ স্থলে জীবেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান কুঙর পরলোক গমন করায় ও তাঁহার পুত্র শৈলেন্দ্রনারায়ণ কুঙর দেওয়ান দেও হইলেন। ১২২৮ সালে হরিপ্রসাদ রায় দেশে গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌর বাবু খানগীর কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং রামরত্ন মুন্‌শী ফৌজদারীর কার্য্য ও দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীচন্দ্র বাবু শুভ পুণ্যাহ করিয়া দেওয়ানি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বৎসরের শেষ ভাগে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর শ্রীশ্রী৺গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে মানসাই নদীর উত্তর তীরে রত্নপীঠ মধ্যে, ধলিয়াবাড়ীতে যে স্থানে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের আবাস ছিল, সেই স্থানে নূতন রাজবাটী ও রাজধানী করিবার আদেশ দিয়া গেলেন।

পিনিস, বজরা, লালডিঙ্গি, পনওয়ার, উলাক, পাটেলী, জঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ ও অসংখ্য নৌকা মহারাজের সঙ্গে চলিল। যে স্থানে ঐ সকল নৌকা লাগান হইত তথায় হাট বাজার বসিত ও নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া লোক উপস্থিত হইত। নদীর দুই তীরের লোক সমারোহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। ঐ বৎসর রামপ্রসাদ মুন্‌শীর মৃত্যু হইল। বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সীর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনাথ বক্সীর পুত্র শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বক্সী মহারাজের ওয়াকানবিশী অর্থাৎ মুন্‌শীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সকল রাজকার্য্যের আধিপত্য দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ীর রহিল। মহারাজ ফাল্গুন মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাতীরে নানা প্রকার দান বিতরণ করিয়া তিনি আষাঢ় মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সকলে প্রত্যুদ্গমন করিয়া মহারাজকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। মহারাজ পরমানন্দে ধলিয়াবাড়ীতে আগমন করিলেন এবং কয়েক দিনের জন্য নূতন বাটীতে প্রবেশ না করিয়া নদীর তীরে একটি ছোট আবাস স্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করায়, সেই স্থানের নাম হইল জিরানপুর। পরে এক দিবস শুভ লগ্নে মহারাজ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে নানাবিধ অট্টালিকা ও বিচিত্র মন্দির সমূহ নির্ম্মিত হইল এবং ভেটাগুড়িতে যে সহর ও বন্দর হইয়াছিল, তৎসমুদয় উঠিয়া আসিলে ধলিয়াবাড়ী একটি সুন্দর সহরে পরিণত হইল। ১২২৯ সালে ভেটাগুড়িতে শুভ পুণ্যাহ হইয়া ধলিয়াবাড়ীতে গোলকস্থমার হইল। ঐ বৎসর অতিবৃষ্টি হইয়া এরূপ জলপ্লাবন হইল যে, ঐরূপ প্লাবন সচরাচর দেখা যায় না। মাঘ মাসে দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী হুজুরে বিদায় লইয়া দেওয়ানী কার্য্যে কালীচন্দ্র লাহিড়ীকে নিযুক্ত করিয়া কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে লোকে ছোট বিশ্বেশ্বর বলিত। সেই হইতে কালীচন্দ্র লাহিড়ী স্বয়ং দেওয়ান হইলেন।

১২৩০ সালে শ্যামচন্দ্র রায়ের পুত্র গোকুলচন্দ্র রায় বেহারে আসিয়া দেওয়ানি আদালতের আহেলকার ও খানগীর নিকাশনবাসী নিযুক্ত হইলেন। চাকলাজাতের ও মালের নিকাশ নবীসের কার্য্যে পরমানন্দ বাবু নিযুক্ত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত বড় সাহেব সেই সময় হইতে আপীলের কার্য্য করিতে লাগিলেন। মহারাজ ভূপবাহাদুর একটি গুজরাটি কন্যা আনিয়া বিবাহ করিলেন। ধলিয়াবাড়ীতে অতি সুন্দর একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। কিছুদিনের জন্য, লোকনাথ রায়, ফৌজদারী আদালতের কার্য্য করিতেছিলেন, দেওয়ান হরিপ্রসাদ রায় ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ ফৌজদারীর আহেলকার হইলেন। তিনি বিশেষ প্রতাপশালী ও বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। ফৌজদারীর কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। আদালতের কর্ম্মকর্ত্তা গোকুলচন্দ্র রায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা গৌরাঙ্গচন্দ্র রায় আহেলকার হইলেন। তাহার পর হইতেই আদালতের কার্য্যে নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইল। ১২৩৩ সালে দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্রকে দেওয়ানি কার্য্যে নিজ স্থলভিষিক্ত রাখিয়া ভূপতির আজ্ঞানুসারে টাঁকশাল উদ্ধারের জন্য কলিকাতায় যাইয়া গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বহু সম্মান লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর পর বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইনি সেকেন্দর বাদশাহের উজির এরিষ্টটলের (Aristotle) ন্যায় অতিশয় মন্ত্রণাকুশল ছিলেন।

বৈদ্যরাজ রাজবল্লভের প্রপৌত্র নিত্যানন্দ বাবু হুজুরের আশ্রয়ে চিরকাল ছিলেন, মহারাজ তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মানে রাখিলেন। দিল্লীর বক্তা আক্তার শাহজাদা মহারাজের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, মহারাজ তাঁহার যোগ্য লৌকিকতা প্রদান করিয়া সসম্মানে বিদায় দিলেন। ইরাণের উজিরের পুত্র নবাব মহম্মদ হোসেন খাঁ এখানে আসিয়া কিছু দিন ছিলেন, তাঁহাকেও মহারাজ শাল, নগদ টাকা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিলেন। গোরখপুর হইতে হাকিম কায়েমানিকে আনাইয়া চাকুরীতে নিযুক্ত করিলেন। কবিরাজদিগের মধ্যে কাশীনাথ কবিরাজের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ তৎকালে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, হাকিমি চিকিৎসায় কায়েমানিও সেইরূপ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ছিলেন। নৃপতি গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে শিবপ্রসাদ• বক্সী দ্বারের যাবতীয় কার্য্যের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছিলেন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান, ধীর, ধর্ম্মপরায়ণ এবং রাজা ও প্রজা উভয়ের হিতকারী ছিলেন। ভূপতি তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন এবং রাজকার্য্যে অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর জন্মস্থান বেহারে নূতন রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া ৩১৯ রাজশকে (১২৩৫ বঙ্গাব্দে) আত্মীয় পরিজন সহ আগমন করিয়া বাস করিতে লাগলেন। নানা প্রকার বিচিত্র মন্দির ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। রাজবাটী ও রাজধানী পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ হইল। পৃথক২ কাছারী সমূহ নির্ম্মিত হইল। কোন স্থানে চাকলাজাত, কোন স্থানে খানসী, কোন স্থানে আদালত, কোথাও বা ফৌজাদারীর কার্য্য হইতে লাগিল। সুদৃশ্য আস্তাবল, পীলখানা, গোখানা প্রভৃতি প্রস্তুত হইল। দ্বারের সম্মুখে তিন কোম্পানী সিপাহী ও জগন্নাথ সিংহ রেসালদারের কোতগারদ নির্ম্মিত হইল। অন্তঃপুরের দক্ষিণ পার্শ্বে মনোহর পুষ্পোদ্যান ও তন্মধ্যস্থিত বিলাস ভবন সমূহ ঝাড়,লণ্ঠন ও সুদৃশ্য পটাদিতে সুসজ্জিত হইল। বহির্ভাগে তোরণ পার্শ্বে নহবৎখানা ঘড়িখানাদি স্থাপিত হইল। ঐ দ্বার হইতে বহির্গত রাজপথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য বণিক ও ব্যবসায়ীদিগের বাসস্থান নির্ম্মিত ও অতি সুন্দর বাজার স্থাপিত হইল এবং ঐ পথের উত্তর পার্শ্বে মন্দির সমূহ নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্যান্য পথের পার্শ্বে কার্য্যকারক ও মন্ত্রিবর্গের বসতবাটী নির্ম্মিত হইল। এইরূপে রাজাধিরাজ মহারাজ অসংখ্য প্রজাবৃন্দ সহ পরম সুখে রাজধানীতে বাস করিতে লাগিলেন। প্রধান রাজপুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ কুঙর বড় সাহেব, রাজবাড়ীর অব্যবহিত উত্তরে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া ও উত্তম আবাসাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেবও শ্রীযুক্ত বজেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেবও যাথাযোগ্য আবসাদি প্রস্তুত করাইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। পুরাতন বেহার রাজধানীতে আগমন করিবার পর ৺ ছোট মধ্যম আই ও মধ্যম মহারাণী স্বর্গারোহণ করিলেন।

৺ কাশীর আই পূর্ব্বে দুর্গামূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন পরে বামণহাট মোকামে আদ্যাশক্তি ও গুঞ্জাবাড়ীতে জলাশয় খনন করাইয়া তাহার তটে উত্তম মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অন্যান্য আই মাতারা নিজ২ কামনানুসারে বিগ্রহ সকল প্রতিষ্ঠা ও যথাযোগ্য সেবার ব্যবস্থা করিলেন। ৩২২ শকাব্দে ও ১২৩৮ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রী৺মহারাজ ভূপ বাহাদুর মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মিত করাইয়া তন্মধ্যে মনোবাঞ্ছানুরূপ অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারিনী, বিজ্ঞান দায়িনী, আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী নাম রাখিলেন এবং সেবা পূজার এরূপ বহুল ব্যবস্থা করিলেন যে, তাহার বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ঐ মূর্ত্তি দর্শনে পরম আনন্দ ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। প্রায় নিয়তই পর্ব্ব পূজার ন্যায় পূজা হইতে লাগিল। ভূপতি ঐ দেবালয়ের পশ্চাৎভাগে জলাশয় খনন করাইয়া তাহার তীরে সুদৃশ্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রায়ই তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কখনও২ মন্দিরের সম্মুখভাগে আসিয়া গায়কদিগের গীত প্রসিদ্ধ শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তদ্গত চিত্তে আনন্দাশ্রু পরিপূর্ণ লোচনে জগন্মাতা আনন্দময়ীকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিতেন এবং সর্ব্বদা কালী স্মরণ, কালী মনন, কালী ধ্যান, কালী জ্ঞান ও সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার শরণ ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। মহারাজ এইরূপ ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। আমার কি শক্তি যে, আমি সেই অপরূপ ভাব বর্ণনা করি।

বেহারে মহারাজের শুভাগমন অবধি, রাজ দরবার সংক্রান্ত যে সকল বিষয় উপস্থিত ও তাহার যেরূপ ব্যবস্থা হইল তাহা বিবৃত করিতেছি। আদালতের কর্ম্মকর্ত্তা গৌরাঙ্গচন্দ্র রায়ের অভাবে তাঁহাদিগের পরিচিত রামসুন্দর রায় নামক একব্যক্তি ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে২ অজ্ঞাতসারে দেশান্তর হওয়ায় টেপার জমিদার মহাদেব রায় খাসনবীসের বংশীয় তারিণীমোহন রায় উক্ত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসর কোন প্রকারে কার্য্য করিবার পর কর্ম্মচ্যুত হইলে ১২৩৯ সালে শ্রীশ্রী৺মহারাজ ভূপ বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ীকে আদালতের ভারার্পণ করিলেন। তিনি স্বীয় কর্ম্ম দক্ষতা দ্বারা আদালত সংক্রান্ত অনেক সুনিয়ম প্রচলন করিয়া কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইলেন। সেই সময় হইতে আদালতের ক্রমশঃই উন্নতি হইতে লাগিল। ঐ সনের ফাল্গুন মাসে বৃদ্ধ বয়সে দেওয়ান হরিপ্রসাদ রায় পরলোক গমন করায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র গুরুচরণ রায় ফৌজদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহা যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

এই রাজ্যের বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য দণ্ড বিবেক, বিবাদ চিন্তামনি ও দায়ভাগ প্রভৃতির ব্যবস্থানুযায়ী সুরীতি ও সুবিচারের সহিত নিষ্পন্ন হওয়ায় প্রজার উন্নতি রাজ্যের মঙ্গল এবং রাজকোষের সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময় কোম্পানী বাহাদুর সদর হইতে হিন্দুস্থানের মিত্র রাজাদিগের রাজ্যে তৎদেশীয় মুদ্রা প্রচলন বন্ধ করিয়া সিক্কা টাকা

প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে শ্রীশ্রী৺মহারাজ ভূপ বাহাদুরের নিকটও নারায়ণী মুদ্রা চলন বন্ধ করিয়া সিক্কা টাকা প্রচলনের বিষয়ে পত্র আসিল। মহাভূপ নারায়ণী মুদ্রা চলন রহিত করিলে দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও নিজ অতুলনীয় রাজশকাব্দের ও স্বীয় গৌরব হানির বিষয় শ্রীল শ্রীযুক্ত এজেণ্ট সাহেব দ্বারা সদরে জ্ঞাপন করিলেন শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর ভূপতির প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া মহারাজের নামে চলিত নারায়ণী মুদ্রা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত থাকার অনুমতি দিলেন, ফলে সকল প্রকারে মহারাজের সম্মান ও সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রহিল।

এই সনে দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় ৺কাশীধামে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। ভূপতি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন। এই সময় আমি রাজোপাখ্যনের এই পর্য্যন্ত রচনা করিয়া শ্রীশ্রী৺মহারাজ ভূপ বাহাদুরের অবলোকনার্থ প্রদান করায় রাজাধিরাজ মহারাজ ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রসন্ন বদনে, মধুর বচনে আমাকে বলিলেন, "আমার পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন রাজাদিগের কীর্ত্তিচন্দ্র কালরাহুগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তোমার প্রচেষ্টায় ঐ সকল লুপ্ত কীর্ত্তি পুনরায় চিরস্থায়ী হইল। আমি ইহাতে অতীব আনন্দ লাভ করিয়া তোমার শ্রমসাফল্যজনিত বিশ্বসিংহবংশীয়রাজাদিগের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনের সম্মানার্থে, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগার্থে, তোমাকে পঞ্চগ্রাম ভূমি লাখেরাজ পুরস্কার দিলাম।" মহারাজ আরও বলিলেন, "এই গ্রন্থে, আমার জীবনকালের অবশিষ্ট অংশ তোমাকে অবশ্যই লিখিতে হইবে।" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম, "বাল্যকাল হইতে হুজুরের সেবা করিয়া বর্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে পাদপদ্ম সমক্ষে দেহত্যাগ হইলেই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইল জ্ঞান করিব। ধর্ম্মাবতারের অন্তিমকাল দর্শন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতির ফল বলিয়াই মনে করি।" মহারাজ উত্তর দিলেন, "তুমি যথার্থ বলিয়াছ, কিন্তু আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে।" অতঃপর পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞানুসারে ঐ পঞ্চগ্রাম ভূমির লাখেরাজি সনন্দ পারস্য ও বাঙ্গলা ভাষায় লিখাইয়া তাহাতে স্বহস্তে দস্তখত ও নিজ নামের মোহরাঙ্কিত করিয়া আমাকে অর্পণ করিলে। অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই পুস্তক মহারাজ শ্রীশ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের হুজুরে দাখিল করা হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশতি অধ্যায়

ভূপতির আজ্ঞানুসারে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনবৃত্তান্ত ধারাবাহিকরূপে পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে লিখিত হইল, আপনারা শ্রবণ করুন। মহারাজ অখিল জন সমূহের হিতার্থে আনন্দময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া ক্রমশঃ নিজে ঐহিক সুখ হইতে নিবৃত্ত হইতে

লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার বিষয় বৈরাগ্য এরূপ প্রবল হইল যে, নিরন্তর বিশ্বেশ্বরের দর্শন চিন্তায় তদ্গতচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা সংসারত্যাগী, মুমুক্ষু দণ্ডী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট কাশীর গুণকীর্ত্তন ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন; ফলে যে দেহ নানা সুগন্ধি দ্রব্যে আমোদিত ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতিতে নিয়ত ভূষিত থাকিত, সেই শরীর বিভূতিমণ্ডিত হইয়া বিমলিন হইল এবং যে দেহ পূর্ব্বে উজ্জ্বল মণিমুক্তাদির হারে সুশোভিত হইত এক্ষণে তাহা রুদ্রাক্ষমালাবিজড়িত হইল। ভূপতির পার্শ্বে যে২ স্থানে মন্ত্রিবর্গ উপবেশন করিতেন এক্ষণে সেই স্থান উলঙ্গ উদাসীনগণ অধিকার করিলেন। এই-রূপভাবে কিছুকাল অতীত হইলে, শ্রীশ্রী৺কাশীক্ষেত্রে যাত্রার দিবস অবধারিত করিয়া গমনানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মহামন্ত্রী দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়দ্বয়কে আদেশ দিলেন। তাঁহারা আজ্ঞানুসারে যাবতীয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রথমে গৌহাটীর শ্রীযুক্ত এজেণ্ট সাহেব দ্বারা শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে যাত্রার অনুমতি ও ছাড় পত্র আনাইলেন তৎপর নানাদেশ হইতে পিনিস, বজরা, লালডিঙ্গী, পানোয়ার, পাটেলা, উনাক, পানসী ও ভাওয়ালী প্রভৃতি বহু প্রকার নৌকা আনাইয়া সুসজ্জিত করিয়া ঐ সকল নৌকায় যাবতীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও যাত্রীদিগের যাথাযোগ্য স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া নহবৎখানা, ঘড়িখানা, তোপখানা, ফরাসখানা, তোসাখানা, জওহরখানা ও জবগবখানা প্রভৃরি জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সিপাহী, বরকন্দাজ, পাহলোয়ান, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, আরদালী, তুরুকসওয়ার, আশাবরদার, সোঁটাবরদার, চোপদার, বর্শাবরদার ও বল্লমবরদারদিগের মধ্যে কতক সঙ্গে যাইবার ও অবশিষ্ট রাজধানীতে থাকিবার আদেশ দিলেন। ভূপতির আঠারপালার খেদমদগার অর্থাৎ বোকনাধরা, ঝারিধরা, খাঁড়াধরা, দণ্ডধরা, নিশানধরা ইত্যাদি সকলে সঙ্গে চলিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তার্কিক, বৈয়াকরণ, পুরাণপাঠক, স্মার্ত্ত জ্যোতিষী প্রভৃতি পৃথক২ নৌকায় আরোহণ করিলেন। শ্রীশ্রী৺চলন্তা মদনমোহন ঠাকুরের যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। যে সকল গায়ক, হুজুরের রচিত ভবানী বিষয়ক সঙ্গীত গান করিত, তাহারা মহারাজের অনুগমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। মন্ত্রিবর্গ মধ্যে কেহ২ সঙ্গে যাইবার, কেহ২ কিছুদূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজপুত্র শ্রীযুক্ত বড় সাহেব শ্রীযুক্ত ছোট সাহেব এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহেব সঙ্গে চলিলেন। রাজকার্য্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া মহারাজ সরবরাহকারের পদে শ্রীযুক্ত বজ্রেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে নিযুক্ত করিলেন। আদালতের কর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই শ্রীযুক্ত বড় সাহেব করিতেছিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মহারাজ ফৌজদারী আদালতের উপর দায়রা আদালত স্থাপিত করিয়া তাহার কর্ম্ম সম্পাদনের ভারও শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের উপর অর্পণ করিলেন, কিন্তু উভয় সাহেবই রাজত্বের যাবতীয় কার্য্য যেন মন্ত্রিবর্গের

পরামর্শানুসারে করেন, ইহাই মহারাজের অভিপ্রায় ছিল। ভূপতি প্রস্থান করার পর সেই নিয়মমতই যাবতীয় কার্য্য হইতে লাগিল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে উনবিংশতি অধ্যায় ॥ ১৯ ॥

বিংশতি অধ্যায়

৩২৬ রাজশকের (১২৪২ বঙ্গাব্দে) ২৪শে মাঘ তারিখে রাজাধিরাজ নিজরাজ্য ও মহৈশ্বর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রী৺কাশীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে স্বজন পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। শ্রীশ্রীমতী বড়মহারাণী শ্রীযুক্তা কাশীরআই ও শ্রীযুক্তা নাগেশ্বরীআই সহচরী পরিচারিকাদিসহ গমন করিলেন। মহারাজ বেহারে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গমন করায় পৌরজনের হাহাকার ও ক্রন্দনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বেহার নিবাসী যাবতীয় লোকের আনন্দ ও উৎসাহ মহারাজের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গেল। রাজধানীর দক্ষিণে বড়াই বাড়ীর নিকট খারিজা তালুক রাশীডাঙ্গাতে এলাজান নদীর মধ্যে নৌকার বহর লাগান ছিল। নদীর তটে কয়েকখানি ঘর উঠাইয়া তাহাতে অবস্থান করিয়া মহারাজ যাবতীয় দ্রব্যাদি নৌকায় উঠাইতে আজ্ঞা দিলেন এবং নৌকাসমূহের অগ্রপশ্চাতের শৃঙ্খলা স্থির করিয়া দিবার আদেশ দিলেন। অষ্টাহ পর নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক রাজপতাকা উড্ডীন করিয়া ও ডঙ্কা ধ্বনি করিয়া নৌকা খুলিবার আজ্ঞা দিলেন। নহবৎ, রোসন চৌকি প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্য হইতে হইতে লাগিল। সিপাহীদিগের গারদে তম্বুর বাঁশী, জয়ঢক্কা ও বিউগুল বাজিতে লাগিল ও একবিংশতি বার তোপধ্বনি হইল।

এইরূপে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে স্থানে২ বহর লাগান হইত এবং ফরাসখানার নৌকা আগে যাইয়া ঐ সকল স্থানে তাম্বু সামিয়ানাদি ঠিক করিয়া রাখিত। তথায় পৌছিয়া সকলের রন্ধন ভোজনাদি সমাপন হইত এবং কোন২ স্থানে কার্য্যবশতঃ ২।৪ দিবস বিলম্ব হইত। নৌকাতেই রাজসভা হইয়া মন্ত্রিবর্গ মহারাজের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিজ২ কার্য্য সম্বন্ধে আজ্ঞা গ্রহণ করিতেন। রাজধানীতে অবস্থানকালে ভূপতি যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহে গীতবাদ্যাদি শ্রবণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদি করিতেন, পথেও তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইত না। যখন যেখানে পৌছিতেন, সেই খানেই বেহারের ন্যায় বিহার করিতেন এবং সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ করিতেন। এই প্রকার মন্দ গমনে চৈত্র মাসে ব্রহ্মপুত্রের চিলমারীর নিকট মেলার চরে বহর লাগিলে মহারাজ তথায় কিছুদিন অবস্থান করিলেন। পথ হইতে রাজপুত্র শ্রীযুক্ত বড় সাহেব ও বজ্রেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেবকে রাজধানীতে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা স্বীয় কর্ম্মচারী ও অমাত্যসহ বেহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকায় প্রজাগণ সুখে বাস করিতে লাগিল

এবং মহারাজ যে, রাজ্য ত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিল না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর ওরফে ভাদাঙ্গ সাহেব হুজুরের সহিত ৺ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ভূপতি ঐ স্থানে অশোকাষ্টমীতে লৌহিত্যে স্নান করিয়া নানাবিধ দান বিতরণ করিয়া যাচকদিগের দৈন্য দূর করিয়া সেস্থান হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণাভিমুখে মন্দগতিতে অগ্রসর হইলেন। সিরাজগঞ্জে বহর পৌছিলে দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালীচরণ লাহিড়ী শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়দিগকে মহারাজ তাঁহার সঙ্গে যাইবার আদেশ দিয়া পূর্ব্ব মন্ত্রীর সন্তান ও অতি বিশ্বস্ত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়কে, উভয় কুমার সাহেবের সহিত একত্রে সম্পাদন করিবার জন্য, রাজ্যের অনেক কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া এবং সরবরাহকারকে দিবার জন্য, সমুদয় কাছারীর মোহর আদি তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ঐ স্থান হইতে পদ্মলোচন বাবু প্রভৃতি অনেকে বিদায় হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। সিরাজগঞ্জে কয়েক দিবস থাকিয়া রসদ প্রভৃতিতে বহর পূর্ণ করিয়া হুড়াসাগর হইয়া বড়ালে পৌছিয়া ক্রমে রামপুরা ছাড়িয়া কাঁসার হাট পুখুরিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীশ্রীভাগীরথীতে স্নান করিয়া বহু দান বিতরণ করিয়া ঐ স্থান অতিশয় রম্য দেখিয়া মহারাজ অথায় অবস্থান করিলেন। গঙ্গার উত্তালতরঙ্গ ও বেগ দেখিয়া মন্ত্রিবর্গ বর্ষাকালে আর অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিলেন না। ভূপতি বর্ষাঋতু তথায় অতিবাহিত করিয়া বহু প্রকার দান বিতরণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে কয়েকজন ব্রাহ্মণের সম্পত্তি রাজকরের নিমিত্ত নিলাম হইবার উপক্রম হইলে, মহারাজ সাহেবদিগকে বলিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া দিলেন। এইরূপ কত স্থানে কত কীর্ত্তি মহারাজ করিলেন, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে। বর্ষান্তে শরৎকালে জঙ্গীপুর যাইয়া উত্তম আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া, অতি সমারোহ পূর্ব্বক যেরূপ বেহারে শারদীয়া পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপভাবে পূজা সম্পন্ন করিলেন এবং দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন এবং কাশীকান্ত লাহিড়ী দেওয়ানি আদালতের ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজধানীতে আসিলেন। দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ও শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয় প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ভূপতি হেমন্তঋতুর প্রারম্ভে বহর খুলিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন যে জেলাতে ভূপতির বহর পৌছিত, সেস্থানের প্রধান সাহেব কর্ম্মচারিগণ মহারাজের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, যোগী, সন্ন্যাসী, যাচক প্রভৃতি ভূপতির নিকটে আসিতেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে ধনদানে তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে সঙ্গে২ ৺ক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। এই প্রকারে ক্রমে২ ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, ছাপড়া ও গাজিপুর অতিক্রম করিয়া সন ১২৪৪ সালের ২৮শে আষাঢ় তারিখে

সর্ব্বশক্তিমান ত্রিলোকেশ্বর, কীর্ত্তিবাসের বাসস্থান, আনন্দ কাননে মণিকর্ণিকার ঘাটে বহর লাগিল। মহাতীর্থ দর্শনাঙ্গ ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া তটোপরি গমনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কাশীরাজের অসী সঙ্গমের উপরিস্থিত বৃহৎ বাটী মহারাজের বাসার্থ নির্দ্ধারিত ছিল। সরকারের লোকসমূহ অন্দর ও বহির্ব্বাটীর গৃহাদি সুসজ্জিত করিলে ভূপতি শুভলগ্নে ঐ বাটীতে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ী ও শিবপ্রসাদ বক্সী প্রভৃতি পৃথক২ বাটীতে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ যথাকালে রাজদ্বারে উপস্থিত থাকিতেন।

মহারাজ যথাবিধি মণিকর্ণিকায় স্নানাবগাহন পূর্ব্বক শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বর ও শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দর্শন করিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক পূজা দিলেন ও ৺ধামে শিবালয় ও তীর্থাদি দর্শন ক্রমেং সম্পন্ন করিলেন। দীন দরিদ্রদিগকে বহু ধন দান করিলেন। নানা দেশীয় দণ্ডী সন্ন্যাসীদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। সর্ব্বদাই দান বিতরণ ও স্থানে২ পূজা হইতে লাগিল। ভূপতি এইরূপে পরমসুখে ভগবৎ বিষয় আলোচনা ও ৺দর্শন করিয়া কাশীধামে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় কলিকাতা হইতে শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ডঅকলাণ্ড গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। হিন্দুস্থানি দরবারে শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ভূপতির পক্ষে উপস্থিতি হইলে লাট বাহাদুর তাঁহাকে অন্যান্য রাজাদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে আসন দিয়া খেলাৎ প্রদান করিয়া অতিশয় শিষ্টাচারের সহিত মহারাজের মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া মর্য্যাদা পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুর বিশেষ কীর্ত্তি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সোনারপুরার মহল্লাতে একটি বৃহৎবাটী ও তৎসংলগ্ন কিছু জমি ক্রয় করিয়া তাহার মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপনার্থ কয়েকটি মন্দির ও আদ্যাশক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ ও সদাব্রতাদির জন্য বৃহৎ অট্টালিকা ও মনোহর উদ্যানাদি নির্ম্মাণ করাইলেন কিন্তু কীর্ত্তি স্থাপনের পূর্ব্বেই ভূপতির নশ্বর দেহের অবসান হইল। ঐ নিদারুণ সংবাদের বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে বিংশতি অধ্যায় ॥ ২০ ॥

একবিংশতি অধ্যায়

রাজাধিরাজ মহারাজ কাশীক্ষেত্রে গমন করিবার পর রাজধানীতে যে সকল ঘটনা ঘটিল তাহা বিবৃত করিতেছি। শ্রীযুক্ত বড় সাহেব ও শ্রীযুক্ত বজ্রেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেবের উপর রাজকার্য্যের ভার ছিল কিন্তু উভয়ের মধ্যে মতের অনৈক্য হইতে লাগিল। তৎকালে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুস্তফী, গুরুচরণ রায়, কাশীকান্ত লাহিড়ী, পদ্মলোচন রায় ও দেওয়ানজি রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকিলেও এই উপাখ্যান বক্তা ও অন্যান্য সকলে একমত হওয়ায়

রাজকার্য্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিল না। শ্রীযুক্ত বড় সাহেব ক্রমে২ যাবতীয় রাজকার্য্য স্বীয় কর্ম্মদক্ষতাগুণে অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত করিতে লাগিলেন এবং মহারাজের নিকট হইতে নিয়তই ইঁহার উপর অনেক কর্ম্মের ভার অর্পিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত ছোট সাহেব অত্যন্ত সুখাভিলাষী ছিলেন, রাজকার্য্যে সেরূপ মনোযোগ করিতেন না। এই সময় গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের এজেণ্ট শ্রীল শ্রীযুক্ত মেস্তর ফ্রানসিষ জিকিঞ্চ সাহেব (Mr. Francis Jenkins) রাজ্যের সকল বিষয় তদন্ত করিবার জন্য ১২৪৩ সালের মাঘ মাসে রাজধানীতে আগমন করিয়া, প্রথমতঃ রাজবাটীতে যাইয়া শ্রীল শ্রীযুক্ত সাহেব দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করণান্তর নানা প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন পরে শ্রীল শ্রীযুক্ত সাহেবেরাও প্রথানুযায়ী সাহেবের তাম্বুতে যাইয়া এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এজেণ্ট সাহেব মাল, আদালত ও ফৌজদারী সংক্রান্ত কতক কাগজ পত্র দেখিয়া ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিলে তৎকালীন দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় ও আমরা সরকার পক্ষের বক্তব্য বলিলাম। পরে কয়েক বৈঠকে এজেণ্ট সাহেব উপস্থিত বিষয়াদির অত্যন্ত সদর্থ ও মিমাংসা করিয়া তাঁহার নিকট দাখিলী দরখাস্ত সমূহের নিষ্পত্তির ভার শ্রীযুক্ত সাহেব দ্বয়ের উপর দিয়া গৌহাটি প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত সাহেবদ্বয় ঐ সকল মোকদ্দমাদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া তাহার সংবাদ শ্রীযুক্ত এজেণ্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলে, সাহেবদের নিকট ইঁহাদের যথেষ্ট সুখ্যাতি হইল। শ্রীযুক্ত বড় সাহেব দিন২ স্বীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ, দৃঢ়সঙ্কল্প, আলস্যহীনতা ও উদারতা প্রভৃতি অসাধারণ গুণে রাজামাত্য ও মন্ত্রিবর্গকে ক্রমশঃ বশীভূত করিয়া যাবতীয় রাজকর্ম্ম করতলগত করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে একবিংশতি অধ্যায় ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

শ্রবণ করুন। ভূলোকাদি হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিবাসী যাবতীয় জীবই অনন্তকাল সমুদ্রে বিলীন হয়। ভূপতির পার্থিব সুখ ভোগ পরিসমাপ্ত হওয়ায় সামান্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ১২৪৬ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে, পবিত্র অবিমুক্তধাম বারাণসীক্ষেত্রে অন্তিম অনুষ্ঠানাদি সমাপনান্তে নানা প্রকার দান বিতরণ করিতে২ সজ্ঞানে অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজ নিত্যধামে গমন করিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর, দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ী ও শিবপ্রসাদ বক্সী প্রভৃতি মহাসমারোহ পূর্ব্বক ভূপতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদির ব্যবস্থা করিয়া মণিকর্ণিকায় গমনোদ্যোগ করিলেন। রাজাধিরাজ মহারাজের সিপাহী, বরকন্দাজ, গোলন্দাজ, আসাবরদার, সোঁটাবরদার, চোবদার এবং নাগড়া, নিশান, ডঙ্কা, ঘড়ি, নহবৎ, ছত্র, দণ্ড, হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি যাহা সতত মহারাজের সঙ্গে২ থাকিত,

তৎসহ মহেন্দ্রনারায়ণ, হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের মৃতদেহ, উৎকৃষ্ট খট্টার উপর স্থাপিত করিয়া বহুমূল্য শালদ্বারা আবৃত করিয়া সৎকারার্থ যাত্রা করিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ কাশীবাসী সহস্র২ লোক নানাবিধ পুষ্পমাল্য, চন্দনলেহ ও বিল্বপত্রাদি ভূপতির মৃত দেহের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে মণিকর্ণিকায় উপস্থিত হইয়া তথায় পরিমিতস্থান ক্রয় পূর্ব্বক এই মহাবংশের রীতি অনুসারে চন্দন কাষ্ঠ, গুগ্‌গুল, ঘৃত ও ধূনায় মৃতদেহের সৎকার সমাপন করিলেন। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন আমি যে, এই গ্রন্থের অনেক স্থলে মহাভূপকে কৈলাসের শ্রেষ্ঠ পারিষদ বীরভদ্ররূপে বর্ণনা করিয়াছি, ভূপতি জীবিতাবস্থায় সংসারে অতুল্য কীর্ত্তি সাধন করায় এবং অন্তিমকালে মহাক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺কাশীধামে সদাশিবে লীন হওয়ায়, আমার উক্ত রূপ বর্ণনা যথার্থ কিনা। আমার বক্তব্য এই যে, যুগ বিশেষে সূর্য্যবংশে শ্রীরামচন্দ্র, চন্দ্রবংশে রাজা যুধিষ্ঠির দেব ও যদুবংশে শ্রীমান বাসুদেব যেরূপ, বিশ্ববংশে বিজয়ী হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, সেইরূপ কুলতিলক ছিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে দ্বাবিংশতি অধ্যায় ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

ভূপতির কাশীলাভের প্রাক্কালে রাজধানীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। জীবেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেওয়ের জীবেশ্বরী ও জয়েশ্বরী নামে দুই পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে জয়েশ্বরী পূর্ব্বেই পরলোক গমন করায় জীবেশ্বরী দেওয়ান দেওয়ের ত্যক্ত যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রীরও গের্দ্দ পাটছাড়া প্রভৃতি সম্পত্তির মালিক হইয়া ১২৪৫ সালের কার্ত্তিক মাসে বার্দ্ধক্যাবস্থায় পীড়িতা হইয়া রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় ঈশরাণী পরলোক গমন করিলেন। এই উপাখ্যান বক্তা, ঐ সংবাদ শ্রবণ মাত্র, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের আবাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ প্রদান করিলে, তিনি দুই তিন দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতেই আমাকে সঙ্গে লইয়া দেওয়ান দেওয়ের বাটীতে যাইয়া তথায় উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে কুলধর্ম্মানুযায়ী ঈশরাণীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতে আদেশ দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে দেওয়ান দেওতার কর্ম্মচারী গুরুপ্রসাদ হিসাবিয়া ও রামসুন্দর রায় প্রভৃতিকে তলব দিয়া ঈশরাণীর ত্যক্ত নগদ মুদ্রা, স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি ও পরলোকগত দেওয়ান কুঙরদিগের নামের মোহর প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর বিস্তৃত তালিকা করিয়া ক্রোক করিতে আমাকে আদেশ দিলেন। ঐ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারকগণ অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সমুদয় সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করা হইল এবং নগদ মুদ্রা, প্রমিসরি নোট ও মহাজনদিগের দোকানে যে সকল টাকা জমা ছিল, সমস্তই রাজ সরকারে দাখিল করা হইল। এই রাজ্যের এক আনা অংশ, গের্দ্দ পাটছাড়া প্রভৃতি যে সকল ভূমি দেওয়ান দেওয়ের

অধিকারে ছিল, তাহা শ্রীলশ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের আজ্ঞানুসারে এই আখ্যায়িকা বক্তা ক্রোক করিল এবং ঐ সম্পত্তির আদায় তহশিলাদি করিবার জন্য একজন সাজোয়াল নিযুক্ত করা হইল। দেওয়ান দেওয়ের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি রাজসরকারের অধিকারে আসিল। এই সংবাদ শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের নিকট এবং জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের দস্তখতে শ্রীযুক্ত এজেণ্ট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল।

অনন্তর শ্রবণ করুন। এই সময়ে শ্রীশ্রীবড় আই দেবতী বার্দ্ধক্য জনিত দুর্ব্বলতা ও রোগগ্রস্ত হইয়া গুরুতর রূপে পীড়িতা হইলেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সর্ব্বদা তাঁহার নানারূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত ঈশরাণী পরলোক গমন করিবার অব্যবহিত পরেই বড় আই দেবতীও দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীলশ্রীযুক্ত বড় সাহেব সকল অমাত্যবর্গ সহিত স্বয়ং যাইয়া আই দেবতীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া একমাস পর্য্যন্ত যথাশাস্ত্র ও নিয়মানুসারে হবিষ্যাদি করিয়া মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতে লাগিলন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়

১২৪৬ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রাতঃকালে যখন, এই উপাখ্যান বক্তা কালীশঙ্কর ভাদুড়ী তহশীলদারের গৃহে বসিয়াছিল, সেই সময় ডাক হরকরা বারাণসী হইতে আগত একখানি পত্র আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করায় দেখিলাম ঐ পত্রের শিরোণামায় ঈশানচন্দ্র মুস্তফী, গুরুচরণ রায়, কালীশঙ্কর ভাদুড়ী ও এই উপাখ্যান বক্তার নাম লিখিত আছে। ঐ পত্র খুলিয়া ও পাঠ করিয়া তাহার অর্থ অবগত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া যেন আকাশ হইতে পতিত হইলাম। ঐ পত্রে দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়, শিবপ্রসাদ বকসী মহাশয় প্রভৃতি মুৎসুদ্দী বর্গের ও সহগামী যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈদ্য কবিরাজ দিগের স্বাক্ষরে ৺মহারাজ ভূপ বাহাদুরের মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ লিখিত ছিল। ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার মানসিক অবস্থা যেরূপ হইল তাহা বর্ণনার অতীত। কিয়ৎকাল পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম এ সময়ে এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ফল কি ? এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তহশীলদারের হস্ত ধারণ করিয়া গোপনস্থানে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ জ্ঞাত করাইলাম। দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় পীড়িত হইয়া নিজ বাটীতে ছিলেন, তাঁহাকে এই সংবাদ লিখিলাম। মুস্তফী মহাশয় ছোট সাহেবের বাটীতে ছিলেন তাঁহাকে এবং আদালতের অস্থায়ী আহেলকার কাশী বাবু প্রভৃতিকে সংবাদ পাঠাইয়া সকলে একত্রিত হইয়া জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের কোষ্ঠীতে জাত লগ্নের ফল রাজ্যলাভ, পরে যুবরাজী ওয়াকা প্রাপ্ত হওয়া, ম্যাকলিওড ও ডেভিড্ স্কট সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে সদরে যে সকল বিষয় লিখিয়া

গিয়াছেন এবং বর্ত্তমান এজেণ্ট সাহেব তাঁহার কার্য্যে যেরূপ সন্তুষ্ট আছেন এই সকল বিষয় যতদূর অবগত ছিলাম তাহা বিবেচনা করিয়া এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি রাজ আচার ও ব্যবহার, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার উদ্যম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি যে সকল অসাধারণ গুণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা হইতে নিশ্চিতরূপে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, যদিও মহারাজ ভূপ বাহাদুরের চারি পুত্র বর্ত্তমান এবং তন্মধ্যে ৺ছোট সাহেবই রাজ্যাভিলাষী, কিন্তু তাহা সম্ভব হইতে পারে না. জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺বড় সাহেবই রাজ্যলাভের উপযুক্ত। অতএব উত্তরাধিকার সূত্রে, বিশেষতঃ রাজ্যস্থ প্রজাবর্গের, রাজামাত্যের এবং রাজ প্রতিপাল্য পরিজন দিগের মঙ্গল ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শ্রীযুক্ত বড় সাহেবকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিবার উদ্যোগ করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ স্থির করিয়া মুস্তফী, কাশীবাবু প্রভৃতি ও আমরা সকলে একত্রিত হইয়া গুরুচরণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া স্নানাদি না করিয়া পদব্রজে দশ দণ্ড বেলার সময় ৺বড় সাহেবের আলয়ে গমন করিলাম। তিনি ঐ সময়ে মুখ প্রক্ষালন করিতে ছিলেন, অসময়ে ঐরূপ অবস্থায় সকলের যাওয়ার সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে ঐ পত্র শুনান হইলে শোকাভিভূত অবস্থায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন, অমরা সান্ত্বনা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলিবার পর উত্তর দিলেন, "এখন তোমরা কি বিবেচনা কর এবং তোমাদের কাহার কি মনোভাব তাহা প্রকাশ করিয়া বল।" আমরা বলিলাম, "যিনি জ্বর কিংবা কফে পীড়িত হইলে প্রকাশও করিতেন না তাঁহার শরীরের যেরূপ অবস্থা পত্রে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বর তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। কল্য ডাক আসিবে না, পরশ্ব দিবস অবশ্যই সংবাদ পাওয়া যাইবে। আমাদিগের সকলেরই একমত ও একপরামর্শ। আমরা সকলে একমত হইয়া এই সংবাদ লইয়া হুজুরের নিকট আসিয়াছি। ভগবদিচ্ছায় যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে ধর্ম্মাবতার নির্ব্বিরোধে ও নিরুপদ্রবে রাজ্যাভিষিক্ত হইলে সকল দিক রক্ষা হয়।" ইহার পর আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইলে তিনি আদেশ দিলেন, "যে২ অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহার ব্যবস্থা কর এবং তোমরা সকলেই একবার ছোট সাহেব অর্থাৎ বজ্রেন্দ্রনারায়ণ কুঙরের নিকট যাইয়া তাহাকে বল যে, আগামী কল্য সকলে রাজবাটীতে একত্রিত হইয়া এই বিষয়ে যাহা সুপরামর্শ হয় তাহা করা যাইবে। আর স্নান ভোজনাদি সমাপন করিয়া বৈকালে সকলেই এখানে আসিও।" ইহার পর, আজ্ঞানুসারে আমরা সকলেই ছোট সাহেবের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিলেন পরে আমাদের মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহার কুমন্ত্রীর মন্ত্রণানুসারে কেবলমাত্র বলিলেন, "দেখি ইহার পর কি সংবাদ আইসে।" ইহা ভিন্ন আর কোন কথা বলিলেন না। আমরা সকলে যথাসময়ে জ্যেষ্ঠ কুমারের বাটীতে যাইয়া নানা বিষয় বিবেচনা ও পরামর্শ করিলাম

এবং পর দিবস ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রধান রাজপুত্র, রাজবাটীতে তাঁহার জন্য যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া বড় সাহেব কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, নিজ জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে তাহার উত্তর দিলাম এবং বারাণসী হইতে সংবাদ পাইবামাত্র রাজ্যাভিষিক্ত হওয়া স্থির হইল। সেই দিনও একবার সকলে ৺ছোট সাহেবের বাটীতে গিয়াছিলাম কিন্তু তিনি কুমন্ত্রিদিগের সংসর্গে থাকায় কোন প্রকার সামঞ্জস্যের মধ্যে আসিলেন না। অগত্যা আমরা সিপাহীদিগের জমাদার ও রেসালদারকে ডাকিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলাম। তাহারা উত্তর দিল, "আপনারা উত্তম পরামর্শ করিয়াছেন। আপনারা যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহাতেই আমরা আপনাদিগের সহায়তা করিব।" আমাদিগের তৎকালীন মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। একদিকে ভূপতির কাশী প্রাপ্তির সংবাদে দুঃখে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ প্রায়, অপরদিকে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের রাজ্যাভিষেকের জন্য আনন্দ ও উৎসাহ, আবার এই বংশে বিনা রক্তপাতে রাজা পরিবর্ত্তন হওয়ার দৃষ্টান্ত না থাকায় সকলের প্রাণ ভয় ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিল কেবল ঈশ্বর চিন্তা করিয়া 'রজনী প্রভাতে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে,' এই ভাবিয়া সকলে রহিলাম। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

৩৩০ রাজশকে ১২৪৬ বঙ্গাব্দের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রভাতে সকলে ঈশ্বর চিন্তা করিয়া রাজবাটীতে যাইয়া রাজ্যাভিষেকের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বারাণসী হইতে পূর্ব্বোক্ত চারিজনের বরাবর নীল বর্ণ কাগজে লিখিত পত্রে, ভূপতির নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্তির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রধান রাজপুত্রকে অবগত করাইলে তিনি কিছুকালের জন্য শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া পরে, এ অনিত্য সংসারের এই রীতি ইহা বুঝিয়া শোক সম্বরণ পূর্ব্বক স্নান করিলেন। রাজ্যাভিষেকের সকল অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইল। ঋত্বিক, সদস্যাদি আসিয়া এই মহাবংশের রীত্যানুসারে অভিষেক সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সৈন্য সামন্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে আপন২ স্থানে দণ্ডায়মান হইল। অন্যান্য সাধারণ লোকে রাজবাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজাসন অর্থাৎ 'চাক বালিশের' উপর চন্দ্রাতপ উঠান হইল এবং সকলের উপবেশনের জন্য অতি সুন্দর আস্তরণ বিস্তৃত হইল। গুরুচরণ রায় ও আমার প্রতি এই আদেশ হইল যে, "তোমরা যাইয়া, যদি ছোট সাহেব আসেন, তাঁহাকে আন।" আমরা সাগর দীঘির বায়ু কোণ পর্য্যন্ত পৌছিয়া দেখিলাম পাঁচ সাত জন লোক সহ সাহেব পাল্কীতে আসিতেছেন। আমরা পাল্কী হইতে কিছুদূরে দাঁড়াইলে তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে?" আমরা উত্তর দিলাম, "অভিষেকের অনুষ্ঠান করা হইতেছে।" ছোট সাহেব বলিলেন,

“তাহা হইলে আমার যাইবার আবশ্যকতা কি?” আমরা কহিলাম, “আপনি চলুন, আপনার প্রতি কোনরূপ অবিবেচনা হইবে না।” রাজপুত্র আমাদিগের পূর্ব্বেই, রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে, যেদিকে রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান হইতেছিল এবং জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ছিলেন, সেদিকে না যাইয়া আই ভাণ্ডারণীর আবাসে গেলেন। এই সময় জ্যেষ্ঠ মহারাজ কুমার রাজবেশ ধারণ করিয়া অভিষেকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পুনরায় ছোট সাহেবকে আনিবার জন্য ঈশানচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না।

চৌদ্দ দণ্ড বেলার সময় শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার কুলাচার মতে ‘চাক বালিশে’ উপবিষ্ট হইলেন। খেদমতগারগণ দণ্ড ও ছত্র ধারণ করিল ও শ্বেতচামর ব্যজন করিতে লাগিল এবং এই বংশের রীতি অনুযায়ী অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। নহবৎখানায় নহবৎ বাদ্য, তোপ ও বন্দুকের ধ্বনি হইবার আদেশ হওয়ায় জয়সূচক অসংখ্য তোপধ্বনি ও বাদ্য হইতে লাগিল। নৃত্য, গীত ও আনন্দের সীমা রহিলনা। শ্রীশ্রীমহারাজ ৺শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের নামে মোহর অঙ্কিত হইল এবং শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরকে দেবত্র প্রদান করিয়া ওয়াকায় উক্ত মোহরাঙ্কিত হইল। পরে কুলাচার মতে পুরোহিত ও ধর্ম্মাধ্যক্ষাদির নামে ওয়াক্বা লিখিত হইলে তাহাতে ঈশানচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় মহারাজের ‘সাক্ষাৎ হুকুম প্রমাণ’ ও ‘সন তারিখাদি’ লিখিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সভায় উপবেশন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইলে সকলে বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন এবং কর্ম্মচারিগণ মধ্যে ঈশানচন্দ্র মুস্তফী, গুরুচরণ রায়, কাশীকান্ত লাহিড়ী, কালীশঙ্কর ভাদুড়ী এবং এই উপাখ্যান বক্তাকে বসিবার আজ্ঞা হওয়ায়, আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। ‘চাক বালিশের’ সম্মুখভাগ স্বর্ণমুদ্রা ও নজরের মুদ্রায় পরিপূর্ণ হইল। দেবস্থান সমূহে অতি সমারোহে পূজা দেওয়ার আদেশ হইল। যাচক, ব্রাহ্মণ, দুঃখী ও কাঙ্গালীদিগকে আশাতিরিক্ত ধন দান করা হইল। মহাভূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমি অদ্য এই পদাভিষিক্ত হইলাম। এক্ষণে আপনারা আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন, আমা হইতে প্রজাবৃন্দ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকে।” ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বেদোচ্চারণ করিয়া মহারাজের জয়ধ্বনি ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মন্ত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “তোমাদিগের উদোগে অবিরোধে পিতৃপদাভিষিক্ত হইলাম এক্ষণে সকলে এইরূপ চেষ্টা কর যেন, যথাযথভাবে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়।” এইরূপ মধুর বাক্যে সকলকে তুষ্ট করায়, সকলেই পরলোকগত মহারাজের শোক বিস্মৃত হইয়া মহারাজ ভূপবাহাদুরকে ধন্য২ করিতে লাগিল। এই প্রকারে শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজা হইলেন।

ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশতি অধ্যায়

শ্রবণ করুন। এই উপাখ্যানবক্তা মহারাজের পিতৃ সভাস্থ প্রাচীন পরিজন বিধায় মহারাজ আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস ও অনুগ্রহ করিতেন এবং রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর প্রায়ই অনেক বিষয় আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। এক দিবস ভূপতি আমাকে বলিলেন, “মুন্‌শী, তুমি পূর্ব্বপুরুষ মহারাজদিগের এবং পিতা মহারাজের রাজত্বকালের যেরূপ বিবরণ ‘রাজোপাখ্যানে’ লিখিয়াছ, ঐরূপ আমার রাজ্যাভিষেকের এবং তাহার পর হইতে যে সকল রাজকার্য্য উপস্থিত হইতেছে এবং যে প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন করা হইতেছে, তাহার বিবরণ উক্ত রাজোপাখ্যানের শেষঅধ্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ কর এবং রাজা হওয়ার বিবরণ যদি সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ করা তোমার পরামর্শ হয় তাহা হইলে তাহারও ব্যবস্থা কর।” ভূপতির আজ্ঞানুসারে, তাঁহার অভিষেকের সংবাদ, সংক্ষেপে লিখিয়া প্রকাশার্থ শ্রীরামপুরে “সমাচার দর্পণে” প্রেরণ করা হইল।

ভূপতির রাজত্বকালে যে সকল রাজকার্য্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা ধারাবাহিকভাবে লিখিত হইল, পাঠকবর্গ শ্রবণ করুন। মহারাজ রাজ্যলাভ করিবার পর রাজমাতা শ্রীশ্রী৺রী ডাঙ্গর আই দেবতী শ্রীশ্রী৺রী কর্ত্তা আই দেবতী উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজের অভিষেকের সময় দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজবাটীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। রাজা হইবার কয়েক দিন পরেই মহারাজের আহ্বানে তিনি রাজধানীতে আগমন করিয়া ভূপতির সাক্ষাৎ করিলে মহারাজ ভূপবাহাদুর পিতার আমলের প্রধান মন্ত্রীকে বহু সম্মান ও পুরস্কার দান পূর্ব্বক বলিলেন, যে “আমি অধিক বয়সে রাজ্য লাভ করিলাম, যাহাতে অবশিষ্ট কাল সুখে ও স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে পারি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তুমি সকল রাজকার্য্য সম্পন্ন কর।” এইরূপ আরও অনেক আদেশ দেওয়ানকে দিলেন তাহা এই উপাখ্যানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহাভূপের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ সদরে শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের ও গৌহাটীতে এজেন্ট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল এবং প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দেবরাজ, বৈকুণ্ঠপুর ও পাঙ্গা প্রভৃতির রাজাদিগের নিকটও পত্র লিখিত হইল। সদর ও গৌহাটী হইতে শ্রীল শ্রীযুক্ত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর ও এজেন্ট সাহেব বিশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া পত্রের উত্তর দিলেন এবং দেবরাজ, বৈকুণ্ঠপুর ও পাঙ্গা হইতে যথারীতি নজর ও উপঢৌকনাদি প্রেরিত হইল। ভূপতি কালাশৌচ বিধায় অভিষেকের দিবস সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই, মাসান্তে পরলোকগত মহারাজের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া ১২৪৬ সালের শুভ পুণ্যাহের দিবস প্রথম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেওয়ান ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে রাজকর গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং ক্রমানুসারে সকলের নজর গ্রহণ করিলেন। কার্য্যকারকদিগকে যথোপযুক্ত শাল, রুমাল,

হস্তী, ঘোটকাদি এমদাদ প্রদান করিলেন। দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীকে তরবারি ও কলম দাম পুরস্কার দিলেন। পরে মজলিস করিয়া নাচ গান ও বাদ্যাদি শ্রবণ করিয়া সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে ষড়বিংশতি অধ্যায় ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ রাজ্য লাভ করিয়াই প্রথমতঃ প্রজার অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। রাজকার্য্যে ও রাজ্য মধ্যে যে সকল অনিয়ম ও অত্যাচার হইতেছিল তাহার প্রতিবিধান করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী ও ঈশানচন্দ্র মুস্তফীর সহিত পরামর্শ করিয়া 'ধর্ম্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করিয়া মধ্যে ২ ঐ সভায় মন্ত্রিবর্গের সহিত উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য সমূহের বিচার ও বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অল্প দিবস মধ্যেই মহারাজ বনকর প্রভৃতি কয়েক প্রকার অন্যায় কর, যাহার জন্য প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন হইত, সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া দিলেন এবং দেওয়ানি, ফৌজদারী ও মাল সম্পর্কে প্রচলিত নানা প্রকার রীতির পরিবর্ত্তন ও সুনীতি সংস্থাপন করিলেন। ভূপতি কখনও মন্ত্রিবর্গের সহিত রাজকার্য্য আলোচনা ও বিচার কখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ, কখনও বা মজলিস করিয়া নৃত্যগীত শ্রবণ ও অন্যান্য আনন্দ উৎসবে কালযাপন করিতেন, কখনও বিনাকার্য্যে বা আলস্যে সময় নষ্ট করিতেন না। পরলোকগত মহারাজের কাশীযাত্রার পর রাজবাটীর অত্যন্ত জীর্ণাবস্থা হওয়ায়, মহারাজ কতকাংশের সংস্কার সাধন করেন এবং অন্তঃপুর মধ্যে এবং বহির্ভাগে অনেক উত্তম২ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহাতে রাজবাটী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুদৃশ্য হইল। রাজামাত্য, ভ্রাতৃবর্গ ও পরলোকগত মহারাজের রাণীদিগের মাসোহার বৃদ্ধি করিয়া, যাহাতে তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দে কালযাপনের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পিতৃমন্ত্রী ও পরিজনসকলের পদ ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে বাধিত করিলেন, ফলে সকলেই পূর্ব্ব মহারাজের অভাব ও তজ্জন্য শোক অল্প দিনের মধ্যেই বিস্মৃত হইল। ঈশানচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় দিন ২ ভূপতির অতিশয় প্রিয়পাত্র ও অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হইলেন। চাকলাজাত ও অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধান তিনি পূর্ব্ব হইতেই করিতে ছিলেন, ক্রমে২ আরও অনেক রাজকার্য্য ইঁহার পরামর্শক্রমে হইতে লাগিল। ভূপতির রাজ্যাভিষেকের অল্প দিবস পরে গভর্ণর জেনালের এজেন্টের সম্মতিসূত্রে, এক সহস্র রৌপ্য ও একশত স্বর্ণ নারায়ণী মুদ্রা মহারাজের নামে প্রস্তুত করাইয়া তদ্দ্বারা দেবস্থানাদিতে প্রণামী দেওয়া হইল এবং সাহেব দিগকে ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে স্থানে২ প্রেরণ করা

হইল। রাজ্যলাভের পূর্ব্বে মহারাজের উপর দায়রা আদালত ও অন্য আদালতের কার্য্যের ভার ছিল, পরে মহারাজ দায়রার ভার দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীর ও অপর আদালতের ভার মহেন্দ্রনারায়ণ কুঙরের উপর অর্পণ করিলেন। তাঁহারা ঐ সকল কার্য্য যথোপ-যুক্তভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেব, ভ্রাতৃবর্গ মধ্যে ভূপতির নিতান্ত অনুগত ছিলেন মহারাজও তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। বৃদ্ধ মহারাজের আমলে ছোট সাহেব দলিল পত্রে 'সাক্ষাৎ হুকুম প্রমাণ' লিখিতেন এক্ষণে ঐ কার্য্যের ভার ভূপতি মহেন্দ্রনারায়ণকে দিলেন।

এই সময় মহারাজ ফৌজদারী ও দেওয়ানি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য, নায়েব আহেলকারী ও সদর আমিনী নামে দুইটি আদালত স্থাপিত করিলেন এবং কর্ম্মচারিগণ তথায় ন্যায়ানুসারে বিচার করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও উপর কোনরূপ দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার করিতে পারিত না। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সুশাসনে রাজ্যের প্রজাগণ সুখী হইল। ১২৪৬ সালের শারদীয়া পূজার সময় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেব ও ঈশানচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়দিগের প্রতি মহারাজ বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বানডঙ্কা, নাকারা, নিশানাদি খেলাত দিলেন এবং হুজুরের যুবরাজী আমলের দপ্তরের সেরেস্তাদার গোপালমোহন মজুমদারকে নায়েব আহেলকার নিযুক্ত করিলেন। তিনি দিন২ মহারাজের প্রিয়পাত্র হইয়া নানা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এবং নিজের ইষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে ভূপতিকে অনেক অসঙ্গত পরামর্শও দিতে লাগিলেন, ইহাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

বারাণসীধামে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহেব, কয়েকজন ব্যক্তির কুপরামর্শে, পর-লোকগত মহারাজের ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি তথাকার এজেন্টের সহায়তায় স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌহাটীর এজেন্ট সাহেবের চেষ্টায় এবং সদরের হুকুম অনুসারে ঐ বিষয়ের মিমাংসা হইলে তারামোহন বক্সী, কতক সামগ্রী সহিত স্থলপথে রাজধানীতে আসিয়া হুজুরের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্ববৎ দ্বারমোক্তারি কার্য্য করিতে লাগিলেন। দেওয়ান দেওয়ের ত্যক্ত ভূমি গের্দ্দি পাটছাড়া, যাহা পূর্ব্বেই রাজ সরকারে ক্রোক করা হইয়াছিল— তাহাতে মহারাজের স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত হইয়া সদর হইতে অনুমোদন সংবাদ আগত হওয়ায়, ভূপতি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং দেওয়ান দেওয়ের অন্তঃপুরে যে কয়েকটি কন্যা-পাত্রী ও পরিচারিকাদি ছিল, তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে সপ্তবিংশতি অধ্যায় ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

৩৩১ রাজশকে (১২৪৭ বঙ্গাব্দে) শুভ পুণ্যাহের সময় মহারাজ ভূপবাহাদুর দেওয়ানি, ফৌজদারী ও মাল সংক্রান্ত বিষয়ের অর্থাৎ, উত্তমার্থ, যথাশাস্ত্র দণ্ড এবং কর সংগ্রহ, এই তিন বিভাগ ঘটিত বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশ্যে, 'রাজসভা' নামক বিচারালয় স্থাপিত করিয়া দেওয়ান শ্রীকালীচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীঈশানচন্দ্র মুস্তফী মহাশয়দ্বয়কে তাহার সদস্য পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাদের নাম দস্তখতে ওয়াক্কা প্রভৃতি জারি হইতে লাগিল। রাজসভার পৃথক মোহর অঙ্কিত হইল এবং সদস্যদ্বয় শৃঙ্খলার সহিত তাহার কাজকর্ম্ম পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ভূপতিও কখনও২ ঐ বিচারালয়ে উপবেশন পূর্ব্বক গুরুতর মোকদ্দমা সমূহ সভ্যদ্বয় ও পণ্ডিতদিগের সাহায্যে স্বয়ং বিচার করিতেন। এই সনে শ্রীশ্রী৺রী বড় মহারাণী, নাগেশ্বরী আই, দয়ালী আই এবং যোগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেব কাশী হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলেই রাজবাটীর উত্তরাংশে আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। পরলোকগত মহারাজের ত্যক্ত দ্রব্যাদির কতকাংশ ইতিপূর্ব্বেই তারামোহন বক্সী মহাশয় লইয়া আসিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সামগ্রী সহিত শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয় এই সনের শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ভূপতির সহিত সাক্ষাতের পর, বৃদ্ধ মহারাজের সময় যেরূপ আধিপত্য ও প্রতিপত্তি সহিত রাজকার্য্য করিতেছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজের সময়ও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ পিতৃমন্ত্রী সকলকে সসম্মানে স্ব২ পদে স্থাপিত ও পুরস্কৃত করিয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সনের আশ্বিন মাসে, দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় অকালে কাশীপ্রাপ্ত হইলেন। দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় তৎকালে নিজবাটীতে থাকায় মহারাজ আমাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া বহু দুঃখ ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বস্তুতঃই এইরূপ বহুদর্শী সুবক্তা, দানী, মানী ও বহুগুণসম্পন্ন পারিষদ দুর্ল্ভ। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে বেহারের সকল লোকই অতিশয় দুঃখিত হইল। সবই ঈশ্বর ইচ্ছা।

ঐ সালের ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার দিবস, ভূপতির শুভ বিবাহের দিন স্থির হইল। দেওয়ানজী, মুস্তফী মহাশয়, শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ও এই উপাখ্যান বক্তার উপর সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত হইল। আমরাও যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবাহের আবশ্যকীয় সমুদয় সামগ্রী এবং ভূপতির জন্য উত্তম পরিচ্ছদ ও আভরণাদি, বারাণসী, ঢাকা, কলিকাতা মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হইল। বাই, ভাঁড়, কথক, কালোয়াৎ, অন্যান্য গায়ক, বাদক ও নর্ত্তকী প্রভৃতি অনেক আসিল। নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন হইল। রাজবাটীতে মজলিসের গৃহ নির্ম্মিত

হইল এবং ঝাড়, লণ্ঠন ও বিচিত্র চিত্র পটাদিতে সুসজ্জিত করা হইল। এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা বাহুল্য মাত্র, সমারোহের সীমা ছিলনা। যাবতীয় রাজা ও সাহেবদিগের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে অর্থাৎ বিবাহের 1841
কিছুদিন পূর্ব্বে, মাঘ মাসে গৌহাটীর এজেন্ট জেঙ্কিন্স সাহেব (Mr. Jenkins) ভূপতির Feb.
সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে আসিয়া প্রথামত প্রথমে রাজবাটীতে যাইয়া হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা প্রকার সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া তাম্বুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজ ভূপবাহাদুরও সাহেবের তাম্বুতে যাইয়া সৌজন্য প্রকাশ ও শিষ্টালাপাদি করিয়া রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন। পরে এজেন্ট সাহেব, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, "আপনার রাজ্যের দেওয়ানি, ফৌজদারী ও মাল সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য্যাবলীর, ন্যায় অন্যায় ও সদসৎ বিচারের অবসর আপনার হইবেনা, অতএব এইরূপ এক বিচারালয় স্থাপিত করুন, যাহার সাহায্যে সংক্ষেপে, সকল কর্ম্ম ন্যায়সঙ্গতরূপে স্বয়ং নির্ব্বাহিত করিতে পারেন।" মহারাজ উত্তর দিলেন, "আমি সেই ইচ্ছাতেই ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ একটি আদালত স্থাপিত করিয়াছি।" ইহার পর মহারাজ এজেন্ট সাহেবকে বিবাহ পর্য্যন্ত রাজধানীতে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি সরকারী কার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গৌহাটী গমন করিলেন। ১২৪৭ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে, চাঁপাগুড়ীর বজ্রধর কার্য্যীর এবং পর্ব্বত জোয়ারের রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কন্যার সহিত, শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপবাহাদুরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। চাঁপাগুড়ীর আইয়ের শ্রীশ্রীডাঙ্গর আই দেবতী ও পর্ব্বত জোয়ারের আইয়ের, শ্রীশ্রীবড় আই দেবতী উপাধি হইল। বিবাহের দিবস মহারাজ মজলিস করিয়া নানা প্রকার আনন্দ উৎসব করিলেন। এই মজলিসে অন্যান্য উত্তম গায়ক বাদে প্রায় এক শত বাই উপস্থিত ছিল। ভূপতি কিছুকাল মজলিস করিয়া শ্রেষ্ঠ গায়ক ও নর্ত্তকীদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, তাহার পর দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী, শিবপ্রসাদ বক্সী ও ঈশানচন্দ্র মুস্তফী মহাশয় প্রভৃতি মজলিস করিলেন। এক স্থানে স্থানসংকুলান না হওয়ায় পৃথক ২ স্থানে মজলিস হইল। দিনাজপুর হইতে অনেক আতস বাজিকর নানা প্রকার আতসবাজিসহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সকল বাজি প্রজ্জলিত হইলে চতুর্দ্দিক নানাবিধ আলোকমালায় সমুজ্জল হইয়া উঠিল। রাজধানীতে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের আনন্দের সীমা রহিলনা। এইরূপ সমারোহে ভূপতির শুভ বিবাহ নির্ব্বাহিত হইল। নানা স্থান হইতে আগত লোকদিগকে প্রচুর অর্থদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করা হইল এবং মহারাজের যাবতীয় পরিজন ও সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য এমদাদ প্রদান করা হইল। ভূপতি রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রীআই দেবতীদ্বয় সহ পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে অষ্টাবিংশতি অধ্যায় ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশৎ অধ্যায়

৩৩২ রাজশকে (১২৪৮ বঙ্গাব্দে) মহারাজ ভূপবাহাদুর অতিথি, সন্ন্যাসী ও উদাসীন দিগের উপকারার্থ, সাগরদীঘির দক্ষিণ তীরে 'ধর্ম্মশালা' নামে একটি উদ্যান বাটিকা স্থাপিত করিলেন। তথায় প্রতিদিন বহুলোক আসিয়া যত দিন ইচ্ছা বাস করে এবং নানা প্রকার উপাদেয় আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। ঐ সনে মহারাজ রাজবাটীর অগ্নিকোণে একটি নূতন দীঘি খনন করাইয়া মহাসমারোহে তাহা উৎসর্গ করিলেন। নানা স্থান হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিতেন, ভূপতি স্বয়ং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিতেন। অন্যান্য যাচক ও প্রার্থী দিগকে দ্বারের অধ্যক্ষেরা যথাযোগ্য অর্থ দান করিয়া বিদায় করিতেন। মহারাজের রাজত্বকালে কেহই বিমুখ বা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। মহারাজ ভূপ বাহাদুরের সর্ব্ব বিষয়ে সমান দৃষ্টি ছিল। সাংসারিক বিষয় ও রাজ্য শাসন কার্য্যে তাঁহার যে প্রকার মনোযোগ ছিল পারমার্থিক বিষয়েও তাঁহার তদ্রূপ অভিনিবেশ ছিল। পর্ব্বোপলক্ষে মহারাজ প্রায়ই পুরশ্চারণ ও মহাপুরশ্চারণ করিতেন এবং তজ্জন্য যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেন তাহা অন্যের পক্ষে অসাধ্য। ঐ সকল বিষয় এই পুস্তকে বিস্তারিত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে মহারাজ ভূপ বাহাদুর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই বৎসর অতিবৃষ্টি হইয়া রাজধানী প্লাবিত হইয়াছিল। এইরূপ বন্যা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। অনেক গো, মনুষ্য এবং অন্যান্য পশু এই প্লাবনে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ভূপতি, সন্তানাদি না হওয়ায়, অতিশয় দুঃখিতচিত্তে মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া বলরামপুরের শম্ভুনারায়ণের পুত্র করীন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে, দত্তক গ্রহণ করিলেন। কুমার সাহেব অতি সুন্দর ও তৎকালে ৮।৯ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। মহারাজ তাঁহার পারসী ও বাঙ্গলা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন কিন্তু নিজের ঔরসজাত সন্তান না থাকায়, ভূপতির মনে কোনরূপ আনন্দ ছিল না। 'সকলই ভগবানের ইচ্ছা', এই চিন্তা করিয়া মহারাজ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। এই বৎসর মুর্শিদাবাদ নিবাসী বাবু প্রতাপ সিংহ ওশোয়াল, ভূপতিকে বহু মূল্য দ্রব্য সামগ্রী নজর দিয়া সাক্ষাৎ করিলে, মহারাজ ভূপ বাহাদুরও, তাঁহাকে ধনবান বণিক বিধায়, যথাযোগ্য পুরস্কার ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। গোপালমোহন মজুমদার, ভূপতির অনুগ্রহে ক্রমে২ অনেক রাজকার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং প্রায় কোন কর্ম্মই তাঁহার আজ্ঞাতে ও বিনা পরামর্শে হইত না। ইহাতে প্রধান কর্ম্মচারী ও কার্য্যকারক সকলেই অত্যন্ত হতোৎসাহ হইলেন, কিন্তু তিনি ভূপতির বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। ইহার ফলে, রাজকার্য্যে নানারূপ বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এইরূপে ১২৪৮ সাল অতীত হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে উনত্রিংশৎ অধ্যায়। ২৯।

ত্রিংশৎ অধ্যায়

৩৩৩ রাজশকের (১২৪৯ বঙ্গাব্দে) শুভ পুণ্যাহ কালে ও তৎপর যে সকল রাজকার্য্য উপস্থিত হইয়াছিল ও তাহা যেরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লিখিত হইতেছে, পাঠকবর্গ শ্রবণ করুন। দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়, তাঁহার দেওয়ানি পদ নিজ পুত্রকে দেওয়ার জন্য মহারাজ ভূপ বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা জানাইলে, মহারাজ তাঁহার পুত্র কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীকে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিয়া, দওয়ার বিচারের ভার তাঁহার সম্মতি ক্রমেই, ছোট সাহেবকে অর্পণ করিলেন। দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইয়া কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় শুভ পুণ্যাহ করিলেন। কাশীকান্ত লাহিড়ী মহাশয় অস্থায়ীরূপে দেওয়ানি আদালতের কার্য্য করিতেছিলেন মহারাজ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিলেন। ফৌজদারী আদালতের ও খানগীর কার্য্য গুরুপ্রসাদ বাবু করিতেছিলেন, তাঁহার কোন২ কার্য্যে মহারাজ অসন্তুষ্ট হওয়ায় বিশেষতঃ গোপালমোহন মজুমদারের প্ররোচনায় মহারাজ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহাকে উভয় কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিয়া সম্পূর্ণ ফৌজদারীর ভার গোপালমোহন মজুমদারের উপর দিলেন, খানগীর কার্য্য ঐ কাছারীর তহশিলদার করিতে লাগিল। এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। যাহাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইল, তিনি তাহা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সনের ৺পূজার পূর্ব্বে ভূপতি, দেওয়ান কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে আসা, সোটা, আড়নি ও বাণডঙ্কা প্রভৃতি এমদাদ দিলেন।

গোপালমোহন মজুমদারের প্রাধান্য দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল ; প্রায় কোন কার্য্যই তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন হইত না। ফৌজদারীর ভারপ্রাপ্ত হইয়া নানারূপ অনুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ গৌহাটীর এজেণ্ট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল। কিছু সময় মাহাত্ম্য ও ভূপতির অনুগ্রহে ইহা সত্বেও তাঁহার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইল না বরং দিন২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাল সম্পর্কিত কার্য্যেও তিনি নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই নিজ বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। দেওয়ান কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় রাজধানীতে থাকিয়া মালের কার্য্যাদি দেখিতে লাগিলেন। এই সময় মহারাজ ভূপ বাহাদুর রাজসভার সেরেস্তাদারী কার্য্যের ভার এই উপাখ্যান বক্তার উপর অর্পণ করিলে আমি কাজ করিতে লাগিলাম। ভূপতি কখনও২ রাজসভায় উপবেশন করিয়া, তৎসম্পর্কিত কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে হুকুম প্রদান করিতেন, এইরূপ ভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। (ধলিয়াবাড়ীতে বৃদ্ধ মহারাজ যে শিব মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অসমাপ্ত ছিল, ভূপতি ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্বয়ং তথায় যাইয়া বিধিমত ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া তথায় সিদ্ধিনাথ শিব স্থাপিত করিলেন, এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।)

রাজবাটীর সম্মুখে যে সকল মৃত্তিকা নির্মিত দেবালয় ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে ইষ্টক নির্মিত উত্তম২ দেবালয় প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। তথায় নিত্য সেবা, পূজা যাগযজ্ঞ, হোম, পুরশ্চারণাদি এবং মাসে২ নিয়মিতরূপে পুরাণাদি পাঠ হইতে লাগিল। (এইরূপে ভূপতি রাজস্বের সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং বৃদ্ধ মহারাজের সময়ে চাকলাজাত ও নিজ বেহারে যে সকল ঋণ ছিল তাহা পরিশোধিত হইল।) সকল স্থান হইতেই নিরূপিত খাস খরচের টাকা, প্রতি মাসে হুজুরের নিকট দাখিল হইতে লাগিল। এই সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকলাণ্ড সাহেব বাহাদুরের আদেশ অনুসারে গৌহাটীর এজেণ্ট সাহেব, কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক কাবুল জয়ের সংবাদ ভূপতির নিকট প্রেরণ করিলে, বিজয়ের আনন্দ সূচক তোপধ্বনি ও নহবৎ আদি বাদ্য হইল। এইরূপে সন ১২৪৯ সাল অতীত হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে ত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশৎ অধ্যায়

৩৩৪ রাজশকে (১২৫০ বঙ্গাব্দে) শুভ পুণ্যাহ সম্পন্ন হইল। এই বৎসর বিশেষ কোন কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন হইল না। সকলে যথানিয়মে পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন কিন্তু রাজ্যের উপর অশেষবিধ অত্যাচার করার জন্য গোপালমোহন মজুমদারের বিরুদ্ধে, এজেণ্ট সাহেবের নিকট অনেক দরখাস্ত প্রেরিত হইতে লাগিল। মহারাজের নিকট ও তাঁহার বিরুদ্ধে, কতকগুলি অভিযোগ পত্র উপস্থিত হওয়ায়, ভূপতি আমাকে ঐ সকল বিষয়ে তদন্ত করিতে আদেশ দিলেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়াও উপায় নাই, কিন্তু তদন্তের ফলে গোপালমোহন মজুমদারের প্রাধান্যের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইল না, বরং তাঁহার প্রতি পক্ষেরাই নির্য্যাতিত হইল। কয়েক মাস গত হইলে গৌহাটির এজেণ্ট বাহাদুর তাঁহার
1844 প্রধান সহকারী কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত মেথী সাহেবকে (Mr. Mackay) এই সনের মাঘ মাসে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সাহেব বলরামপুর উপস্থিত হইলে, দেওয়ান কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী ও আমি তাঁহাকে তথায় অভ্যর্থনা পূর্ব্বক রাজধানীতে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিলাম। সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি মহারাজের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া রাজধানীতে আগমন করিলেন। দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় নিজবাটী হইতে রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সাহেব রাজবাটীতে যাইয়া ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন মহারাজও একদিবস সাহেবের তাম্বুতে যাইয়া শিষ্টালাপাদি করিয়া আসিলেন। সাহেব দেওয়ানি ফৌজদারী ও অন্যান্য কাছারীর কাগজপত্রাদি দেখিয়া সকল বিষয়ের চুম্বক লিখিয়া লইয়া, গোপালমোহন মজুমদারের কার্য্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, গৌহাটি প্রস্থান

করিলেন। মহারাজের সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না কিন্তু মহারাজের অনুগ্রহে মজুমদার পদচ্যুত না হইয়া পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্যই করিতে লাগিলেন। খানগীর তহশিলদার যে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা এই সনের ফাল্গুন মাসে, তাহার নিকট তলব হওয়ায়, সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধান দেওয়ান কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর উপর এবং তহশিলের ভার আমার উপর অর্পিত হইল। আমরা খানগীর সকল কার্য্য করিতে লাগিলাম। ঐ সালের শেষ ভাগে শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড অকল্যাণ্ড ভূপতিকে নূতন ধরনের দুইটি কামান, উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন, ঐরূপ কামান ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কখনও দেখে নাই। ভূপতি ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়া সদরে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই সালে রাজকুমার করীন্দ্রনারায়ণ কাছুয়া সাহেব হঠাৎ পরলোক গমন করায় ভূপতি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। ভগবানের বিধান অলঙ্ঘ্য। মন্ত্রিগণ সকলে মহারাজকে সাধ্যমত সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, কিন্তু মহারাজের বয়ঃক্রম অধিক হওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তান জন্মগ্রহণ না করায়, তাঁহার অন্তঃকরণের ঔদাস্য দূর হইল না। এইরূপে ১২৫০ সাল অতিক্রান্ত হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে একত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

১২৫১ বঙ্গাব্দের (৩৩৫ রাজশকে) প্রারম্ভে শুভ পুণ্যাহ সুসম্পন্ন হইল এবং কার্য্যকারকগণ পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। খানগীর কার্য্য কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে ছিল, এই সনের পুণ্যাহের পর হইতে, উহার ভার মধ্যম সাহেবের উপর অর্পিত হইল। তহশিলদারের কার্য্য আমি সাহেবের অধীনে করিতে লাগিলাম। গোপালমোহন মজুমদারের অত্যাচার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহারাজের রাজ্যের যাবতীয় কার্য্যে মনোযোগ ছিল এবং সকল প্রজাকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে পারিত না। সকল রাজকার্য্যই ন্যায় সম্মতরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছিল। বিশ্ববংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের মধ্যে, এইরূপ সর্ব্বকার্য্যে তৎপর ও কুশল নৃপতি, আর কেহ ছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। রাজাধিরাজ মহারাজের রূপ, গুণ, বল, বীর্য্য ও শাসন ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি আর কি লিখিব ? তাঁহার উন্নত শির, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, গভীর নাভিদেশ, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, হাস্যোজ্জ্বল বদন ও রহস্যপূর্ণ সম্ভাষণ, কমলাননা কামিনীদিগকে সর্ব্বদা প্রফুল্লিত করিত। মহারাজ সদাচার সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, দাতা, জ্ঞানী, দেবদ্বিজানুরক্ত, শাক্ত শিরোমণি ও অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁহার অসীম গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, সত্যসন্ধিৎসা, ক্ষিপ্রকারিতা, সৎকর্ম্মানুরাগ, নীতিকুশলতা, গুণগ্রাহিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অসাধারণ গুণরাশির বর্ণনা, আমার মত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। সুপণ্ডিত ও সুকবিগণ, যাঁহারা পদ্য রচনা করিতে সক্ষম, তাঁহারা ভূপতির গুণাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন। আমার বক্তব্য এই যে, মহাভূপ রাজ্যভোগে ও রাজকার্য্যে সর্ব্বদা নির্বিষ্ট থাকিলেও তাঁহার অন্তঃকরণ সতত পরমার্থ চিন্তায় রত থাকিত এবং কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া তিনি পারত্রিক মঙ্গলার্থ যে সকল সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠান করিতেন তাহা অন্যের অসাধ্য। এইরূপভাবে নৃপতি ঐহিক সুখভোগ করিতে ছিলেন, কিন্তু সন্তানাদি না থাকায় তিনি নিরন্তর উদাস অন্তঃকরণে কলাতিপাত করিতেন। মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য কার্য্যকারক সকলও এই কারণে অতিশয় বিষণ্নচিত্ত ছিলেন। কবীন্দ্রনারায়ণ কুঙরের মৃত্যু হইলে ছোট সাহেবের পুত্রদিগের মধ্যে একজনকে দত্তক গ্রহণের বিষয় এই উপাখ্যান-বক্তা প্রসঙ্গক্রমে হুজুরের নিকট উল্লেখ করায় "বিবেচনা করিব", এইরূপ বলিলেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুস্তফী, গোপালমোহন মজুমদার ও আমার সহিত ঐ বিষয় পরামর্শ করিয়া ঐ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে বজ্রেন্দ্রনারায়ণ কুঙর সাহেবের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান চন্দেন্দ্র-নারায়ণ কাছুয়া সাহেবকে দত্তক গ্রহণ করিলেন। এই বালকের রূপ, লাবণ্য বালক সুলভ স্বভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে ভূপতি অতিশীঘ্রই তাহার বাধ্য হইলেন এবং শুভদিনে ও শুভলগ্নে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া তাহার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রাখিলেন। ভূপতির মনে সন্তানাভাবজনিত যে দুঃখ ছিল তাহা এক প্রকার দূর হইল। মহারাজ রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেন এবং নিকটে রাখিয়া তাহার বাল্যক্রীড়া দেখিতেন, এইরূপে ভূপতি আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, হঠাৎ এই সনের মাঘ মাসে গোপাল মোহন মজুমদার জ্বররোগে পরলোক গমন করিলেন। মহারাজ তাঁহার জন্য অনেক শোক প্রকাশ করিলেন। মজুমদার মহাশয়ের নিকট অনেক সরকারী কাগজপত্র থাকিত, তাহার অনুসন্ধান করিয়া দাখিলকরার জন্য দ্বারমোক্তার তারামোহন বক্সী ও আমার উপর আদেশ হওয়ায় আমরা
1845 ঐ সকল কাগজপত্রের তালিকা করিয়া দাখিল করিলাম। এই সালের মাঘ মাসে, ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, গৌহাটী হইতে এজেণ্ট সাহেব রাজধানীতে আগমন করিলেন এবং রাজকার্য্য সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অনেক কথোপকথন হইল। ভূপতির শরীর অসুস্থ থাকায়, তিনি সাহেবের তাম্বুতে যাইতে পারিলেন না। রাজাবাটীতে সাহেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকার কালে মহারাজ ৺কাশীক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা, সাহেবের নিকট উত্থাপন করিলে অনেক বিষয়ে আলাপ হইবার পর, সাহেব ঐ প্রস্তাবে এক প্রকার সম্মতি দিয়া ২।১ দিন পর গৌহাটী প্রস্থান করিলেন। গোপালমোহন মজুমদার পরলোক গমন করায় ফৌজদারী আদালতের কার্য্য প্রথমে মধ্যম সাহেবকে এবং কয়েক দিবস পরে, পুনরায় ঐ কর্ম্মের ভার দেওয়ানি আদালতের আহেলকার কাশীকান্ত লাহিড়ীর উপর অর্পিত হইল।

তিনি যোগ্যতার সহিত ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সন ১২৫১ সাল অতিবাহিত হইল। ইতি রাজোপাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়

৩৩৬ রাজশকের (১২৫২ বঙ্গাব্দে) শুভ পুণ্যাহের সময় রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। গুরুচরণ বাবুর প্রতি ভূপতির অসন্তোষ ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় এই সনের পুণ্যাহের সময় তাঁহাকে খানগীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ফৌজদারীর কার্য্য কাশীকান্ত বাবুর হস্তেই থাকিল। অন্যান্য কার্য্যকারকগণ পূর্ব্ববৎ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এই সনের শারদীয়া পূজার সময় এই উপাখ্যান বক্তা, বর্দ্ধাক্যবশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া স্থানান্তর গমন করিবার ইচ্ছায় বিদায় প্রার্থনা করিলে, ভূপতি বলিলেন, "ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে, আগামী বর্ষাকালের পূর্ব্বে আমারই কাশীক্ষেত্র যাত্রা করিবার ইচ্ছা আছে তৎকালে তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, অল্প দিনের জন্য সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত নয়।" আমি উত্তর দিলাম, "ধর্ম্মাবতার, অল্প দিন হইল রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন, আরও কিছুকাল রাজাভোগ করিয়া তীর্থযাত্রা করিলে কালোচিত কর্ম্ম করা হয়।" মহারাজ বলিলেন, "এ সকল কার্য্যের আর কালাকাল কি? সম্ভব হইলেই করা উচিত।" এইরূপ নানাবিধ বাক্যালাপ হইল। অতএব ভূপতির গমনাপেক্ষায় নিজের স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। কাশী যাত্রা সম্বন্ধে মহারাজ মন্ত্রিবর্গ সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। ছাড় পত্রের জন্য গৌহাটিতে এজেণ্ট সাহেবের নিকট পত্রাদি লিখিত হইল এবং ভূপতির প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত রাজধানীতে কে২ থাকিবেন ও কি নিয়মে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা হইতে লাগিল। এই সময়, পুস্তকের পূর্ব্বাধ্যায় পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া ভূপতির অবলোকনার্থ উপস্থিত করিলে, মহারাজ আজ্ঞা করিলেন, "এক্ষণে গমনোপলক্ষে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, মনোযোগ-পূর্ব্বক পুস্তকের সমস্ত বিষয় দেখিবার সুবিধা হইবে না, শীঘ্রই অবসরমত পাঠ করিয়া দেখিব। এ পুস্তকের এই স্থানেই শেষ হইল না, যে পর্য্যন্ত তুমি জীবিত আছ, সে পর্য্যন্ত তোমাকে লিখিতে হইবে। পুস্তক-খানি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় ইহাই আমার ইচ্ছা, তজ্জন্য যে ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা তোমাকে পরে বলিব।" মহারাজ এইরূপ নানা বিষয়ে আলাপ করিলেন। ইতি রাজো-পাখ্যানে প্রত্যক্ষ খণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

পরিশিষ্ট : ১

রাজোপাখ্যানের প্রামাণিকতা

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রাজত্বকালে তাঁহার আদেশে মুন্সী জয়নাথ ঘোষ মহোদয় কোচবিহার রাজবংশের যে ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন তাহা রাজোপাখ্যান নামে পরিচিত। ইহার ভূমিকা হইতে জানা গেল যে স্বর্গীয় মুন্সী মহোদয় মহারাজ নরনারায়ণ ও তৎ প্রপৌত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভাষদবর্গ কর্ত্তৃক লিখিত বিবৃতি সমূহের বিষয়বস্তু পরিজ্ঞাত ছিলেন।

এই গ্রন্থে লিখিত বর্ত্তমান রাজবংশের প্রথম ৩।৪ জন মহারাজের সিংহাসন আরোহণের শকাব্দ আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অনেকেই মুদ্রা ও সমসাময়িক বিবরণ দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। সুতরাং গ্রন্থকার প্রাচীন নির্ভরযোগ্য বিবরণের সাহায্য পাইয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

Gait সাহেব আহম বুরঞ্জী ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে অনুমান করিয়াছিলেন যে মহারাজ বিশ্বসিংহ অনুমানিক ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমানিক ১৫৪০ বা ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের যে কয়েকটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারারাণ চৌধুরী মহোদয় তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে রাজ্যাভিষেকের সময়ে মহারাজের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত হওয়া এবং ঐ মুদ্রা দ্বারা মহারাজকে নজর প্রদান করা কোচবিহার বংশের চিরাচরিত প্রথা। পরবর্ত্তী লেখকগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজোপাখ্যান অনুসারে মহারাজ বিশ্বসিংহ ১৪৭৬ শকাব্দে চিরতরে কৈলাস পর্ব্বতে প্রয়াণ করেন। নরনারায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না। রাজোপাখ্যান অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃসিংহ দেবের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইয়াছিল। নানা দেশ হইতে নিমন্ত্রিত ব্রহ্মাণ ও পণ্ডিতগণ সমাগত হইয়াছিলেন। অভিষেকের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাজ নরনারায়ণের স্ত্রী নৃসিংহদেবকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন "রাজরাণী হও"। এখন যদি তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তবে তাঁহার বাক্য মিথ্যা হয়। নিজ বাক্য রক্ষার্থে নৃসিংহ দেব নিজে রাজা হইলেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণ সিংহাসন পাইলেন। পূর্ব্বকালে হিন্দুরা নিজ বাক্য রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং এই আখ্যান সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। রাজোপাখ্যানে বর্ণিত কারণের জন্যই হউক বা সিংহাসন লাভের জন্য অথবা গৃহবিবাদের জন্যই হউক মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ১৪৭৭ শক বা ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। মহারাজ

বিশ্বসিংহের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই রাজ্যাভিষেক হয় নাই। সুতরাং ১৪৭৬ শকে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা যথার্থ।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কন করা স্বাধীনতার একটি বিশের চিহ্ন ছিল। চন্দন দেশাধিপতি রাজা ছিলেন না। মহারাজ বিশ্বসিংহ স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আহোম রাজ ও গৌড়ের সুলতানদিগের অপ্রীতিভাজন হওয়া যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা না করায় মুদ্রা প্রস্তুত করেন নাই ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। আসাম বুরঞ্জীতে লিখিত আছে যে মহারাজ বিশ্বসিংহ মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া বাস করিতে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। (শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার ভূইঞা মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত আসাম বুরঞ্জী—২১ পৃঃ)। রাজোপাখ্যানে মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্যাভিষেককালে মুদ্রা প্রস্তুত হওয়ার কথা লিখিত আছে। চন্দন ও বিশ্বসিংহের সময়ে মুদ্রা প্রস্তুত হওয়া সম্বন্ধে কিছু লিখা নাই। আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই কিন্তু নরনারায়ণ মহারাজের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

কোচবিহারের ইতিহাস ১ম খণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে মহারাজ নারনারায়ণ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের যে কয়েকটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি ১৪৭৭ শকাব্দ বা ৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় একজন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ সিংহাসন প্রাপ্তির ২২ বৎসর পরে মুদ্রা প্রচলন করেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের স্বপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। আসাম বুরঞ্জী অনুসারে মহারাজ বিশ্বসিংহ 'চুকাম্ ফাখোরা রাজার' রাজত্বকালে (১৫৫২ খৃঃ—১৬১১ খৃঃ) ইহলোক পরিত্যাগ করেন (শ্রীযুক্ত ভূঞার আসাম বুরঞ্জী—৩১ পৃঃ)। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে শের শাহের পুত্র শেলিম শাহের রাজত্বকালে মহারাজ বিশ্বসিংহ গৌড় বিজয় করিয়াছিলেন। ইহা অত্যুক্তি হইতে পারে কিন্তু মহারাজের ভ্রাতা শিষ্যসিংহ এই সময় হইতে বৈকুণ্ঠপুরে বাস স্থাপন করেন। সুতরাং কোন মুসলমান ঐতিহাসিক ইহার উল্লেখ না করা সত্বেও কামতা রাজ্যের যে অংশ গৌড় রাজ্য ভুক্ত হয় তাহার কিয়দংশ এই সময়ে বিশ্বসিংহ পুনরুদ্ধার করেন ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। সমুদ্র নারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহের আসাম আক্রমণের পরে—

"এহি হৌক বুলি সব পাঙ্গাত আসিলা।
কান্ত নামে নগরেতে আনন্দে রহিলা ॥

কোচবিহারের ইতিহাস—৯০ পৃঃ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে গৌড় রাজ্য আক্রমণকালে বিশ্বসিংহ কান্ত নগরে অস্থায়ী

রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেলিম শাহ ১৫৪৫—১৫৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ অন্তিমকালে পুত্রদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। পিতৃ আজ্ঞা অনুযায়ী মহারাজ নরনারায়ণ রাজ্যাভিষেক কালে স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৪৭৭ শক)। সুতরাং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের তিরোধান এবং নরনারায়ণের রাজ্যাভিষেক সম্ভব নহে।

"Mugal North Eastern Frontier Policy" প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, পি, আর, এস্ মহাশয় মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজ্যরোহণকাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে মহারাজ নরনারায়ণ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা ধরিলে তিনি আনুমানিক ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন। খাঁ চৌধুরী মহোদয় তাঁহার কোচবিহারের ইতিহাস ১ম খণ্ডে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ১৫০৯ শকের কতিপয় মুদ্রায় ৯২ অঙ্ক দেখিয়া তাহা কোচবিহার রাজশকের অঙ্ক মনে করিয়া এবং জনপ্রবাদ এবং রাজবংশের প্রচলিত সংস্কার অনুসারে চন্দন প্রথম রাজা ইহা গ্রহণযোগ্য মনে না করিয়া মহারাজ বিশ্বসিংহ ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জন প্রবাদ, আসাম বুরঞ্জী ও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হোসেন শাহ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামতা নগরী ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব্ব বড় নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া তাঁহার পুত্র দানিয়ালকে শাসনকর্ত্তারূপে হাজতে রাখিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ষাগমে আসামরাজ মুসলমান সেনা আক্রমণ করিয়া দানিয়ালকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। মঙ্গের দুর্গের পুরাতন প্রাচীরের নিকটে এক মুসলমান ফকিরের দরগা আছে, এই দরগায় পূর্ব্ব দিকের প্রাচীরে একখানি শিলালিপি আছে, তদনুসারে ৯০৩ হিজরায় (১৪৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে) রাজপুত্র দানিয়াল একটি গম্বুজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে দানিয়ল মুঙ্গেরে ছিলেন সুতরাং ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কামরূপে নিহত হন নাই এবং আহমরাজ কর্তৃক মুসলমানগণ পরাজিত হন নাই। তৎ পূর্ব্বে কোচবিহার রাজ্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে। মালদহে ইংরাজ বাজারের থানার নিকটে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদনুসারে কামরূপ ও কামতা বিজয়ী আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ৯০৭ হিজরার রমজান মাসের প্রথম দিবসে (১০ই মার্চ্চ ১৫০২ খৃষ্টাব্দে) একটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি শক্তিশালী দক্ষ নরপতি ছিলেন। যদি ১৫০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কামতা কামরূপ তাহার অধিকারভুক্ত না থাকিত তবে তিনি উক্ত সনে খোদিত শিলালিপিতে নিজেকে কামতা কামরূপ বিজয়ী আখ্যা প্রদান করিয়া বৃথা গর্ব্ব করিতেন না। সুতরাং ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ রাজপদ লাভ করেন নাই ইহা নিশ্চিত। হোসেন শাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত কামতা কামরূপে তাঁহার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই ইহা মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহের

রাজত্বকালে মুসলমানদিগের আসাম আক্রমণের (১৫২৭—১৫৩২) পূর্ব্বেও কামতা কামরূপ বিজয় করা আবশ্যক হয় নাই। সুতরাং সেই সময় পর্য্যন্ত কামতা কামরূপ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদিগের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে নাই ইহা মনে করা অযৌক্তিক নহে।

রাজোপাখ্যান অনুসারে বিশ্বসিংহ ১৪৩৫ বা ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরাক্রমশালী গৌড় বাদশাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব হইতে কামতা কামরূপ রাজ্যে মুসলমান অধিকার শিথিল হইয়াছিল। সুতরাং চন্দন কিছুদিন রাজত্ব করেন এবং বিশ্বসিংহ ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে দেশাধিপতি মহারাজ হইলেন—রাজোপাখ্যানের এই বিবরণ আদৌ আসাম ও বঙ্গের স্বীকৃত ইতিহাস বিরুদ্ধ নহে। অতএব গ্রহণযোগ্য।

রাজোপাখ্যান অনুসারে মহারাজ নরনারায়ণ ১৪৮৪ শকাব্দে Sukhang karfa এর রাজত্বকালে আসাম জয় করেন। আসাম বুরঞ্জী অনুসারে ১৪৮৪।১৪৮৫ শকাব্দে চুখান্ ফার (Sukhang fa) রাজত্ব কালে ইহা ঘটিয়াছিল।

মহারাজ চন্দনের সময় হইতে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যাভিষেক কাল পর্য্যন্ত রাজোপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনাবলী স্বীকৃত ইতিহাস বিরুদ্ধ না হওয়ায়, এবং বহুলাংশে মুদ্রা, সমসাময়িক ইতিহাস প্রভৃতি দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে রাজোপাখ্যান প্রণেতা মহারাজ নরনারায়ণের সমসাময়িক বিদ্বজ্জন দ্বারা প্রণীত পুস্তক সমূহের বিষয়বস্তু পরিজ্ঞাত ছিলেন। উক্ত মহোদয়গণ চন্দন, বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যাভিষেক কাল ও অন্যান্য বিবরণ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা বা প্রতক্ষ্যদর্শী জনগণ হইতে পরিজ্ঞাত ঘটনা। সুতরাং যত কাল পর্য্যন্ত অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ (মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি) দ্বারা উহা খণ্ডিত না হয় ততকালে উহা গ্রহণ না করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অবশ্য পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে রাজবংশের বিবরণ, লেখকদিগের উক্তি অন্য কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হইলে নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ না করা যাইতে পারে। কারণ এই সকল বিবরণী রচয়িতাদিগের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরববর্দ্ধক অথবা অগৌরব বা কলঙ্ক লঘু কারক উক্তি করা বা তৎসম্বন্ধে নীরব থাকা স্বাভাবিক।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু, মহারাজ বীরনারায়ণের রাজ্যাভিষেক ও মৃত্যু ও মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যাভিষেকের রাজোপাখ্যানে লিখিত তারিখ, প্রাণনারায়ণের মুদ্রা, প্রত্যক্ষদর্শী পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকের বিবরণ ও সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত বিবরণ দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নহে। ভুল সময় লিপিবদ্ধ করার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। মনে হয় যে পুস্তকের সাহায্যে বীরনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ মহারাজ দ্বয়ের রাজত্বকালের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহাতে মহারাজদিগের রাজ্যকালের পরিমাণ লেখা

হইয়াছিল কিন্তু শকাব্দ লিপিবদ্ধ হয় নাই। ঐ পুস্তক অনুসারে বীরনারায়ণ ৫ বৎসর ও প্রাণনারায়ণ ৩৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে বা অন্য কোন প্রকারে নির্ণীত মহারাজ প্রাণনারায়ণের মৃত্যুকাল ১৫৬ রাজশক বা ১৫৭৮ শকাব্দ। সুতরাং ইহার ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৭ রাজশক ও ১৫৪৮ শকাব্দে মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজ্যাভিষেক এবং তাহার ৫ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বীরনারায়ণের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। ইহাই খুব সম্ভব রাজোপাখ্যানের ভ্রান্তির কারণ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মহারাজ প্রাণনারায়ণের মৃত্যু ১৫৬ রাজশকে হয় নাই। তাঁহার নামাঙ্কিত ১৬১ রাজশকে প্রস্তুত একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার আমলের মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তাঁহার অভিষেক ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। তিনি ৩৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা যদি সত্য হয় তবে তিনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজোপাখ্যান অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মোগল বাদশাহের সহিত যে সন্ধি হয় তাহার সর্তানুসারে পূর্ণ মুদ্রা প্রস্তুতকরণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মহারাজ প্রাণনারায়ণের পূর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ মত নির্ভুল নহে। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে সামন্তশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিলেন। সামন্ত রাজগণ বাদশাহের বিনানুমতিতে বাদশাহী রাজধানী পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্য তিনি ঢাকা ও আগ্রা নগরীতে প্রায় চার বৎসর অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া মোগল বাদশাহের কার্য্যে হাজোনগরীতে অবশিষ্ট কালযাপন করেন। এই সময় গাবুর সাহ (বীরনারায়ণ) রাজ্যশাসন করেন। খুব সম্ভব সামন্ত রাজগণের মুদ্রা প্রস্তুত করার অধিকার ছিল না এবং বেহার রাজ্যেরও নূতন প্রস্তুত করণের বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই জন্যই মহারাজ বীরনারায়ণের নামঙ্কিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। মহারাজ বীরনারায়ণ অভিষেক কালে মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন কি না তৎসম্বন্ধে রাজোপাখ্যানে কোন উক্তি নাই। মহারাজ প্রাণনারায়ণ পরাক্রমশালী ছিলেন। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা পর্তুগীজ দলনে ব্যস্ত ছিলেন। অতএব মহারাজ প্রাণনারায়ণ নির্ভয়ে নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করাইলেন। সম্রাট ও প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা নানাবিধ গুরুতর কার্য্যে (বিদ্রোহদমন, দাক্ষিণাত্য জয়, পর্ত্তুগীজ দখল ও আসাম অভিযান) ব্যাপৃত থাকায় নিষেধ অমান্য করার জন্য শাস্তি প্রদানে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। এবং মোগলরাজ্যে ভ্রাতৃ বিরোধ যুদ্ধের সুযোগে মহারাজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এবং মোগল অধিকৃত কামরূপ এবং ঘোড়াঘাট অধিকার করেন। কিন্তু তিনি ঢাকানগরী অধিকার করেন ইহা আদৌ সম্ভব নহে। অনেক সময় রাজধানীর নাম অনুসারে রাজ্য এবং রাজ্যের নাম অনুসারে রাজধানী পরিচিত হয়। সেই সময়ে ঢাকানগরী বাঙ্গলা

প্রদেশের রাজধানী ছিল। সেই জন্য বোধ হয় কোন অপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থকার মহারাজ ঘোড়াঘাট অধিকার করায় তিনি ঢাকা নগরী অধিকার করিয়াছিলেন ইহা লিখিয়া ছিলেন। পাঠান শাসন কালে রাজধানী গৌড়ে ছিল সুতরাং দেশও গৌড় নামে খ্যাত ছিল। বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণের সময়ে বঙ্গের কিয়দংশ বিজিত হইয়াছিল কিন্তু রাজোপাখ্যানে তাঁহারা গৌড় নগরী বা রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এইরূপ লিখা আছে। একই কারণে য়ুরোপীয় লেখাকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঢাকা নগরীকে বাঙ্গলা নামে অভিহিত করিয়াছেন। উক্ত নগরীর একাংশ বাঙ্গালা বাজার নামে অদ্যাপিও খ্যাত আছে। (Taylor's Topography and statistics of Dacca)। সাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপিত হইবার পরে মীরজুমলা কোচবিহার বিধ্বস্ত করিয়া এই রাজ্যে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া আসাম আক্রমণ করেন। আসামের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় অনেক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল, মীরজুমলাও গুরুতর রূপে পীড়িত হলেন এবং আহোম রাজের সহিত সন্ধি করিয়া ঢাকা অভিমুখে রওনা হইলেন কিন্তু পথি মধ্যে দেহত্যাগ করিলেন। ইতি মধ্যে মহারাজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। পরবর্ত্তী শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ নানাবিধ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কোচবিহার রাজ যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ ও কর প্রদানের অঙ্গীকার করায় এবং পূর্ণ মুদ্রা অঙ্কিত না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া বেহার অধিপতিকে নিষ্কৃতি দিলেন। খুব সম্ভব মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ যখন মানসিংহের শাসনকালে মোগল আনুগত্য স্বীকার করেন তখনও অর্দ্ধ মুদ্রা প্রস্তুতের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় রাজ খণ্ডে লক্ষ্মীনারায়ণের সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে অর্দ্ধমুদ্রা প্রচলনের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তিনি সামন্ত শ্রেণী ভুক্ত হওয়ায় মুদ্রা প্রস্তুত নিষিদ্ধ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে এবং মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়া এবং শেষোক্ত মহারাজের করদ মিত্র নরপতি শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় অর্দ্ধমুদ্রা প্রচলনে বাধ্য হওয়া সম্বন্ধে তুষ্ণীভাব অবলম্বিত হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সামন্ত রাজ্যগুলি মোগল সুবার অন্তর্গত হইত কিন্তু সীমান্তে অবস্থিত অর্দ্ধস্বাধীন করদ রাজ্যগুলি মোগল সুবাভুক্ত হইত না। মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে রাজখণ্ড রচিত হইয়াছিল। মহারাজের পিতামহ ও পিতা মোগল সাম্রাজ্যের সামন্ত শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং মুদ্রা প্রস্তুত করার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন ইহা একান্ত অনুপাদেয়—সুতরাং রাজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হয় নাই ইহা মোটই বিচিত্র নহে। রাজোপাখ্যান প্রণেতা এই যুগের ইতিহাস সঙ্কলনে রাজখণ্ড অপেক্ষা প্রামাণিক কোন গ্রন্থের সাহায্য লাভের সুযোগ পান নাই সুতরাং রাজখণ্ডের বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন। যে সকল স্থলে অধিকতর নির্ভর যোগ্য প্রমাণের সহিত বিরোধ নাই সেই সকল ক্ষেত্রে রাজোপাখ্যান বর্ণিত ঘটনাসমূহ প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হওয়ার

যোগ্য, কারণ ইহা সমসাময়িক বিবরণ দৃষ্টে লিখিত হইয়াছিল ইহা আনুমান করা যাইতে পারে।

মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্ব কালের পর হইতে মুন্সী মহোদয় যখন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সময় পর্য্যন্ত প্রায় ১২৫ বৎসরের ইতিহাস সঙ্কলনে তিনি কোন প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্য পান নাই। বৃদ্ধ পারম্পর্য্য শ্রুত কাহিনী এবং Mercer and Chauvet সাহেবদ্বয়ের নিকট প্রদত্ত বিবরণ ও পরস্পর বিরোধী উক্তিপ্রত্যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই যুগের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে দেশে গৃহবিবাদ, যুদ্ধ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। ইহাকে Period of Confusion or dark age বলা যাইতে পারে। এই জন্যই প্রধান-মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, 'কাহার পর কে রাজা হইয়া কতদিবস রাজত্ব করিয়াছিলেন ও কতিসংখ্যক রাজা হইয়াছেন এবং শিবসন্তান কত পুরুষ এখনি অনেকে বলিতে পারেন না"। স্থতরাং এই যুগের বিবরণে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকা নিশ্চিত। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্র-নারায়ণের রাজত্ব কালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল এবং তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; স্থতরাং নির্ভুল হওয়াই সম্ভব।

—অমৃতনারায়ণ গুপ্ত, বি.এ.

[কোচবিহার দর্পণ: ২রা আশ্বিন ও ২১শে আশ্বিন ১৩৪৫, থেকে পুনর্মুদ্রিত]

পরিশিষ্ট: ২

"কোচবিহারের ইতিহাস" সমালোচনার উত্তর

রাজোপাখ্যান

বিগত, ২রা আশ্বিন এবং ২১শে আশ্বিন তারিখের **কোচবিহার দর্পণে** শ্রীযুক্ত অমৃত-নারায়ণ গুপ্ত বি এ. মহাশয়ের লিখিত **রাজোপাখ্যানের প্রামাণিকতা** নামক দুইটি আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আমার সঙ্কলিত **কোচবিহারের ইতিহাস** (১ম খণ্ড) পুস্তকের কতকগুলি বৃত্তান্তের উপরে সন্দেহ এবং কয়েকস্থলে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। আলোচনার অন্তিমভাগে কিছু কিছু সমর্থক বাক্য আছে, কিন্তু তাহা আমার লিখিত সংবাদের সমর্থন কি না, তাহা প্রকাশ নাই।

উল্লিখিত সন্দেহ এবং বিরুদ্ধমতের পক্ষে এবং বিপক্ষে কতকগুলি উক্তি উক্ত ইতিহাসে মুদ্রিত আছে, কিন্তু আলোচনায় তাহা উদ্ধৃত হয় নাই। দর্পণের সমস্ত পাঠক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, মনে করিতে পারি না; স্থতরাং তাহাতে লিখিত কতকগুলি বৃত্তান্তের এস্থলে পুনরুক্তি করিতে হইবে। গুপ্ত মহাশয়ের উল্লিখিত দুইটি আলোচনা বস্তুতঃ পৃথক্ নহে এবং প্রধানতঃ রাজোপাখ্যান পুঁথিকে সমর্থন করিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন। আমি সেই পুঁথির পরিচয় প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় কিছু বলিব; পরে আলোচনার বিষয়ীভূত সংবাদ এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট সময় সম্পর্কে সাধ্যানুসারে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

রাজোপাখ্যান একখানা কোচবিহার-রাজবংশাবলী পুঁথি। রাজকর্ম্মচারী মুন্সী জয়নাথ ঘোষ মহাশয় ১৮২৩-৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুঁথির রচনা আরম্ভ করিয়া ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র কমিশনার অফিসের সেরেস্তাদার আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত পুঁথি অবলম্বনে **কোচবিহারের ইতিহাস** নামক একটি প্রবন্ধ রচনা এবং তাহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন যে এই দেশের প্রামাণিক ইতিবৃত্তাদি কিছু পাওয়া যায় না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি. আই. ই. মহাশয় এক মোকদ্দমা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে জয়নাথ মুন্সীর পুস্তক সর্ব্বত্র শুদ্ধ নহে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের সাব ডেপুটি স্থপারিণ্টেডেণ্ট ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত **কোচবিহারের ইতিহাস** পুস্তকের ভূমিকায় **রাজোপাখ্যান পুঁথিকে** "অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক উপন্যাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন না কেন, পরবর্ত্তী শিক্ষিত সমাজ পুঁথিখানাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ সমস্ত মন্তব্যের মধ্যে অন্ততঃ তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

যাহাই হউক গুপ্ত মহাশয় তাঁহার আলোচনার মধ্যে রাজোপাখ্যানের প্রামাণিকতা সম্পর্কে পুঁথির ভূমিকা অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে—"মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে প্রণীত 'রাজখণ্ডের' রচয়িতা মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে লিখিত বিবরণ দেখিয়াছিলেন এবং রাজোপাখ্যান রচয়িতা রাজখণ্ডের বিষয়বস্তু পরিজ্ঞাত ছিলেন।" (দর্পণ ৯২ পৃঃ) পরে লিখিয়াছেন "ভূমিকা হইতে জানা গেল যে স্বর্গীয় মুন্সী মহোদয় মহারাজ নরনারায়ণ ও তৎপ্রপৌত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভাসদবর্গ কর্তৃক লিখিত বিবৃতি সমূহের বিষয়বস্তু পরিজ্ঞাত ছিলেন।"*

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মুখ্য এবং গৌণপ্রমাণ সমশ্রেণীভুক্ত নহে। গুপ্ত মহাশয়ের উপরের উক্তি অনুসারে একটি গৌণ এবং একটি মুখ্য প্রমাণের অন্তর্গত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার পরের উক্তি হইতে দুইটিকেই মুখ্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় গুপ্ত মহাশয়ের উক্তি এবং আমার বক্তব্য বিচারের সুবিধার জন্য আমি পুঁথির ভূমিকার আবশ্যক অংশ পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। রাজোপাখ্যান রচনার প্রয়োজনে তাৎকালিক রাজমন্ত্রী কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের উক্তি বলিয়া গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"যোগিনীতন্ত্রে শিববংশীয় রাজা সকলের স্থূল প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা আকল্প পর্য্যন্ত প্রতি কলিযুগে হইতেছে হবেক বর্ত্তমান কলিযুগে ঐ তন্ত্র সম্মত যে সকল রাজা হইয়াছেন তাহাদের প্রস্তাবের যে সকল পুস্তক ছিল প্রায় লোপ হইয়াছে এবং বৃদ্ধ পারম্পর্য্য রূপে যে প্রকাশ ছিল যাঁহারা……দ্বর্ত্তা ছিলেন এহিক্ষণ তাহারাই অতীত হইয়াছেন অনুমান হয় ইহার পর এ সকল প্রস্তাব লোপ হবেক। কাহার পর কে রাজা হইয়া কত দিবস রাজত্ব করিয়াছেন ও কতি সংখ্যা রাজা হইয়াছেন এবং শিব সন্তান কত পুরুষ অখনি অনেকে বলিতে পারেন না।

"তুমি মহারাজা নরনারায়ণের সভাস্থ সর্ব্ববেত্ত্বা উপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব অনুসারে প্রাণনারায়ণ মহারাজার সময় কবিরত্ন যে **রাজখণ্ড** নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল তাহা এবং অপর রাজাদিগের প্রস্তাব মেছর সাহেব এবং সরবিট সাহেবের বিচার সময় যে সংগ্রহ হইয়াছিল সকল জ্ঞাতাছ। আর মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সভাস্থ লোকের সহিতো তোমার এ সকল প্রস্তাব আলোচনা ছিল। তোমার চতুর্থকাল অনিত্যশরীর উচিত যে তন্ত্রসম্মত উপরের লিখিত অনুসারে কি যত প্রস্তাব সহিত শ্রেণীক্রমে লিপিদ্বারা রক্ষণ কর।"

উদ্ধৃত ভূমিকার প্রথম এবং অন্তিমভাগের উক্তি একরূপ নহে। প্রথমাংশ পাঠে পুঁথির

*কোচবিহার রাজবংশে মহারাজ বিশ্বসিংহের পরবর্ত্তী চারিজন রাজার নাম পুত্রক্রমে এইরূপ—নরনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বীরনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণ।

উপকরণ সম্বন্ধে অন্তরে যে নিরাশার সঞ্চার হয়, পরবর্ত্তী অংশ পাঠে তাহা থাকে না। এই পুঁথি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক দিয়া মত প্রকাশের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভূমিকার পরবর্ত্তী অংশের উপরেই আমার বক্তব্য বলিব। এই অংশে চারিটি উপকরণের সংবাদ লিখিত আছে ;—

১। কবিরত্ন বিরচিত রাজখণ্ড পুঁথি।

২। মেছর ও সরবিট (কমিশনার মার্শী ও শোভে) সাহেবের বিচার সময়ে সংগৃহীত অপর রাজাদিগের প্রস্তাব।

৩। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সভাস্থ লোকের সহিত মুন্সী জয়নাথ ঘোষের আলোচনা।

৪। তন্ত্রসম্মত বিবরণ।

রাজখণ্ড পুঁথি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। রাজোপাখ্যানের পূর্ব্বের কোন কাগজপত্রেও তাহার নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। রাজোপাখ্যানে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্ব বিবরণে লিখিত আছে যে, এই রাজার সভাসদ পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ রত্নমালা ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। (নরখণ্ড ৪র্থ অঃ) মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্ব বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে দেশে বিদ্যাচর্চ্চা প্রসারলাভ করিয়াছিল, রাজা পঞ্চরত্ন পণ্ডিতসভা গঠন করিয়াছিলেন, তিনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীত সম্পর্কে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি। ইহাতে কবিগণের নাম আছে, কিন্তু রাজখণ্ডের কোনই উল্লেখ নাই। (নরখণ্ড ৭ম অঃ)।

মুন্সী জয়নাথ ঘোষ আসামের হয়গ্রীব মাধবের মন্দির দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, মহারাজ নরনারায়ণ উক্ত দেবতার সেবাপূজার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ তিনি তথায় "জিজ্ঞাসা করাতে" অবগত হইয়াছেন। (নরখণ্ড ৩য় অঃ) প্রাণনারায়ণ রাজার রচিত উল্লিখিত গ্রন্থের সংবাদ "আমি শুনিয়াছি" বলিয়া তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু রাজখণ্ড সম্পর্কে শুনিয়াছি বা দেখিয়াছি কিছুই লেখেন নাই।

মহারাজ প্রাণনারায়ণ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের সময়ের বহু সংবাদ রাজোপাখ্যানে নাই ; এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ সম্ভবপর নহে। আলোচনার প্রয়োজনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। কবিরত্ন (?) এবং শ্রীনাথ পণ্ডিত উভয়েই মহারাজ প্রাণনারায়ণের সভাসদ ছিলেন এবং দুই জনেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনাথের লিখিত গ্রন্থের সংবাদ তাঁহার স্বরচিত **বিশ্বসিংহ চরিত** পুঁথি (অসম্পূর্ণ) হইতে এবং কবিরত্নের লিখিত "রাজখণ্ড" পুঁথির সংবাদ রাজোপাখ্যানের উল্লিখিত ভূমিকা হইতে জানা যাইতেছে। রাজোপাখ্যান (যাহা রাজখণ্ডের বিষয়বস্তু জ্ঞাত থাকিয়া রচিত, বলা হইয়াছে)

এবং বিশ্বসিংহ চরিত হইতে প্রায় পরস্পর বিরোধী দুইটি সংবাদের প্রথমেই উল্লেখ করিতেছি।

১। রাজোপাখ্যানে মহারাজ নরনারায়ণের দুইজন মাত্র ভ্রাতার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশ্বসিংহ চরিতে তাঁহার অনেক ভ্রাতা ছিল বলা হইয়াছে এবং দরঙ্গরাজ বংশাবলীতে তাঁহাদের নাম লিখিত আছে।* আসাম বুরুঞ্জী এবং বাহরিস্তানে ঘাইবী পুস্তক হইতেও তাহা অনেকটা সমর্থিত হয়।

২। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে রাজ্যে "উপপ্লব" (উপপ্লব-বিপদ, উপদ্রব) ছিল না; বিশ্বসিংহ চরিত, আকবরনামা এবং রিয়াজোস সালাতিনে সোলোমান কররাণী কর্ত্তৃক কামতারাজ্য আক্রান্ত এবং রাজার সহিত ঘোর যুদ্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে।

৩। মহারাজ নরনারায়ণের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য এবং তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের সংবাদ রাজোপাখ্যানে নাই। দরঙ্গরাজ বংশাবলী এবং আকবরনামায় তাহা লিখিত আছে।

৪। রাজাপাখ্যানের মতে মহারাজ নরনারায়ণ কোন যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। দরঙ্গরাজ বংশাবলীর বর্ণনা অনুসারে তিনি গৌড়যুদ্ধে পরাজিত এবং শুক্লধ্বজ বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি পরে আসামেও যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন (আসাম বুরুঞ্জী) শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণের বিদ্রোহে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৫। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনীর সহিত জয়পুররাজ মানসিংহের এবং মহারাজ প্রাণনারায়ণের ভগিনীর সহিত নেপাল-রাজ প্রতাপমল্লের বিবাহ হইবার সংবাদ ঐ সমস্ত দেশের ইতিহাসে লিখিত আছে, কিন্তু রাজোপাখ্যানে তাহা লিখিত নাই।

৬। কামরূপের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক মহাপুরুষ শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব এবং বনবালী গোঁসাইর নাম কোচবিহারের মৃত্তিকায় লিখিত আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ সমস্ত মহাপুরুষের সংস্রবে কোচবিহার তীর্থস্থানে পরিগণিত হইয়াছে এবং তাঁহারা নানা দিক দিয়া সমসাময়িক মহারাজগণের সহিত ব্যক্তিগত ভাবেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাজোপাখ্যানে ইহাদের নাম পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই।

৭। মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে রাজ্যে কোন "উৎপাত উপপ্লব" ছিল না এবং রাজার অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে। রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জী,

---

*মহারাজ নরনারায়ণের পিতৃব্য। শিষ্যসিংহ জলপাইগুড়ির রায়কত বংশ, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা নরসিংহ হইতে পাঙ্গার (রঙ্গপুর জেলার) রাজবংশ এবং অপর ভ্রাতা শুক্লধ্বজ হইতে আসামের অন্তর্গত বিজনী, দরঙ্গ এবং বেলতলার রাজাবংশ উদ্ভূত হইয়াছে।

তারিখে আসাম এবং আলমগীর নামায় তাঁহার যুদ্ধে যোগদান এবং দেশত্যাগ করার সংবাদ লিখিত আছে। ঐ সময়ে রাজ্যের বহু অংশ হস্তচ্যুত হইবার সংবাদও পাওয়া যায়।

উল্লিখিত সংবাদগুলির প্রত্যেকটির গুরুতর এবং সুপ্রচারিত ছিল বলিয়াই অন্যান্য দেশের ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। গুপ্ত মহাশয়ের কথিত সভাসদগণ তাঁহাদের সমসাময়িক এবং আশ্রয়দাতা রাজগণের "উপাদেয়" এবং "গৌরব বর্দ্ধক" অধিকন্তু প্রকৃত সংবাদগুলি ত্যাগ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহা অবস্থানুসারে হওয়া অসম্ভব; তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং বিচার বুদ্ধির অভাব সূচিত করে বলিয়াও গ্রহণের অযোগ্য। রাজোপাখ্যানের ভূমিকায় অধিকতম স্পষ্ট উক্তি লিখিত থাকিলে কিংবা সেই সমস্ত সভাসদের নামাঙ্কিত এবং রাজোপাখ্যানের অনুরূপ বিবরণ সংবলিত কোন গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গেলেও তাহাদের বৃত্তান্তগুলির শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দেখার আবশ্যক হইত।

মহারাজ নরনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণের সময়ের লিখিত বিবরণ রাজোপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ইহা অনুমান করিবার উপযুক্ত কোনও উক্তি যে পুথির অভ্যন্তরে নাই, ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি। পুঁথির অভ্যন্তরে লিখিত থাকিলেই যে তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে, ইহাও বলা চলে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভূমিকার লিখিত "তন্ত্রসম্মত" বিবরণের উল্লেখ করিতেছি। যোগিনীতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত বলিয়া কতকগুলি বৃত্তান্ত বস্তুতঃ রাজোপাখ্যানের অভ্যন্তরে লিখিত হইয়াছে। (দেবখণ্ড ১ম ও ২য় অঃ) কিন্তু উক্ত তন্ত্রে ঐ সমস্ত বাক্যের উল্লেখ নাই। যোগিনীতন্ত্র রাজখণ্ডের অনুরূপ বিলুপ্ত গ্রন্থ নহে, সুতরাং রাজোপাখ্যানের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিবার সকলেরই সুযোগ রহিয়াছে। কলিকাতার বিভিন্ন প্রেসে মুদ্রিত কয়েকখানা এবং বোম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত একখানা যোগিনীতন্ত্র দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে রাজোপাখ্যানে উদ্ধৃত বাক্যাবলীর কতিপয় শব্দ ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশ্বকোষের সম্পাদক মহাশয় দুইখানা হস্তলিপি যোগিনীতন্ত্রেও তাহা পান নাই। (৪র্থ ভাগ ৫২১ পৃঃ) এমতাবস্থায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যেরূপ উক্তিই হউক না কেন, তাহাদের নির্ব্বাচনে বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক।

উল্লিখিত নানা কারণে আমি রাজোপাখ্যানের বৃত্তান্তগুলি যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। রাজখণ্ড পুঁথি হয়তঃ রচিত হইয়াছিল এবং তাহা আবিষ্কৃত হইতেও পারে, কিন্তু সেই অদৃষ্ট গ্রন্থকে রাজোপাখ্যানের ভূমিকার অস্পষ্ট উক্তির সাহায্যে সুপরিচিত করিতে যাওয়া সমীচীন মনে হয় না।

রাজোপাখ্যানের ভূমিকা অবলম্বনে লিখিত গুপ্ত মহাশয়ের যে সমস্ত উক্তি সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত করিয়াছি ঐ সম্পর্কে তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তি পূর্ব্বের অনুরূপ নহে। তিনি পরে লিখিয়াছেন -- মহারাজ নরনারায়ণের সমসাময়িক বিদ্বজ্জন "চন্দন, বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যাভিষেককাল ও অন্যান্য বিবরণ যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা

বা প্রত্যক্ষদর্শী জনগণ হইতে পরিজ্ঞাত ঘটনা।" ইহার পরে তিনি রাজোপাখ্যানে প্রদত্ত বীরনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ রাজার রাজ্যারম্ভকাল শুদ্ধ নহে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন— "মনে হয় যে পুস্তকের সাহায্যে বীরনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ মহারাজদ্বয়ের রাজত্বকালের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মহারাজদিগের রাজত্বকালের পরিমাণ লিখা হইয়াছিল, কিন্তু শকাব্দ লিপিবদ্ধ হয় নাই।" ভূমিকার বিবরণ হইতে উল্লিখিত "প্রত্যক্ষদর্শীর" অস্তিত্ব এবং একখানা গ্রন্থে দুই প্রকারের বর্ণনা পদ্ধতি লিখিত থাকা মনে করা চলে কি না, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

রাজোপাখ্যান রচনার পরে যাঁহারা কোচবিহারের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্যর এডওয়ার্ড গেইট মহাশয় ব্যতীত অপর কেহ গবেষণা করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া অবগতি নহি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা কালে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে কোচবিহার-রাজবংশের সংবাদ প্রদানকালে স্যর এডওয়ার্ডের মতানুসরণ করিয়াছেন। গুপ্ত মহাশয় স্বমত সমর্থনের জন্য যে কয়েকখানা আধুনিক পুস্তকের নাম করিয়াছেন, সে সমস্ত গতানুগতিকভাবে রাজোপাখ্যানকে ভিত্তি করিয়াই লিখিত, সুতরাং তাহাদের পৃথক আলোচনার প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুপ্ত মহাশয় আলোচনার প্রথমে রাজোপাখ্যানের উপকরণের প্রতি যতটা আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্তিমভাগে ততটা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে "রাজবংশের অসম্মানকর সংবাদগুলি অনুপাদেয়, সুতরাং রাজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হয় নাই, ইহা মোটেই বিচিত্র নহে। রাজোপাখ্যান প্রণেতা এই যুগের ইতিহাস সঙ্কলনে রাজখণ্ড অপেক্ষা প্রামাণিক কোন গ্রন্থের সাহায্য লাভের সুযোগ পায় নাই সুতরাং রাজখণ্ডের বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন।" এই উক্তিতে যৌক্তিকতা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধ। শুক্লধ্বজের ভ্রাতৃহত্যার প্রয়াস, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের অর্দ্ধমুদ্রা প্রস্তুতের স্বীকৃতি এবং মহারাজ বীরনারায়ণের সংশ্লিষ্ট অবাচ্য সংবাদ রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে। সেই সমস্ত সংবাদ মোটেই উপাদেয় নহে।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের অর্দ্ধমুদ্রা প্রস্তুতের বিবরণ যাহা রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, আমি তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করি নাই। গুপ্ত মহাশয়ও তাহা নির্ভুল বলেন নাই। কিন্তু তদুপলক্ষে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ অনুমান করিবার উপযুক্ত কোন প্রমাণ আমি পাই নাই এবং তিনিও উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

১। "বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা পর্তুগীজ দলনে ব্যস্ত ছিলেন, অতএব মহারাজ প্রাণনারায়ণ নির্ভয়ে নিজনামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইলেন।"

২। মহারাজ প্রাণনারায়ণ নবাব শায়েস্তা খাঁকে "পূর্ণমুদ্রা অঙ্কিত না করার প্রতিশ্রুতি" দিয়াছিলেন।

৩। "খুব সম্ভব মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ যখন মানসিংহের শাসনকালে মোগল আনুগত্য স্বীকার করেন তখনও অর্দ্ধমুদ্রা প্রস্তুতের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।"

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত মহারাজ মানসিংহের ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এবং জাহাঁগীর বাদশাহের ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল। তৎসংক্রান্ত বিবরণ যথাক্রমে সমসাময়িক আকবরনামা এবং তোজকে জাহাঁগীরি পুস্তকে লিখিত আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধ অথবা পূর্ণ কোন মুদ্রারই কথা লিখিত নাই। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের অর্দ্ধমুদ্রা প্রস্তুতের প্রতিশ্রুতি সংবাদ মোগল ঐতিহাসিকগণের পক্ষে "অনুপাদেয়" ছিল মনে করিতে পারি না।

— খান্ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমদ

[কোচবিহার দর্পণ : ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

: ব্যক্তি পরিচিতি :

আরনেষ্ট মেস্তর : টমাস হেনরী আর্নেষ্ট (Thomas Henry Ernest)। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব রিকোয়েষ্টের কমিশনার পদে বহাল হন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন।

ইশ্ মিট সাহেব : উইলিয়ম টাওয়ার স্মিথ (Willam Towers Smith)। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহারের কমিশনার রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮২৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

গুডলাড : রিচার্ড গুডল্যাড (Richard Goodlad)। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে দু'বার এবং ১৭৮১ থেকে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রঙ্গপুরের কালেকটার রূপে নিযুক্ত ছিলেন। সাময়িক ভাবে রঙ্গপুরে বিচারকার্যেও নিযুক্ত ছিলেন।

কপ্তান ডঙ্কীশন : ডাঙ্কানসন (Lieut. W. M. Duncanson)। ১৭৮২ সালে সেনাবিভাগে যোগদান করেন। নাবালক মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ৪০ জন সিপাই রাখা হয়েছিল। লেপ্টেনান্ট ডাঙ্কাসন এদের সেনাপতি ছিলেন। কোচবিহারের রাজা তার বেতন বহন করতেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করেন।

লম্পট সাহেব : উইলিয়াম ল্যাম্বার্ট (Willam Lambert)। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দিনাজপুরের কাউন্সিলের বড় কর্তা ছিলেন।

রিচার্ড আমটি : রিচার্ড আহমটি (Richard Ahumty) : ১৭৯৯ সালে কোম্পানী কর্তৃক চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের আপিল আদালতের রেজিষ্টারের কার্যে নিযুক্ত হন। কোচবিহারের কমিশনার রূপে যোগ দেন ১৭৯৭ সালে। একটানা ১৮০১ সাল পর্যন্ত, উক্ত পদে নিযুক ছিলেন। ১৮০৮ সালের মার্চ মাসে সরকারী কার্য থেকে অবসব গ্রহণ করেন।

মেছর (মার্শী) : লরেন্স মারসার (Lawrence Mercer)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কোচবিহারের অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের সাথে রাজগুরু সর্বানন্দ গোস্বামীর বিবাদ সংক্রান্ত ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মারসারকে কমিশনার রূপে নিযুক্ত করেন। তার আগে তিনি পাটনার দেওয়ানী আদালতের বিচারক ছিলেন। ১৭৮৮ সাল থেকে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত তিনি বর্ধমানের কালেক্টার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুরবিট (শোভে) : জন লুই সোবেট (John Lewis Chauvet)। ইনি বাংলা ও পার্সি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। নাবালক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে ছত্রনাজীর খগেন্দ্র-নারায়ণের সংগে রাজগুরু সর্বানন্দ গোস্বামীর বিবাদ সংক্রান্ত ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হন।

মেস্তর মনগমরী : মিঃ মণ্টগোমেরী (Mr. Montgomery)। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রংপুরের কালেক্টর ছিলেন।

মেস্তর ফ্রানসিষ জিকিঞ্চ সাহেব : মিষ্টার ফ্রান্সিস জেন্‌কিন্স (Mr. Francis Jenkins)। ইনি গভর্ণর জেনারেলের উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের এজেণ্ট রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিকিম, মোরঙ্গ এবং কোচবিহার সম্পর্কে একটি গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। এই রিপোর্টটি Major Jenkin's Report নামে পরিচিত। এই জেনেকিন্স সাহেবের উদ্যোগেই কোচবিহারের শতবর্ষপ্রাচীন জেনকিন্স বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়।

পীতর মৌর : পিটার মোর (Peter Moore)। ১৭৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের কয়েকমাস রংপুরের কালেক্টর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

ডিগনিস : জন ডীগবি (John Digby)। ১৮০৯ সাল থেকে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রংপুরের কালেক্টর ছিলেন। Digby-র অধীনেই রামমোহন রায় দেওয়ান রূপে নিযুক্ত ছিলেন।

মেকনোট সাহেব : নরম্যান মেক্‌লিয়ড (Norman Macleod)। ইনি ১৮১৩ সালের অগাষ্ট মাসে কোচবিহারের কমিশনার রূপে নিযুক্ত হন।

মেস্তর পারলেঙ্গ সাহেব : চার্লস পারলিং (Charles Purling)। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের সাথে সন্ধি পাপন করেন। ১৭৭৭ থেকে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রংপুরের কালেক্টর ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রংপুরের কালেক্টর রূপে নিযুক্ত হন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কাপ্তান রাটন : কাপ্তেন জন রাটন (Captain John Rutton)। দিনাজপুরের সৈন্য দলের অধিনায়ক ছিলেন।

লমশ ডিন : জন লামসডেন (John Lumsden)। ১৭৯২ থেকে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রংপুরের কালেক্টার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

চারণছ ওরন বরছ : চার্লস এণ্ড্রু ব্রুস (Charles Andrew Bruce)। কোচ-বিহারের দ্বিতীয় কমিশনার। তাঁর কার্যকাল ১৭৯১ সাল থেকে ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত।

ঃ টীকা ও শব্দার্থ ঃ

অন্দর—ভিতর।

অহিক—(ঐহিক)—ইহলোক সম্বন্ধীয়।

অন্দরান—অন্তপুরের খরচাদি নির্বাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি।

আঠার কোঠা—(স্থা)*কোচবিহার জেলার একটি গ্রাম। রাজার নির্মিত আঠারটি কোঠা বা কক্ষ থেকে নাম হয় আঠারকোঠা। এক সময় কোচবিহারের রাজধানী ছিল।

আইসা—আসা।

আওাসে, আওয়াসে—আবাসে।

ইজারা—নির্দ্দিষ্ট খাজনায় জমি বা অন্য কোন অধিকারকে পত্তন বা ঠিকা দেওয়া।

উচ্ছিয়তনামা—হুকুম বা আদেশ।

কতি—কিয়ৎ পরিমিত, কত।

কিয়ৎকাল—কিছুকাল।

কাটা যাওয়া—তরবারি আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হওয়া।

কর্য্যী—উপাধি।

কার্য্যকারক—কর্মচারী।

কুঙর—কুমার।

কোট—দুর্গ।

কৈলাস গমন—মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত।

খালিসা—রাজস্ব বিভাগ।

গুড়িয়হ টী—(স্থা) কোচবিহারের একটি অঞ্চল।

গুয়াহাটী—(স্থা) গৌহাটী।

গীতালদহ—(স্থা) কোচবিহারে অবস্থিত।

গোসাঞী—সন্ন্যাসী।

চরণার বিন্দ—চরণ কমল, পাদপদ্ম।

চড়াও—আক্রমণ।

চেচাখাতা—(স্থা) জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার অন্তর্গত।

চাঁপাগুড়ি—(স্থা) কোচবিহারে অবস্থিত।

চাক বালিশ—রাজার আসন।

জাবদিয়—যাবতীয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

জিনি—যিনি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'যি' শব্দের বানানে 'জি' এই ব্যবহার দেখা যায়।

জিনকাপ—(ভুটানী শব্দ) পত্রবাহক বা পিয়ন।

জিরানপুর—(স্থা) কোচবিহারে অবস্থিত একটি গ্রাম।

তদ্বেত্তা—তদ—সেই, বেত্তা—জ্ঞাতা। সেই জ্ঞান লাভ করেছেন যিনি।

তহশিল—রাজস্ব।

তুরুক কাটা—(স্থা) দিনহাটা মহকুমার একটি গ্রাম।

দিনহাটা—(স্থা) কোচবিহারের একটি মহকুমা অঞ্চল।

ধলিয়াবাড়ী—(স্থা) কোচবিহার শহর থেকে ৬ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত। কোচবিহারের পুরাতন রাজধানীর জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

নাজিরী—নাজিরের পদ।

নারায়ণী টাকা—কোচবিহারের মুদ্রা। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে এই মুদ্রার প্রচলন হয়।

নিয়া—নিয়ে।

পারিত্রীক—পারলৌকিক।

পাট গ্রাম—(স্থা) বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত।

পুঁটিমারী—(স্থা) কোচবিহারের একটি গ্রাম।

বলরামপুর—(স্থা) কোচবিহারের প্রাচীন গ্রাম।

বকসাদুয়ার—(স্থা) বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় আলিপুরদুয়ার মহকুমার অন্তর্গত। পূর্বে এখানে ভুটানের একজন সুবেদার বাস করতেন।

বোদা—(স্থা) রংপুর জেলার একটি পরগণা।

বামনহাট—(স্থা) দিনহাট মহকুমায় অবস্থিত।

বালাভাঙ্গা—(স্থা) কোচবিহারের একটি গ্রাম।

ভেটাগুড়ি—(স্থা) কোচাবিহার জেলার অন্তর্গত। কোচবিহারের পুরাতন রাজধানী ছিল।

ভোটান—ভুটান।

ভোটিয়া—ভুটিয়া।

---

*(স্থা)—স্থাননাম।

মণ্ডয়ামারী—(স্থা) কোচবিহারের একটি গ্রাম।

মনসব, মনযুব—পদ।

মরাঘাট—(স্থা) কোচবিহারের একটি গ্রাম।

মালখানা—মাল—অর্থ, খানা—ঘর, ভাণ্ডার ঘর, কোষগৃহ।

মার্তণ্ড—সূর্য।

লাটবন্দী—ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা।

সর্ব্ববিৎ—সর্বজ্ঞ।

সেহরাগুড়ি—(স্থা) কোচবিহারের একটি গ্রাম।

সেরেস্তা—আফিস।

সেরেস্তাদার—আফিসের কর্তা ব্যক্তি।

হস্তবুদ—যা ছিল ও আছে; ভূত ও বর্তমান।

হবেক—হবেন।

হৈয়া—হয়ে।

হুকুমনামা—লিখিত পত্র।

নির্ঘণ্ট

অকল্যাণ্ড (লর্ড) ১২৪, ১৩৯

অভয়নারায়ণ ৪২, ৪৬

আধার কোঠা ৩০, ৩১

আসাম ২৬, ৯৩

আলিকুলি খাঁন ২৮

আলি মহম্মদ ৬৩

ইসকাট সাহেব ১১৪, ১১৬

ইরান ১১৮

ঈশানচন্দ্র মুস্তাফী ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৪০

ঈশারাণী ১২৬, ১২৭

উইলিয়ম টোরছ ইসমিট ৯৫, ৯৬

উপেন্দ্রনারায়ণ ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৬

ওয়াগনার সাহেব ৯৮, ৯৯

কর্ণওয়ালিস ১০৯

কড়া মজুমদার ৯৮

কলিকাতা ৮৫, ৮৮, ৯৩, ৯৯, ১০৩, ১০৯, ১৩৪

কবিন্দ্রনারায়ণ ১৪০

কপ্তান ডজ্ঝীশেন ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৮, ৮৯

কপ্তান রাটন ৮৫, ৮৭

কামরূপ ৪, ১৬, ২২, ২৯

কামপীঠ ৫, ৬

কামতাপুরী ৫

কামতাপুর ১৬

কামতেশ্বরী (দেবী) ৪৮, ৬৭

কামাখ্যা ২৫

কালাপাহাড় ২৭

কালাপূজারী ৪৮, ৪৯, ৫১, ৬১, ৬৩

কালাখাঁড়াধরা ৪৮, ৪৯, ৫১

কান্তেশ্বর ৬

কানপুর ১৪৪

কাকিনা ৩৯

কার্জিহাট ৩৯, ৬৩

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী ১৩০, ১৩৯

কালীশরণ লাহিড়ী ৬৬

কালীচরণ লাহিড়ী ১১৫, ১১৭, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৭

কালীশংকর ভাহুড়ী ১২৭, ১৩০

কালিকাপ্রসাদ মুস্তাফী ৪১

কাশীকান্ত লাহিড়ী ১২৩, ১২৪

কাশীনাথ লাহিড়ী ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৭, ৬২, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ১০১, ১০২, ১০৭

কাশীচন্দ্র লাহিড়ী ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪

কাশীনাথ কবিরাজ ১০৬, ১০৮

কাশী ১১৬, ১১৮

কালীদহ ৮৪

কৃষ্ণনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর ৬৯, ৭১, ৯০

কৃষ্ণপ্রসাদ রায় ৮৮, ৮৯, ৯৯

কোচবিহার ৬০, ৬১, ৭৯, ৮৯

কৈলাশনাথ ১০৬

খড়্গনারায়ণ ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৮

খগেন্দ্রনারায়ণ ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৫৩, ৬৩, ৭৩, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৯, ৯৯
খামারবাড়ী ৫২
খাগড়াবাড়ী ৫৮
খেলারাম কার্য্যী ৭২, ৮২
গজেন্দ্রনারারণ ৯২
গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ ১০৬, ১০৮
গন্ধর্ব সিংহ ৪৯
গয়েশ মামুদ ৮৬
গ্রাণ্ট সাহেব ১০১
গাজিপুর ১২৩
গিতালদহ ৪৭, ৫৫, ৫৭, ৮৮
গুঞ্জাবাড়ি ১১৮
গুটলাভ (গোটলেট) ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭৫, ৭৬
গুরুপ্রসাদ বাবু (রায়) ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৯, ১২৪, ১২৭, ১২৮
গুরুচরণ রায় ১২৯, ১৩০, ১৪১
গুড়িয়াহাটী ৪০
গের্দ্দপাটছড়া ১০৭
গেলঙ্গ কার্য্যী ৪৮
গোকুলচন্দ্র রায় ১১৫, ১১৭
গোপালমোহন মজুমদার ১৩৩, ১৩৯, ১৪০
গোসানীমারী ৩৩
গৌরীপ্রসাদ বক্সী ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭
গৌরীনাথ ৪৬
গৌরীনন্দন মুস্তাফী ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫১, ৯০
গৌরমোহন বাবু ৯০, ৯১
গোরাচাঁদ বসাক ৭৯, ৮০, ৮৫
গোলাব সিংহ ৭৯, ৮১, ৮৪, ৮৯, ১০৮
গৌরাঙ্গচন্দ্র রায় ১১৫, ১১৭, ১১৯
গৌড়দেশ ১৬, ২২, ২৮, ২৯
গৌহাটি ২৫, ১২১, ১৩৮
ঘোড়াঘাট ২৩, ২৯
চন্দন ৭, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ৪০, ৫০
চার্লস ওরূপ বরহ ৯১
চিলারায় (শুক্লধ্বজ) ১৭, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭
চিলমারী ১২২
চিকিনা পর্বত ৬, ১৮
চেচাখাতা ৪৪, ৫০, ৫৪, ৬০, ৬১
চোত্তালাল ১০৯, ১১০
ছাপড়া ১২৩
জগৎনারায়ণ ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯
জগৎ শেঠ ১০৬
জগদেব ৩৬, ৩৭
জয়গোপাল সিংহ ৯০, ১০৮, ১০৯
জয়গোবিন্দ লাহিড়ী ৬৯
জামাইতলাল ১০৮
জহিরুদ্দীন আহম্মদ ৮০
জল্লেশ ৪৭
জানকীরাম ৬৬, ৮৮
জালালউদ্দীন মহম্মদ ৮০

জাহাঙ্গীর নগর ৮৫
জিতন সিংহ ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৪, ৮৮
জিরানপুর ১১৭
জিম্পে ৫৮
জীবননাথ বড় কাহেত ৭২
জীবনকৃষ্ণ লাহিড়ী ৬৬
জীবেশ্বরা ১২৬
জীবেন্দ্রনারায়ণ (কুঙর) ৯৮, ১০৭, ১১৬, ১২৬
জীরা ৭, ৯, ১৫
টেপা ৩৯
ডাঙ্গর আই দেবতী ১৩১
ডিগনিস (ডিগবী) ১১১, ১১২
ডেভিড স্কট ১২৭
ঢাকা ১৩৪
তারামোহন বক্সী ১৩৩, ১৩৪
তিতোলিয়া ১১৫
তুরুককাটা ৩৮
দর্পনারায়ণ ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯
দিনহাটা ৫৭, ১১৪, ১১৫
দিনাজপুর ৪১, ৬৩, ৬৪, ৯৬, ৯৮
দীননারায়ণ ৪২, ৪৩
দুলারাম ১১১
দেবরাজ ১৬, ২২, ৩৮, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৮, ৬০, ১৩২
দেবেন্দ্রনারায়ণ ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭
দেবীপ্রসাদ ৬৩
ধর্মরাজ ১৩২
ধর্ম নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৬৬
ধর্ম নারায়ণ রায় ৩৬
ধরেন্দ্রনারায়ণ ৪৮, ৫১, ৫৩, ৬১, ৬২
ধরমপুর ৮৫
ধলিয়া বাড়ী ৪২
ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৭, ৬০, ৬২, ১১১
নর নারায়ণ ১৭, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ৬৫
নরম্যান মেকনোট ১১২
নরেন্দ্র নারায়ণ ৪০, ১৪০
নগেন্দ্র নারায়ণ ৮৯, ৯৮
নবাব সৈয়দ মহম্মদ ১১১
নবাব সৈয়দ মেদ্দি খাঁ ১১১
নারায়ণ ভট্টাচার্য ৩১
নাগেশ্বরী ৮০
নাজির গঞ্জ ৫৮, ৮৫
নাছির উদ্দিন হুমায়ুন ৮০
নিত্যানন্দবাবু ১১৭
নীলকুঠী ১০১
নীলু বক্সী ৯৮
নুরুদ্দীন মহম্মদ ২৮
নৃসিংহ (মুন্সী) ২, ২২, ৮৯, ৯৫
নেপাল ১১১
পরমানন্দবাবু ১১৭
পদ্মলোচন রায় ১২৩, ১৩৪
পদ্মনাথ কার্য্যী ৯৩
পঞ্চগৌড় ৪
পারলেঙ্গ সাহেব ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৪

পাটনা ৯১, ১২৩
পায়রাডাঙ্গা ৮০
পাটগ্রাম ৩৮, ৩৯, ৪০, ৬৩, ৯৩, ৯৯
পাঙ্গা ২৮, ২৯, ৩৮
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৯৬
প্রতাপ নারায়ণ ১০১
প্রবাল নারায়ণ ২৭, ২৮
প্রাণ নারায়ণ ৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯
প্রাণনাথ ৪১
প্রাগজ্যোতিষপুর ৫
পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য ২৭
পুনাথা ৪৭, ৫০
পেনসুতোমা ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৪
পেষ্টার ঝাড় ৫৮

ফকির চাঁদ ৬৩
ফকির চক্রবর্তী ৮৪
বখসু বেগম বাঈ ১০০
বলরামপুর ৪০, ৪৫
বলরামবাবু ৬২
বর্দ্ধন কুঠী ১০৬
বস্তিলাল ৮১, ৮২, ৮৮
ব্রজ নন্দন মুস্তাফি ৯৮, ১০৮, ১১০, ১১১
ব্রজ নারায়ণ ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
ব্রজেন্দ্র নারায়ণ ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৮, ১৪০
ব্রজ রায় ৬৩
ব্রুস ৯৩, ৯৪
বাক্‌সা (দুয়ার) ৪৪, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৬০
বালাডাঙ্গা ৫৫
বারানসী ১২৪, ১২৫, ১৩৪
বারামথানা ৪০
বানেশ্বর ৩৩
বাসুদেব নারায়ণ ৩৪, ৩৬, ৩৭
বিজনী ১৬
বিজয় গ্রাম ১৬
বিজাপুর ১৬, ৪৮
বিজয়েশ্বর কার্য্যী ৯৯
বিশ্বনাথ মুস্তাফী ৩৮, ৪১
বিশ্বসিংহ (বিশু) ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৬১, ৬৫, ৭৩, ১০৬, ১২০
বিশ্ব নারায়ণ ৩৯, ৪১
বিষ্ণু নারায়ণ ৩৪, ৪০
বিষ্ণুপ্রসাদ বক্সী ৪৭, ১০১, ১০৬, ১১৬
বিষ্ণুপ্রসাদ কার্য্যী ৬৯, ৮৫, ৮৭
বীজেন্দ্র নারায়ণ ৫৫
বীর নারায়ণ ৬, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩
বীরেন্দ্রনারায়ণ ৭১
বুটেল ১১১
বুলচাঁদ বড়ুয়া ৮০
বেহার ৫, ২৯, ৪০, ৪৭, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯৩, ৯৬, ৯৮
বৈকুণ্ঠপুর ১৭, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ১৩১
বৈকুণ্ঠ নারায়ণ (কুঙর) ৪৪, ৫২, ৫৩, ৬৭, ৬৯, ৭০ ৭১, ৯২

বৈদ্যনাথ ষড়ঙ্গী ৭৯
বৈদ্যনাথ ৬৪
বোদা ৩৯, ৪০, ৪৫, ৬৩, ৯৯
ভগবন্ত নারায়ণ ৪৬, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৮১
ভবানীপ্রসাদ বক্সী ৪৩, ৪৭
ভারতবর্ষ ১০৭
ভাগলপুর ১২৩
ভীম নারায়ণ ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১
ভুচুঙ্গমারী ৫৮
ভুবনেশ্বরী ৪৮
ভুজদেব ৩৬, ৩৭, ৪৮, ৫১, ৫২
ভেটাগুড়ি ৫৮, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৭
ভোটান (ভুটান) ১০৮
ভোলানাথ দাস ৯৮

মদন ৭, ১২, ১৪, ১৫
মহম্মদ আলী খাঁ ৪২, ৪৩
মহী নারায়ণ ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮
মহীন্দ্র নারায়ণ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ১১৮, ১৩১, ১৩৩
মল্ল নারায়ণ ১৭, ২৩, ২৭
মহাদেব রায় ১১৯
মরাঘাট ৪৭, ৫৫
মণ্ডলাবাস ৩১
মান নারায়ণ ৩৪, ৩৬
মান্দুভাণ্ডার ঠাকুর ১০৬
মাথাভাঙ্গা ৪৭
মিত্রজিৎ সিং ৯৫
মুঙ্গের ১২৩
মেঘেন্দ্র নারায়ণ কুঙর ৯৬
মেছর (মার্সী) ৮৮
মেস্তর মনগামরি ১০৮
মেস্তর ফরাননীশ প্রাড ১০৮
মেস্তর ফ্রানসিষ জিকিঞ্চ (জেনকিন্স) ১২৫
ম্যাকনর সাহেব ৯৮
ম্যাকডোয়েল সাহেব ৮০, ৮৪, ৮৫, ৮৮
ম্যাকলিওড ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২৭
মোওয়ামারী ৫৫, ৫৮, ১১১
মোদনারায়ণ ৬, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮
মোগলহাট ৫৭, ৬৬, ৮৮, ১১২
মৌলভী মেহের আলী ৯১
মৌলভী আসমত খাঁ ১১৩

যজ্ঞনারায়ণ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯
যদুনাথ ঈলোর ৯৩
যদুনন্দন ৫২, ৫৩
যোগেন্দ্রনারায়ণ ১২১, ১২২, ১২৫

রঘুনাথ বক্সী ৬৯, ৮৩, ৯৮, ১১৬
রঘুনন্দন ভাণ্ডার ঠাকুর ৭১
রবিনন্দন মুস্তাফী ১১১
রতি শর্মা ৪৫, ৪৬
রত্ন পীঠ ৫, ৪০ ১১৬
রহিম গঞ্জ ৫৫
রমানাথ লাহিড়ী ১১৪, ১১৫
রংপুর ৪২, ৪৩, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৭, ৬১, ৬৩, ৬৬, ৭৬, ৮০, ৮৪, ৮৫, ৯৩, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬
রাজেন্দ্রনারায়ণ ৪৪, ৫০, ৫২, ৫৩
রামনারায়ণ ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৫

রামচন্দ্র বড় কাহেত কার্য্যী ১০৯
রামচন্দ্র ১১৫, ১১৭
রামচন্দ্র লাহিড়ী ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১৩৪
রামচন্দ্র রায় ৬২, ৬৩
রাম রত্ন মুন্সী ১১৬
রামরত্ন বক্সী ৮৬
রামমোহন রায় ১১২
রামপ্রসাদ মুন্সী ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৬
রামসুন্দর রায় ১১৯, ১২৬
রাম চক্রবর্তী ৬৬, ৭৬, ৭৯
রাম ঠাকুর ৪৮, ৪৯, ৫১, ৬১
রাধাকৃষ্ণ লাহিড়ী ৯৫, ১০৮, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১২০
রাসবিহারী সরকার ১১৪
রাজদুর্লভ ৯৮
রিচার্ড আমটি ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৬
রাশীভাঙ্গা ১২২
রামানন্দ গোসাঞী ৪৩, ৪৫
রাঙামাটী ৫৫, ৮০, ৮৫
রুদ্রনারায়ণ ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৮২
রূপনারায়ণ ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৬
রূপনারায়ণ মজুমদার ৩৫
রূপচন্দ্র ৬৯, ৭১
রূপচন্দ্র মুস্তাফী ৩৮, ৪৮
রূপন সিংহ ৫৬

লর্ড ময়রা ১১৪, ১১৫
লর্ড হেষ্টিংস ৫৬
লমশডিন সাহেব ৯১
লম্পট সাহেব ৬২
ললিত নারায়ণ ৪১
লক্ষীনারায়ণ ৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৯
লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী ১১৪
লক্ষীপুর, ৪৭, ৫৫, ১০০
লালবাঙ্গ ৪২
লাল বাজার ৪২
লোকনাথ রায় ১১৫, ১১৭

শচীনন্দন মুস্তাফী ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ১১১
শান্তনারায়ণ ৩৭, ৩৯, ৪০ ৪১
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৯১, ৯৫
শ্যামচন্দ্র রায় ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮৮
শিবগোবিন্দ মজুমদার ১১০
শিবনারায়ণ বাবু ৯৬
শিবনারায়ণ রায় ৭৯
শিবপ্রসাদ বক্সী ৮৮, ৯০, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১৩৪
শিবপ্রসাদ মুস্তাফী ৬৯, ৯৩
শিবেন্দ্র নারায়ণ (কুঙর) ৯৫, ১১৮, ১২৮, ১৩০
শিশু (শিশ্য সিংহ) ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭
শীতলকুচি ১০৯
শেরশাহ ১৬
শৈলেন্দ্র নারায়ণ ১১৬
শ্রীরামপুর ১৩১

ষণ্ডেশ্বর ৩৩

সর্ব্বানন্দ ৮৮, ৯৮, ১০৮

সত্যনারায়ণ ৩৭, ৯৩, ৪১, ৪২, ৪৩
সন্তরাবাড়ী ৪৭
শিলিজানী ১১১
সিরাজগঞ্জ ১২৩
সুরেন্দ্রনারায়ণ ৪৪, ৫০, ৬০, ৬৪ ৬৭, ৭০, ৮০
সুরবিট (শোভে) ৮৮
সৃষ্টিধর রায় ৮৮
সেলিম শাহ ১৬
সেহরাগুড়ি ৪৩
সোনারপুর ১২৪
সৌমারপীঠ ৫
সৌমার দেশ ৪, ১৬, ১৭
স্বরূপ সিংহ ৯১

হরনন্দন হিসাবিয়া ১০৮
হলদিবাড়ী ৫৫
হরিপ্রসাদ সরকার ৬৬, ৮৮
হরিদাস ৭, ৯
হরেন পূজারী ১১১
হরেন্দ্রনারায়ণ ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭১, ১২০,
হরেশ্বর কার্য্যী ৫২, ৫৩
হাজরা সিং ৯৩
হারুস সাহেব ৫৬
হিঙ্গললাল বাবু ৯১, ৯৩, ৯৫
হীরা (দেবী) ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৭
হীরালাল ১০৮
হেনরী ডিকনিশ (ডগলাস) ৯০, ৯১, ১০৮
হেমনারায়ণ ৪১

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	যা আছে	যা হবে
৩	৩	৺শ্রীশ্রীবিশ	৺শ্রীশ্রীশিব
৪	২	আমি তাহার	তাহার
১৫	২	বালকণও	বালকগণও
৬৩	২৫	গোসাঞীজী	গোসাঞী
৬৪	১৮	সুরেন্দনারায়ণ	সুরেন্দ্রনারায়ণ
৬৫	১৯	কয়িবার	করিবার
৬৬	৭	কাল শরণ লাহিড়ী	কালীশরণ লাহিড়ী
৭০	২২	জিতন সিংহাক	জিতন সিংহকে
৭৪	৪	খপেন্দ্রনারায়ণ	খগেন্দ্রনারায়ণ
৭৬	১২	পয়দায়	পরদায়
৭৭	৯	দিনজপুর	দিনাজপুর
৮৬	৯	ছাউনিক রিল	ছাউনি করিল
৮৯	৩০	বঙ্গলা	বাঙ্গলা
৯৪	৩০	বেহারা	বেহার
১১২	২৭	ধরম্যান	নরম্যান
১১২	২৯	রমেপ্রসাদ	রামপ্রসাদ